হলি ওয়ার ইনকর্পোরেটেড

ওসামা বিন লাদেনের গোপন ভুবনের অন্তরালে

পিটার এল বারজেন

অনুবাদ । সা'দউল্লাহ

হলি ওয়ার ইনকর্পোরেটেড

হলি ওয়ার ইনকর্পোরেটেড
(HOLY WAR INCORPORATED)
ওসামা বিন লাদেনের গোপন ভুবনের অন্তরালে

মূল : পিটার এল বারজেন

অনুবাদ
সা'দউল্লাহ

ঐতিহ্য

প্রকাশক

মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮–৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল

মাঘ ১৪০৯
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র ❑ গোলাম মুস্তফা

বর্ণবিন্যাস
বর্ণনা কম্পিউটারস

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : দুইশত টাকা

HOLY WAR INCORPORATED (Usama Bin Ladener Gopon Bhubaner Antorale) a book on Usama Bin Laden's underground revolutionary experience translated by Saadullah. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem Oitijjhya. Date of Publication February 2003.

Website www. Oitijjhya.com

Price Taka 200.00 US $ 8.00

ISBN 984-776-225-2

গ্রন্থাকারের পরিচয়

পিটার এল বারজেন একজন খ্যাতনামা সন্ত্রাসবাদ বিশ্লেষক হিসেবে সিএনএন-এ কাজ করেছেন। তিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করেছেন পনের বছর ধরে, ১৯৯০ সালে সিএনএন-এ প্রযোজক হিসেবে যোগ দেয়ার পূর্বে তিনি নিউইয়র্কে এবিসি নিউজে ১৯৮৫-৯০ পর্যন্ত কাজ করেছেন। মুসলিম বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অপরিমিত। ব্রিটিশ চ্যানেল-৪-এ পাকিস্তানে অবস্থিত আফগান রিফিউজিদের সম্বন্ধে ডকুমেন্টারি গবেষণা করেছেন এবং পাকিস্তানে মহিলাদের ওপর শরিয়া আইনের ব্যবহারিক পদ্ধতির ওপর সহযোগী প্রযোজকের কাজ করেন। ১৯৯৩ সিএনএন-এর জন্য সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগান বিদ্রোহীদের যুদ্ধে সিআইএ'র সমর্থন সম্বন্ধে একটি ডকুমেন্টারি প্রযোজনা করেন। ১৯৯৭-এর মার্চে ওসামা বিন লাদেন লন্ডনে অবস্থিত তার এক সদস্যের মাধ্যমে গ্রন্থকারের সাথে সাক্ষাৎদানে সম্মত হয়। বারজেন আফগানিস্তানে গিয়ে বিন লাদেনের সাক্ষাৎ গ্রহণ করে প্রথমবারের মত টেলিভিশনে প্রচার করেন।

আমেরিকায় জন্ম নিয়ে পিটার এল বারজেন লন্ডনে বেড়ে ওঠেন এবং অ্যাপলনোর্থ ও অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৮৪ সালে গ্রাজুয়েট হন। এখন ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাস করছেন।

মানবধর্মী মানুষের জন্য—

Acknowledgement

I would like to acknowledge the enormous contributions always made by Desmond Quiah, my dearest son-in-law. This book is also one of them that enriched my translation works.

I also thank those who constantly inspired me to finish translating the book at the earliest so that it may appear in Ekushey Book Fair, 2003.

অনুবাদকের নিবেদন

এই পুস্তকের কোন ভূমিকা লেখার নেই, কারণ এই পুস্তকটি নিজেই একটি ভূমিকা। Peter L. Bergen CNN-এর বিশিষ্ট সাংবাদিক। Holy War Inc. এবং ওসামা বিন লাদেনের গোপন বিশ্বের অভ্যন্তর সম্বন্ধে তিনি যে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন এরপর আর অনুবাদকের বলার কিছু থাকে না।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওসামা বিন লাদেন বিশ্বব্যাপী স্ব-স্বীকৃত সন্ত্রাসী এবং ইসলামিস্ট জঙ্গি হিসেবে পরিচিত। এখনো পর্যন্ত তার সম্পর্কে সাংবাদিক ও মিডিয়াদের তদন্তের অন্ত নেই এই বিশিষ্ট লোকটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার বিন লাদেন সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, এমনটি এর পূর্বে কেহ করেননি। আশা করি পাঠক এই পুস্তকের প্রতিটি ছত্রের মধ্যে লেখকের অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাবেন। পুস্তকটি আমার হাতে আসে প্রকাশনার এক বছর পরে—অর্থাৎ ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে। হাতে পাওয়া মাত্র অনুবাদ শুরু করি। পুস্তকটি প্রতিটি ছত্র একে অন্যের সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। তাই কোন লাইন বা ছত্রকে বাদ দিয়ে অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। তাই দেরি, নইলে আগেই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে ২১শের বইমেলায় আসতে পারতো। ঐতিহ্য অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি মেলার মধ্যে প্রকাশ করতে, কিন্তু সময়ে হয়তো কুলিয়ে ওঠেনি। যদি বের হয়, তাহলে এই মাসের শেষের দিকে হতে পারে।

ভুল-ভ্রান্তি থাকবেই। তার জন্য পাঠকের কাছে মাফ চেয়ে রাখি। বইটি যদি সমাদৃত হয় পাঠকের কাছে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

সৃজনশীল প্রকাশনায় ঐতিহ্যের সুনাম আছে, সে সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেই ঐতিহ্য বইটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করে পাঠকের হাতে তুলে দেবে সন্দেহ নেই।

সকলকে সাধুবাদ জানাই; আর অনুরোধ করি বই পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন। কারণ জ্ঞানই জাতির শক্তি।

৮ই ফেব্রুয়ারি ২০০৩ — সা'দউল্লাহ
উত্তরা, ঢাকা।

সূচিপত্র

গ্রন্থকারের নোট

আরবি, পোশতু ও উর্দু শব্দের ইংরেজি বানান সাধারণভাবেই করেছি যেমন 'কুরআন'-এর স্থানে কোরান। বিন লাদেনের পারিবারিক নামগুলোও প্রয়োজন মতো বিভিন্ন বানানে করেছি।

এই পুস্তক চার বছরের রিপোর্টিং-এ সমৃদ্ধ, যা লিখতে লেগেছে দু'বছর। ২০০২ সালে আগস্টে যখন আমি প্রকাশককে পাণ্ডুলিপি দিই, আমি আবার এর সম্পাদনা করি, ২০০২-এর মধ্য-গ্রীষ্মে প্রকাশ হওয়ার আগে। এই সময়ের মধ্যে আমি যুক্তিগুলো সংগঠিত করি এবং পুনরাবৃত্তি বাদ দিই।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা, সবকিছু পরিবর্তন করে দেয়। ঐ মুহূর্তে এই পুস্তকটি মানুষের হাতে পৌঁছায় যখন, ঘটনা সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর সংবাদের প্রয়োজন ছিল এবং তার শূন্যতা পূরণের জন্য আমাকে যথেষ্ট শ্রম দিতে হয়েছে। দু'সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমি এবং অনেকেই মূল বইটাকে শুধু উন্নত করিনি, ভয়াবহ বর্তমান ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করি। আশা করি পুনরাবৃত্তি ও ভুলত্রুটি পাঠক ক্ষমা করবেন।

এই গ্রন্থে কোন কিছুকে CNN-এর অভিমত বলে কেউ মনে করবেন না বা অন্য কোন সংবাদ সংস্থার অবদান এতে নেই—যাদের জন্য আমি কাজ করি। এই পুস্তকে বিধৃত কোন বিকৃত ঘটনা বা ব্যাখ্যা থাকলে সে দায়িত্ব আমার, অন্যের নয়।

প্রলোগ

বিশ্বের সবচেয়ে বাঞ্ছিত মানুষের খোঁজ কেমন করে পাওয়া যায় ?

আপনারা যখন ওসামা বিন লাদেনকে দেখার চেষ্টা করেন, দেখা পান না; কিন্তু তিনি আপনাদের দেখেন। তখন ১৯৭৭-এর মার্চ মাস। ফোন বেজে উঠল।

ওপ্রান্ত থেকে শব্দ ভেসে এলো ওসামা আপনার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন আফগানিস্তানে।

বিন লাদের ও তার উপদেষ্টাগণ সিদ্ধান্ত নেন যে, সিএনএন, আমার তখনকার নিয়োগকর্তা, সবচেয়ে ভাল ফোরাম, ইংরেজি ভাষায় বিশ্বে তার প্রথম টেলিভিশন-ইন্টারভিউ প্রচার করা হবে।

আমি আফগানিস্তানের প্রতি আকৃষ্ট হই ১৯৮৩ সালে যখন সোভিয়েত আগ্রাসনের পর মিলিয়ন মিলিয়ন আফগান উদ্বাস্তু পাকিস্তানে আশ্রয়ের খোঁজে ঢুকেছে; তখন আমি তাদের ডকুমেন্টারি তৈরি করি। দশ বছর পর, আমি আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সিআইএ পুষ্ট বিদ্রোহীদের এবং ১৯৯৩ তে নিউইর্য়ক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমেরিকার মাটিতে সাফল্যজনকভাবে সন্ত্রাসীদের বোমাবর্ষণের যে তদন্ত করে, আমার কাছে তা অসমাপ্ত বলে মনে হয়েছিল। আমেরিকান সরকার বোমাবর্ষণকারীদের শাস্তি দিয়েছিলো সত্যি, কিন্তু এর পেছনে যার আসল হাত ছিল তার সন্ধান পেয়েছিল কি ? পাকিস্তান থেকে দু'জন আক্রমণকারীকে কে পাঠিয়েছিল ? বিন লাদেনের সম্বন্ধে আমার যত পড়াশোনা ছিল, আমার তাকেই সম্ভাব্য নাটের গুরু বলে মনে হয়েছে। ১৯৯৬-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিন লাদেনকেই শনাক্ত করে ইসলামী সন্ত্রাসীদের মূল অর্থ জোগানদার হিসেবে অভিযুক্ত করে আফগানিস্তান ও সুদানে সন্ত্রাসী ক্যাম্প পরিচালনা করার জন্য। ঐ বছরের আগস্ট মাসে বিন লাদেন তার প্রথম আবেদন জানিয়েছিল মুসলমানদের কাছে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করার জন্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে এই আহ্বান ভালোভাবেই প্রচারিত হয়।

এই রহস্যজনক সৌদি মাল্‌টিমিলিওনিয়ার সম্বন্ধে আমি প্রথম অনুসন্ধান শুরু করি উত্তর লন্ডনে। এখানকার ডলিহিলস্‌-এ আরব ইমিগ্রান্টস্‌দের আড্ডাস্থল।

এই স্থানে এক বৃক্ষ পল্লব ঘেরা এভিন্যুতে তারা মসজিদ ও ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩০ সালের এক অখ্যাত রাস্তায়, টিউডর-কালের একটি পুরানো বাড়িতে খালেদ আল-ফাওয়াজ বাস করতো। বিন লাদেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সৌদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি দলের মুখপাত্র ছিল এই আল-ফাওয়াজ। সে ছিল পরামর্শ ও যোগাযোগ কমিটির পরিচালক। আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে খালেদের সাথে যোগাযোগ করে কথা বলার চেষ্টা করলে সে কিছু না বলেই লাইন কেটে দেয়। সে শুধু বলেছিল—অনেক বিষয় আছে যা আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই না। বলেই টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। সে বুঝতে পেরেছিল তাদের কথাবার্তা ট্যাপ করার আশঙ্কা আছে তাই পূর্ব-সতর্ক হয়েই লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

যখন আমি খালেদের বাসায় পৌঁছলাম, সব পর্দা টেনে দেয়া হল। খালেদ দেখা দিল, লম্বা জোব্বা পরিধান করে, পা পর্যন্ত ঢাকা। রং সাদা। আর মাথায় যে ঘুট্রা-সেটা ছিল লাল ও সাদা চেক। ঘন ঝোপের মত দাড়ি, সপ্তম শতাব্দিতে আরবে নবধর্মে দীক্ষিত মুসলিমদের মত। ঘরের দরজায় উঠে আমি জুতো খুলে ফেললাম, যেন আমি আরবদেশ, মধ্যপ্রাচ্যে এলাম। খালেদ আমাকে একটা পরিচ্ছন্ন ছোটখাটো রুমে নিয়ে গেল, যেটা তার অফিস ঘর। রুমের একদিকে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স, অন্যদিকে বই-এর আলমারি-সবই আরবি ভাষায়। খালেদের বয়স ৩৪, তবে দেখে বেশি মনে হয়—পরিশ্রম ও টেনশনে ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য। কারণ একদা সৌদি আরবের ধনী ব্যবসায়ী বিন লাদেনের বিশ্বস্ত ব্যক্তি, যে এখন সৌদি রাজতন্ত্রের বিরোধী। ইংল্যান্ড যদিও কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে বা কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে না, তবুও খালেদ, লন্ডনের মত স্থানে তার সন্তানদের নিয়ে আসেনি। আর নিজেও সংযমী জীবনযাপনের চেষ্টা করে।

খালেদ আরবীয় আতিথেয়তায় আমায় এক প্লেট খেজুর ও কফি দিয়ে আপ্যায়ন করলো। তারপর আমরা আমাদের আলোচনায় এলাম। খালেদ বেশি আগ্রহ দেখালো কোরান ও সৌদি রাজনীতি সম্বন্ধে, বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিল না।

খালেদ বারবার নিজেকে 'সংস্কারক' বলে অভিহিত করল, বিপ্লবী নয়। সংস্কারের মাধ্যমে সে চায় সৌদি রাজতন্ত্রের পরিবর্তন আনতে, বিপ্লবের মাধ্যমে নয়। উনবিংশ শতাব্দির লিবারেল সংস্কার নয়, খালেদের সংস্কার হল সপ্তম শতাব্দিতে প্রফেট মোহাম্মদ-এর সময় যে ইসলামী জীবন ধারা প্রচলিত ছিল, সেখানেই ফিরে যাওয়া। আমি তার সংস্কারের ইচ্ছা শুনে অবাক হলাম—যেটায় মধ্যযুগে প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারের প্রতিধ্বনি ছিল, যারা চেয়েছিল মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চের দূর্নীতি ও অপ-সংস্কৃতির অনাচার দূর করে খ্রিস্টানিটির জন্মযুগের নীতিতে ফিরে যাওয়া। ইসলামে এ ধরনের প্রচেষ্টা বহুবার হয়েছে প্রফেট মোহাম্মদ ও তাঁর পরবর্তী চার খলিফার আদর্শিক সমাজকে পুনরুদ্ধার করা, কিন্তু চোদ্দশো বছরের পরও সে প্রচেষ্টা সফলকাম হয়নি।

আমাদের প্রথম সপ্তাহের মিটিং–এ খালেদ আমাকে তার বন্ধু বিন লাদেনের একটা প্রাথমিক ধারণা দিল। বলল : বিন লাদেন অতিশয় নম্র, ভদ্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন, চার্মিং ব্যক্তি। অপরিমিত সম্পদের অধিকারী। ইসলামের কারণে তার সবকিছুই আফগানিস্তানের যুদ্ধে দান করেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, বিন লাদেনের ভূমিকা ১৯৮০ সালের দিকে তাকে সারা মধ্যপ্রাচ্যে নায়করূপে পরিচিতি এনে দিয়েছে।

খালেদ বললো আফগানিস্তানে ফিরে বিন লাদেন এখন সৌদি আরবে আমেরিকার সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিপক্ষে মহা খাপ্পা। সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে সৌদি আরবের আহ্বানে আমেরিকান সেনাবাহিনীর অবস্থান, ইরাকের পরাজয়ের পর, ইসলামের পবিত্র ভূমির অবমাননা স্বরূপ। কুয়েত পুনরুদ্ধারের পর এবং সাদ্দামের নতি স্বীকারের সাথে সাথেই আমেরিকা সেনাবাহিনীর সৌদি ভূমিতে বসে থাকার কোন কারণ ছিল না।

বিন লাদেন আরও বিশ্বাস করে আল সৌদ বংশ যুগ যুগ ধরে আরব শাসন করে এখন ইসলামী নীতিচ্যুত, ধর্মদ্রোহী–'apostates'। সৌদি রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, কারণ সৌদিরা নিজেদের ইসলামের দুটি পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনার রক্ষক বলে মনে করে। সৌদিরা নিজেদের ট্রাডিশানাল সুন্নি প্রথা পালনকারী বলেও দাবি করে। বিন লাদেনের সৌদি শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ অদ্ভুত ছিল—'Peculiar', কারণ তার পরিবারের সৌদি রাজ পরিবারের সাথে নিকট সম্পর্ক থাকার কারণেই এই অস্বাভাবিক সম্পদের মালিক হতে পেরেছে।

খালেদ বিন লাদেনের অভিযোগের সাথে একমত, কারণ সৌদি রাজ পরিবারের বা সরকারের আরব পেনিনসুলার পবিত্র ভূমিতে আমেরিকানদের ঘাঁটি গাড়তে দেয়া উচিত নয়। তার মতে, প্রফেট মোহাম্মদ আরবে স্থায়ীভাবে বিধর্মীদের অবস্থান নিষিদ্ধ করেন, তাই বিন লাদেনের এই অভিযোগ কেন সৌদি আরবে হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্যের ঘাঁটি থাকবে ? খালেদ তাই বিন লাদেনের আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদের আহবানকে অসঙ্গত মনে করে না।

যখন আমি খালেদকে বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য চাপ দিলাম, সে জানালো যে এতে অনেকগুলো সঙ্গত সমস্যা আছে। একটা হল—বিন লাদেনের সৌদি গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা কয়েকবার তার জীবনের ওপর হুমকি চালিয়েছে।

এরপরেই সে হঠাৎ প্রশ্ন করলো তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার টিমের মধ্যে কেউ সিআইএ'র এজেন্ট নেই ?

আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বললাম না, আমাদের মধ্যে কেউ নেই। এটা মধ্যপ্রাচ্যবাসীরা বিশ্বাস করে না যে আমাদের সাংবাদিকরা সরকারি কর্মচারী নয়, যেমন তাদের দেশে আছে।

এ সত্ত্বেও, খালেদ বলল সে আমাদের অনুরোধ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে।

আফগানিস্তানে কয়েক বছরের যুদ্ধের কারণে টেলিফোন লাইনের কাঠামো ধ্বংস হয়েছে। এখন একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হল স্যাটেলাইট ফোন। বিন লাদেন নিজেই যোগাযোগ করতে রেডিও ব্যবহার করে, খালেদ বলল। কারণ, সে ভাল করেই জানে যে গোয়েন্দা বিভাগ সহজেই স্যাটেলাইট ফোন কল 'মনিটর' করে। খালেদ বলল যে, এ পর্যন্ত বিন লাদেন কোন টেলিভিশন ইন্টারভিউ করতে চায়নি। অবশ্য শুধু আমরাই তার ইন্টারভিউর প্রথম প্রার্থী নই, এর পূর্বে বহু সংস্থা এই নির্বাসিত ধনী সৌদির ইন্টারভিউর প্রত্যাশী ছিল। এই বলে খালেদ আমাকে অনেক সংস্থার চিঠিপত্র দেখালো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে পাঠানো। এর মধ্যে খালিদ পরামর্শ দিল ডা. সাদ-আল-ফাগিহ্‌র সাথে কথা বলতে। ডা. ফাগিহ্ আর একজন সৌদি বিরোধী, তিনি বিন লাদেন সম্বন্ধে আরও পটভূমি জুড়ে দিতে পারবেন।

ডা. আল-ফাগিহ্‌র অফিস খালেদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। ডা. আল-ফাগিহ্ কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অব সার্জারি ছিলেন এবং স্কটল্যান্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জিয়ানে পড়াশোনা করেছেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি। ক্ষীণদেহ, শুকনো মুখটা পুরো মোটা কাচের চশমা দিয়ে ঢাকা। আল-ফাগিহ্ আমাকে বললেন যে, ১৯৯৪ সালে ইংল্যান্ডে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে আসার দিন পর্যন্ত সৌদি আরব হাসপাতালে অপারেশন করেছেন—অর্থাৎ তার কোন কর্তব্যে অবহেলা করেননি। মোট কথা তিনি সত্যিকারের বিপ্লবী মানুষ নন।

ডা. আল-ফাগিহ্‌র বিরুদ্ধে সৌদি সরকারের অভিযোগের কারণ ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং রাজনৈতিক। যেটা তার পোশাকে প্রতিফলিত হতো। তিনি সাধারণ সৌদির মতো জোব্বা, ঘুট্রা ইত্যাদি পরেন না, স্যুট-বুট পরে চলাফেরা করেন। এটা সত্যি যে, তিনি রক্ষণশীল ইসলামী স্টেট পছন্দ করেন না, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে তার প্রধান আপত্তি ও সমালোচনা রাজ পরিবারের জঘন্যতম দূর্নীতি এবং দেশের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা নিয়ে। আল-ফাগিহ্‌র বিরোধী দলের নাম হল 'মুভমেন্ট ফর ইসলামিক রিফর্ম ইন আরাবিয়া' (মিরা)। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার আন্দোলন আধুনিক, মৌলবাদী নয়। আমি যখন তার অফিসে যাই, গিয়ে দেখি কিছু নিঃস্বার্থবাদী দাড়িধারী যুবক কম্পিউটারের পর্দায় তাদের ওয়েব-সাইট www.miraserve.comকে আরবিতে আপ-ডেট করছিল। এই সাইটে সৌদি আরবের মিডিয়ার গতিকে খুব ন্যায্যভাবে ও খোলা মনে বিশ্লেষণ করছিল, কোন মৌলবাদিত্ব ছিল না। ডা. আল-ফাগিহ্ খুব গর্বভরে আমাকে তার নব-নির্মিত রেডিও স্টুডিও দেখালেন যেখান থেকে তিনি তার বাণী সেটেলাইটের মাধ্যমে সরকারি সৌদি সাম্রাজে সম্প্রচার করতে পারেন।

১৯৮০ সালে ডা. আল-ফাগিহ্ পেশওয়ার ও পাকিস্তানে গিয়ে সার্জারি করেছেন তখন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে মুজাহিদিনদের জেহাদ চলছিল। আল-ফাগিহ্ বললেন আমার হিসেব মতে ১২ থেকে ১৫ হাজার লোক বিন লাদেনের সাথে আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তাদের মধ্যে চার হাজার বিন লাদেনের জন্য বিশ্বজুড়ে কাজ করছে। তিনি বললেন, এদের মধ্যে কয়েকজন লাদেনের সাথে 'চেন অব কমান্ডে' কাজ করে অর্থাৎ একটা স্তর বিভাগের মাধ্যমে কাজ হয় দায়িত্ব নিয়ে, তবে বেশিরভাগ মানুষ সুবিধামত ও সুযোগ বুঝে আলগা কাজও করে থাকে—অবশ্য বিন লাদেনের নির্দেশে ও নেতৃত্বে তাদের সাধারণ সম্পর্ক থাকেই।

লন্ডনে আলী নামে জনৈক আরবের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, সে তিন বছর ধরে আফগান যুদ্ধে বিন লাদেনের গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিল। যদি সবুজ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহলে এই লোকটি আমাদের বিন লাদেনের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। তার সাথে আমার কথাবার্তা ভাসাভাসা হয়েছিল, কারণ সে ইংরেজি জানে না, আর আমি জানি না আরবি, তাই ভাঙাভাঙা ফ্রেঞ্চ ভাষায় উভয়ের মধ্যে কিছুটা ভাব বিনিময় হয়েছিল।

আলী দশ বছরের বেশিকাল ইউরোপে কাটিয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়াতে ইসলামী আন্দোলনের জন্য অনেক লেখালেখি করেছে। হাড়া গোড়া পেশিবহুল মানুষ। মুখে ঘন লাল দাড়ি; গম্ভীর মুখ, হাসি নেই, আলী তার নিরুদ্ধকর্মে একান্ত নিষ্ঠাবান কর্মী। সে অতি সঙ্কটের মাঝেও ধীরস্থির থাকতে পারে, ধৈর্যহীন নয়।

এতোদিন ধরে ইউরোপে থেকেও আলীর মতামতের পরিবর্তন হয়নি, গোঁড়ামি ঘুচেনি। কথা বলার ফাঁকে সে বলল তুমি জানো আমেরিকার বৈদেশিক নীতি তিনজন ইহুদি পরিচালনা করে ? —আলব্রাইট, বারগার আর কোহেন। আমি আমাকে দমন করে চেপে গেলাম, ব্যক্ত করলাম না যে ওয়াশিংটনে দু'জন শক্তিশালী মানুষ আছে সন্দেহাতীতভাবে প্রো-ইসরাইল-পলিসি পরিচালনা করে।—একজন বিল ক্লিনটন, অন্যজন আল গোর এবং উভয়েই দক্ষিণের ব্যাপ্টিস্টস্।

আমাদের দু'জনের ভাবনা চিন্তায় পার্থক্য থাকলেও আলী আমার প্রতি উষ্ণভাবই প্রকাশ করলো। সে ইন্টারভিউ পাওয়ার জন্য কিছু টিপ্‌স্ দিল। বললো বিন লাদেনের কাছে পৌঁছতে অন্ততপক্ষে দশ দিন লাগতে পারে। হয়ত দু'সপ্তাহেই হতে পারে। আফগানিস্তান এমন দেশ যে, কোন গন্তব্যে পৌঁছতে হলে হিসেব করে যাওয়া চলে না। কথায় আছে না যখন তুমি আফগানিস্তানে ঘড়ি চলে আস্তে, কিন্তু পেটের কাজ বেড়ে যায়।

বিদায়ের সময় আলী শান্তভাবে বললো যে ফোনে কথা বলার সময় 'কোড' ব্যবহার করা ভালো; কোন অবস্থাতেই বিল লাদেনের নাম উল্লেখ করা যাবে না, এবং যখন জালালাবাদে, আফগানিস্তানে, যেখানে সে আছে, আমরা যাত্রা করব

আমাদের সে যাত্রা উল্লেখ করতে হবে—'কুয়েতে একটি মানুষের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।'

তারপর একদিন খালেদ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললো যে, সে বিন লাদেনের মিডিয়া উপদেষ্টার এক 'কল' পেয়েছে। উপদেষ্টা বিবিসি, সিবিএস-এ ৬০ মিনিট কিংবা সিএনএন-এ, বিন লাদেনের প্রথম টেলিভিশন ইন্টারভিউ দিতে রাজি আছে। খালেদ বললো তার মতে সিবিএস কিংবা সিএনএন-ই ভালো। আমি বললাম, সিএনএন-এর প্রোগ্রাম প্রায় শ'খানেক দেশে প্রচারিত হয়। আর সিবিএস হয় শুধু যুক্তরাষ্ট্রে। সে আমার কথা নোট করে রাখলো বোর্ডে। তারপর আমি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে খালেদের টেলিফোন কলের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মাসখানেক পর 'কল' এলো। আমাদের বাতচিতও হল। তারপর শুরু হল যাত্রা।

প্রতিবেদক হবেন পিটার আরনেট। ভিয়েতনামে দশ বছর রিপোর্টিং করে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন আর গাল্ফ যুদ্ধের সময় ইরাকে তার সাহসী ভূমিকার জন্য সিএনএন রিপোর্টগুলো প্রাধান্য পায়। ক্যামেরাম্যান হলেন সাবেক ব্রিটিশ আর্মি অফিসার, পিটার জুভেনাল। তিনি পৃথিবীর অন্য সাংবাদিকের চেয়ে বেশি সময় আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে কাটিয়েছেন। তিনি, এমনকি, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কাবুলে একটা বাড়ি ভাড়া করে রাখেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে ছুটি কাটাতে যান। বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে যাওয়ার চার বছর আগে, আমি আরনেট ও জুভেনালের সাথে আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম। সেই সময় গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার ছিলেন ইতিহাসের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠায় প্রতিদিন নিজের রাজধানী শহরে গোলাবর্ষণ করেছেন।

আমরা ব্রিটেন থেকে যাত্রা শুরু করি। লন্ডন থেকে পাকিস্তানে উড়ে গিয়ে পৌঁছাই। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনস (পিআইএ)-এর স্টুয়ার্ডেস শাড়ি পরে মাথায় স্কার্ফ বেঁধে আমাদের রুটি তরকারি পরিবেশন করে। উড়াল দেবার পূর্বে রেকর্ড করা প্রার্থনা শোনানো হলো আল্লাহর কাছে নিরাপদ যাত্রার জন্য। পিআইএ-র ফ্লাইটের 'বিস্‌মিল্লাহ' চিরাচরিত।

সুবেহ সাদেকের সময় পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আমাদের প্লেন অবতরণ করল। প্লেন থেকে নেমে মাদকগন্ধ পেলাম মিষ্টি এবং পচা সব্জির যা ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্টের বৈশিষ্ট্য। তারপর গাড়িতে চড়ে পাহাড় ঘেরা রাজধানী শহরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। এই সময়ে অর্থাৎ সকালে, পাকিস্তানের অন্যান্য শহর দোয়া-খায়ের, কথাবার্তা, কোলাহল থেকে শুরু করে ঘিঞ্জি বস্তিবাসীদের কলরব মুখরিত থাকে, ইসলামাবাদের সিনারিও কিন্তু আলাদা। ইসলামাবাদ দুই অঞ্চলে বিভক্ত—একটি জি-৬, দ্বিতীয়টি এফ-আই। আমরা বিদেশী ডিপ্লোম্যাটদের ও সরকারি আমলাদের সাদা বাংলোগুলো ছাড়িয়ে গেলাম। এই এলাকার মারিজুয়ানার গন্ধ আমার গাড়ি জানালা বেয়ে নাকে এলো।

ইসলামাবাদে এর চাষ হয় ব্যাপকহারে। এমন কি পাকিস্তানি ড্রাগ-পুলিশের প্রধান কার্যালয়ের পাশেও গজিয়েছে এই গাছের চারা।

প্লেন জার্নির ধকল সামলিয়ে, আমি আমেরিকান এম্বেসিতে গিয়ে আফগানিস্তানের নিরাপদ ভ্রমণের অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর নিলাম। অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকান এম্বেসি অনেক স্থানে প্রশংসিত ও ঘৃণিত স্থান। তাই যেখানে যেমন, সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তেমনি। পাকিস্তানে এম্বেসি বিল্ডিং দেখে মনে হল একটা মধ্যম সাইজের নিরাপত্তা জেলখানা। বিল্ডিং-এর চারদিকে লম্বা উঁচু দেয়াল, ইটের তৈরি। দেয়ালের ওপর ক্ষুরধার তারের বেড়া। এম্বেসিতে ঢোকার মুখে, আমাকে দু'টো বুলেট প্রুফ চেক-পয়েন্ট পেরুতে হল। মনে হল যেন ভবনটি অবরুদ্ধ অবস্থায়; অবশ্য কিছুদিন আগে ছিল। ১৯৭৯ সালে উত্তেজিত জনতা পুরানো এম্বেসি ভবন আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয় এবং ১৯৮৮ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত রহস্যজনকভাবে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান, যখন তিনি দেশের সামরিক প্রশাসক জিয়া-উল-হকের সহযাত্রী ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় জিয়া-উল-হকও মারা যান।

কয়েকদিন পরে আমরা গাড়ি বোঝাই করে পেশওয়ার যাত্রা করলাম, যেখান থেকে এক লাফে আফগানিস্তানে ঢোকা যায়। এর অর্থ আমাদের গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে লম্বা যাত্রা করতে হবে, এই বিপজ্জনক যাত্রায়, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধে ক্রস ফায়ারিং-এ পড়ে মারা যাওয়ার চেয়ে খাদে পড়ে মারা যাওয়ার বেশি সম্ভাবনা। এই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বিশ্বের দুরূহতম যান্ত্রিক যান চালনায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্থান। এই রাস্তায় ড্রাইভারদের গাড়ি নিয়ে মুরগি দৌড় শুরু হয়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অসংখ্য পোড়া ভেহিকেলের দৃশ্যে। এর অন্যতম কারণ, বেশিরভাগ গাড়িচালক হাশিশ টেনে ট্রিপ মারায় অভ্যস্ত।

যাত্রার অর্ধেক পথ এসে আমরা সিন্ধুনদ ক্রস করলাম—যা তিব্বত থেকে দ্রুত বেগে নেমে এসে এই পয়েন্টে গতি কমে গেছে। পানি কর্দমাক্ত। চারদিকে সেচ কাজের জন্য নদীর পানি ব্যবহৃত হয়। পেশওয়ারের কাছাকাছি এসে পড়ি। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা দারুল-উলম-হাক্কানিয়া ছেড়ে গেলাম। এই মাদ্রাসা থেকে শত শত ছাত্র বিন লাদেনের ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছে এবং একে সময় সময় তালিবান আন্দোলনের হার্ভার্ড বলা হয়, যা মূলত আফগান সরকারের হেড কোয়ার্টার।

হঠাৎ যেন আমরা পেশওয়ারে পৌঁছে গেলাম—ধুলোয় ভর্তি শহর, পশ্চিমের ওয়াইল্ড ওয়েট শহরের মতো। পেশওয়ার পাকিস্তানের একটি প্রদেশ, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার-এর রাজধানী; খাইবার পাস-এর গেটওয়ে, হিন্দুকুশ পর্বত-মালার মধ্যদিয়ে আফগানিস্তানে ঢোকা যায়। আফগান যুদ্ধের সময় পেশওয়ার হয়ে যায় এশিয়ার কাসাব্লাঙ্কা-মসলা ও সাংবাদিকে পরিপূর্ণ শহর। তার সাথে আছে খেটে খাওয়া মানুষের ভিড়, আর আছে বেশুমার রিফিউজি। ভিজিটরদের মধ্যে আছে সৌদির এক টাইকুন, টাকার কুমির, নাম ওসামা বিন লাদেন।

আমরা প্রথমে পার্ল কন্টিনেন্টাল হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেল লবিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা একটা ব্যানার ঝুলছে 'হোটেলের অতিথিদের অনুরোধ করা হচ্ছে, যেন তাদের বডিগার্ডদের আগ্নেয়াস্ত্র হোটেলের ফ্রন্ট অফিসে জমা দেন।' আমার বেড রুমের টেবিলে দেখলাম একটা সবুজ তীরের ফলা মক্কার দিকে কেবলা সংকেত করছে।

আমি সময় নষ্ট না করে হোটেলের বারে গেলাম। এটাই একমাত্র লালপানি খাওয়ার স্থান, লালমুখোদের জন্য—অর্থাৎ অমুসলিমেদের জন্য। হোটেলের টপ্ ফ্লোরে একটা গোপন পানশালা আছে 'গুলবার' এখানে স্থানীয় তৈরি 'দারুর' ব্যবস্থা আছে। স্বদেশী-বিদেশী ভেদ নেই। বারটেন্ডার গুমটো মুখো; বিশ্রী চেহেরা, এগিয়ে এসে আমার হাতে টাইপ করা ফরম দিল—পিআর-৪ (রুল ৩-১৩(১); বিদেশী নন-মুসলিমদের জন্য মদ খাওয়া ও রাখার জন্য অনুমতি গ্রহণের দরখাস্ত। এই অনুমতিপত্রে একটা রহস্যজনক বাক্য যুক্ত করা আছে—'This permit is hereby granted to the above named, authorizing him to possess, purchase, transport for consume liquor is detailed above under the provision of prohivision (Enforcement Hadd).' এই ফরম পূরণ করার পর (তিন কপি), আমি সত্যিই তৃষিত হয়ে উঠলাম পান করার জন্য।

আমরা কিছুদিন পেশওয়ারে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম যখন আলী ও তার এক বন্ধু পাকিস্তানি জাতীয় পোশাক সালোয়ার কামিজ পরে চলে গেল আসল উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ যথাস্থানে সংযোগ করতে।

কানফাটা শব্দ ও ধুলো এড়ানোর জন্য আমি গাছ-গাছড়া পরিবেষ্টিত এক কবরস্থান দেখতে গেলাম যেখানে ডজন খানেক ব্রিটিশ অফিসার ও সৈনিক অন্তিম শয্যায় শায়িত। পেশওয়ার এককালে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দিতে মধ্য এশিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। এই 'গ্রেভইয়ার্ড' সেই যুদ্ধের নিশানা বহন করছে। একটা কবরের পাথরে লেখা ছিল—'লে: কর্নেল হেনরী লে মার্চ-এক উগ্র মৌলবাদী কর্তৃক ২৫শে মার্চ ১৮৯৮-এ ৪০ বছর বয়সে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।' অন্য একটিতে লেখা ছিল—'জর্জ মিচেল রিচমন্ড লেভিট, ২০নং পাঞ্জার ইনফেন্টরি, ২৩ বছর বয়সে ১৮৬৩ সালে মারা যায়। একদিন পূর্বে আম্বেলা পাসে ইগল'স নেস্ট পিকেট রক্ষণ কাজে গুলি খেয়ে আহত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে। একজন নিষ্ঠাবান সৈনিক ও সত্যবাদী খ্রিস্টান।' আর একটি পাথরে উৎকীর্ণ আছে এক ব্রিটিশ সেনা অফিসারের নাম— 'লে: ক: ওয়াল্টার আরভিন যিনি নাগোরোমান নদীতে প্রাণ হারিয়েছিলেন যখন তিনি পেশওয়ার ভেন হান্ট বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন।'

আমাদের যাত্রার এক সপ্তাহ পূর্বে তালিবানরা নির্দেশ জারি করে যে, কোন জীবন্ত জীবের ছবি তোলা ইসলাম বিরুদ্ধ। এই নির্দেশ আমাদের প্রোগ্রামের জন্য সমস্যা তৈরি করবে।

এই ডিক্রির সাথে এক লম্বা লিস্ট ছিল যা নিষিদ্ধ করা হয়—যেমন ফুটবল খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, গান, টেলিভিশন এবং মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা ও অফিস আদালতে কাজ করা। কতগুলো ডিক্রি অদ্ভুত ধরনের ছিল : যেমন কাগজের ঠোঙা বা পেপার ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না, ঐ সব পুরানো কাগজের গায়ে কোন কোরানের আয়াত লেখা থাকে। অপরাধীদের শাস্তির মাত্রা নতুন নতুন আবিষ্কার করতো মোল্লারা এবং এই আবিষ্কারে মত-পার্থক্য ঘটতো। যেমন—সমকামিতার জন্য কি ধরনের শাস্তি দেয়া হবে এর জন্য মোল্লাদের লেগে যেতো। কেউ বলতো—অপরাধীদের খুব উঁচু ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে মারা হোক। অন্যরা বলত দেয়ালের গায়ে বড় গর্ত করে সেখানে কবর দিয়ে দেয়াল ভেঙে চাপা দেয়া হোক।

আমাদের ভিসা ও ভিডিও টেপিংকে মজবুত করার জন্য আমি পেশওয়ারে তালিবান কনসুলেটে গেলাম। সেখানে আমাকে কতকগুলো কিশোরের দল (মনে হল ডাস্টবিন ঘেঁটে এসেছে) স্বাগত জানাল। তাদের দেখে করুণা হল। ১৯৭৮ সাল থেকে আফগানিস্তান লাগাতার যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে চলেছে—যুদ্ধ কি তা তারা জন্ম থেকেই টের পেয়েছে। আমি যখন কনসাল-এর কথা বললাম তখন বলা হল তিনি নেই, বাইরে গেছেন। এদের মধ্যে একজন আমার সার্ট চেপে ধরলো অন্যরা চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো—তারপর চেঁচামেচি। বুঝতে পারলাম এরা কি করতে চায়। কোন প্রকারে তাদের কাছ থেকে ছুটে বাইরে এলাম। কনসাল-এর সাথে দেখা না করেই। এটা অফিস না, পাগলা-গারদ বোঝা মুস্কিল। আফগানিস্তানে গিয়ে দেখা যাবে কি করা যায় এবং কি ঘটে।

কয়েকদিন পর আলী ফিরে এলো এবং বললো আমরা যাত্রা করতে পারি অনুমতি পাওয়া গেছে।

পরের দিন আমাদের গাড়ি হোটেল থেকে কাক-ভোরেই যাত্রা করলো। কারণ খাইবার রাইফেল রেজিমেন্ট বেস-এ সকাল ৯টায় পৌঁছতে হবে। এই রেজিমেন্ট আমাদের পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের 'নো-ম্যানস্‌ল্যান্ড'-এর মধ্য দিয়ে যাবার জন্য আমর্ড গার্ড দেবে। এই বাফার এলাকাকে খাইবার এজেন্সি বলা হয়। এই এজেন্সি অনেকদিন থেকে কাজ করছে। যখন ব্রিটেন নর্থ ওয়েস্ট-ফ্রন্টিয়ার শাসন করতো, এই স্বাধীনচেতা উপজাতিদের আইনের আওতায় আনা ব্রিটিশ সরকারের জন্য কোনদিনই সম্ভব হয়নি, তাই একটা সমঝোতা হয়েছিল। উপজাতিরা তাদের নিজেদের আইন ও নিয়মে চলবে, কিন্তু ব্রিটিশ আইন খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে যে-রাস্তা গেছে সেখানে প্রযোজ্য হবে। আজকের পাকিস্তানেও ঠিক সেই নিয়মই চলছে। এই পাসের মধ্য দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার পরই উপজাতিদের এলাকা। সেখানে পাকিস্তানি আইন চলবে না, চলবে উপজাতি আইন। খাইবার পাস-এর চারদিক ঘিরে উপজাতিরা স্বাধীনভাবে হরণ, আত্মকলহ ও হিরোইন ব্যবসা চালাচ্ছে; এরচেয়ে পাকিস্তান সরকারের খাইবার পাস-এ নিরাপত্তার ব্যবস্থা মন্দের ভালো। তবে দেহরক্ষীদের যে প্রবীণ সৈনিকটি

আমাদের রক্ষক হয়ে চললেন তার হাতে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত লী এনফিল্ড রাইফেল দেখে আমরা কিছুটা দমে গেলাম।

আমরা খাইবার এজেন্সিতে পৌঁছলাম–পাহাড়ের নিচে একটি চত্বরে উনবিংশ শতাব্দিতে তৈরি একটি চুনকামকরা ভবনে এক উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সিভিল সারভেন্ট বসে আছেন; তার চারপাশ জুড়ে ফাইলের স্তূপ। হয়তো কোনদিন খোলাও হয় না, ফিতা দিয়ে বাঁধা। সেখানে কিছু উপজাতীয় লোক ঘোরাফেরা করছে তাদের অভিযোগের সমাধানের জন্য। সেই চত্বরের মাঝখানে একটা ছোট জেল–হাজত সেখানে অপরাধীদের যে–অবস্থায় আটকে রাখা হয়েছে তাতে সম্ভবত এমনেস্টি ইনটারন্যাশনাল সন্তুষ্ট হবে না।

আমাদের কাগজপত্রের অনেক ছান–বিনের পর অফিসের স্ট্যাম্প পড়লো, ছাড়পত্র পেলাম। সেই প্রাচীন রাইফেলম্যান লাফ দিয়ে রাইফেলসহ আমাদের পাশে বসে পড়েই ঢুলতে আরম্ভ করলেন, তারপর গভীর ঘুমে। পরে পেশওয়ারের বহির্বিভাগ ছেড়ে একটি চেক–পয়েন্টে এসে এক সাইনবোর্ড দেখলাম লেখা আছে : Attention Entry of foreigners is prohibited beyond this point. অর্থাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ : এই এলাকার বাইরে বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ।

আমরা আমাদের দেহরক্ষীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম। সে উঠে কর্তব্যরত সেনাদের আমাদের যাত্রার বৈধ কাগজপত্র দেখালো। তারপর আমাদের অগ্রসর হতে আর বাধা থাকলো না। এখন আমরা উপজাতি এলাকায় এসে পড়েছি। রাস্তার দু'ধারে দোকানের সারি, বন্দুক, রাইফেল খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। আর যেসব দোকানের জানালায় ভেড়ার লেজ ঝোলানো সেসব দোকানে হাশিশ বিক্রি হয়। ভেড়ার লেজ ক্রেতাদের কাছে ইঙ্গিতসূচক।

দক্ষিণে ২৫ মাইল গেলে দার্‌বা শহর। এই শহর পৃথিবীর সব অস্ত্রশস্ত্র মজুদ রাখে আবার চালান করে বিভিন্ন স্থানে। এখানে আপনি একটা কলম–সমান বন্দুক কিনে পকেটে রাখতে পারেন, কিন্তু একটা মাত্র 'ফায়ার' করা যায়। মাত্র সাত টাকা মূল্য। যারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে খেলতে পছন্দ করে, তারা মেসিনগান, রকেট–প্রপ্রেল্ড গ্রেনেড (আরপিজি) এবং ছুড়ে–মারা আগুনে–বোমা পেতে পারে। যদি কেউ 'ট্রেস্ট ড্রাইভ' করতে চায় পঞ্চাশ ডলার দিলে 'বাজুকা' ফায়ার করতে পারবে। দার্‌বার বন্দুক কারিগররা কারবারে বেশ ব্যস্ত থাকে। ট্রাইবাল এলাকায় কোন ভদ্রব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া বাড়ি থেকে বের হয় না।

খাইবার পাসের পূর্বদিকে আমরা যেতে থাকলাম যেখানে ইন্ডিয়ান উপমহাদেশ মধ্যএশিয়ার সাথে মিশেছে। এই রাস্তা ধরে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী এসেছিল ভারত জয় করতে। খাইবার পাসের একটি দেয়ালে ব্রিটিশ রেজিমেন্টের চিহ্ন আছে যারা উনবিংশ শতাব্দিতে এখানে পাহারা দিয়েছে।

ছোট ছোট পাহাড়ের সমন্বয়ে পার্বত্য এলাকা বিস্তৃত। এই পার্বত্য এলাকায় উপজাতিদের বাসাবাড়ি, পরিবারবর্গসহ বসবাস করে। দেখে মনে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দুর্গ। রাস্তার কাছেই হাজি আইয়ুব আফ্রিদির সুরক্ষিত বিশাল কম্পাউন্ড। এই হাজি সাহেব পাকিস্তানের নামকরা একজন মাদকদ্রব্য সওদাগর। তার এই ব্যবসার কারণে জাতীয় পরিষদে এক টার্ম সদস্য হতে বাধেনি। একবার এক পাকিস্তানির সাথে দেখা করেছিলাম যে আমেরিকান ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন-এর মূল্যবান তথ্য সরবরাহকারী ছিল। অন্যান্য সংবাদবাহকের (ইনফরম্যান্ট) মত তাকে দেখে মনে হতো কয়েক বছর ধরে তার ভালো ঘুম হয়নি—সদা সতর্ক থাকতো। সে আমাকে বলেছিল 'আফ্রিদির ঐ ভবনটি তৈরি করতে পুরো চার বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই বাড়ির দেয়ালেও গুপ্ত টানেল আছে। এর আছে নিজস্ব পাওয়ার স্টেশন, প্রাঙ্গণে আছে ফলের বাগান। এই ভবনের প্রতিরক্ষার জন্য আছে অনেকগুলো কামান এবং এন্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গান, যা একটা পুরো বিগ্রেডকে প্রতিহত করতে পারে।'

খাইবার পাসের মধ্যদিয়ে আমরা ছোট শহর লান্ডি কোটাল-এ পৌছলাম। পৃথিবীর বৃহত্তম হিরোইন পাচার কেন্দ্র বলে এই শহরটি পরিচিত। সকলের ঘাড়ে বন্দুক ঝুলছে; কারোর মাথায় রঙিন টুপি, কারোর পাগড়ি। রাস্তার ওপর-নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা এখানে জলযোগের জন্য থামলাম না। আমাদের রাস্তা উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে লাগলো। যতক্ষণ না পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুর্গ পর্যন্ত না পৌছলাম।

তারপরেই হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে আফগানিস্তান দৃশ্যমান হল।

আফগানিস্তান শব্দটাই যেন যাদুমন্ত্রের মত। আমি এর আগে কোন দেশ দেখে এতোটা অভিভূত হইনি। আমার কল্পনায় মনে হল এ দেশটি তোলকেনের (Tolkien) 'Lord of the Rings'-এর মতো। রহস্যপূর্ণ দেশ। এ দেশে যেমন মধ্যযুগের 'শিভালরি' আছে, তেমনি আছে নিষ্ঠুরতা—ক্রুয়েলটি। আধুনিক জগতের সাথে এর মিল নেই—যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি ভীতিপ্রদ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়, যা হৃদয়কে আনমনা করে দেয়, মনকে করে কল্পনাপ্রবণ। স্প্যানিশ পরিব্রাজককে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মেক্সিকো দেখতে কেমন ? তিনি একখণ্ড কাগজ নিয়ে ভাঁজ ভাঁজ করে বুঝিয়েছিলেন, সে দেশের সীমাহীন উঁচুনিচু পার্বত্যাঞ্চল। তিনি হয়ত ভালোভাবে আফগানিস্তানের বর্ণনা দিতে পারতেন।

এবং, তারপর আলোর বাহার। যেমন পবিত্র তেমনি স্বচ্ছ, যেন সব কিছুকেই আলোর বন্যায় ভাসিয়ে পবিত্র করে দিচ্ছে, সমুজ্জ্বল করে দিচ্ছে। এ দেখে মনে হয় না, আফগানিস্তান এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ। যদিও এদেশে এখন যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে, তবুও এ স্থান দেখে একজন মানুষ প্রাকৃতিক দৃশ্যে বিমোহিত হতে পারে, যা পশ্চিমের কোন দেশে এ অভিজ্ঞতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বর্ডারের যে দৃশ্য দেখলাম, তা বেডলামের মতো—সবই যেন আপন খেয়ালে ব্যস্ত। আমরা আশা করেছিলাম যে তালিবান প্রহরীরা আমাদের কোন সাহায্য সংস্থার কর্মী ভেবে আমাদের ভিসা ছাড়াই ছেড়ে দেবে। হলোও তাই। তারা কিছুই দেখলো না, এমন কি গাড়ির মধ্যে আমাদের কোন জিনিসপত্র চেক করলো

না, করলে ভিডিওটেপ নিয়ে যেতে পারতাম না, কেননা অন্য ভিজিটরদের মিউজিক ক্যাসেট, ভিডিওটেপ বাজেয়াপ্ত করে, দড়িতে ঝুলিয়ে রেখেছে।

বর্ডার পার হয়ে একটু দূরে যেতেই দেখলাম কবরস্থান নীল পতাকাশোভিত—বোঝা যাচ্ছে এখানে আরব দেশের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহীদ ব্যক্তিদের গোরস্তান। 'এইখানে আমি রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি।' স্থানটিকে নির্দেশ করে আলী আমাদের দেখালো। আরবদের এই সাহসিকতা– যারা বিন লাদেনের নির্দেশে যুদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে মনে রেখাপাত করে, কিন্তু পাগলামি ছাড়া আর কি!

পাকিস্তানি সাংবাদিক ইউসুফজাই–এর মতে আফগানরা খোলা মাঠে সাদা তাঁবু টাঙিয়ে বসে থাকতো এই আশায় যে এই তাঁবু সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং তারা তৎক্ষণাৎ গুলিবর্ষণ করে তাদের হত্যা করবে। তখন তারা হবে শহীদ, আর সোজা স্বর্গবাসী হয়ে নানাধরনের সুখভোগে ব্যস্ত থাকবে। এই বিশ্বাসে অনেকে প্রাণ দিয়েছে, পাগলামি নয়তো কি! ইউসুফজাই বলেছেন আমি একজন আফগানকে দেখলাম কাঁদতে; কারণ, বোমাবর্ষণের পরেও সে বেঁচে গেছে। এই কারণে তার স্বর্গবাস হাত ছাড়া হয়েছে। একজন মুসলিম জেহাদকালে মারা গেল 'শহীদ' হয় এবং তার জন্য স্বর্গের গ্যারান্টি দেয়া থাকে। এক ট্রাডিশন অনুযায়ী বর্ণিত যে—একজন 'শহীদ' ব্যক্তিকে স্বর্গে সত্তরজন কুমারী তরুণী সেবা করে এবং প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। এই কারণেই জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য 'বিশ্বাসী'রা পাগল হয়ে যায়।

আমরা একটা বড় গ্রামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, দেখে মনে হল এখানে সুমারিয়ান নগরীর মতো প্রত্নতত্ত্ববিদরা খননকার্য করে গেছে। কিছু ভাঙা দেয়াল একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে জানান দিচ্ছে যে, এটা কিছুদিন পূর্বে কোলাহলমুখর শহর ছিল। সোভিয়েত সেনাবাহিনী এ ধরনের হাজার হাজার শহর গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে, ফলে পাঁচ মিলিয়ন রিফিউজি বিভিন্ন দিকে আশ্রয়ের খোঁজে ছড়িয়ে গেছে; আর অন্ততপক্ষে এক মিলিয়ন আফগান প্রাণ হারিয়েছে। যুদ্ধ–পূর্ব সময়ে এদেশের জনসংখ্যা ছিল পনের মিলিয়ন বা তার কাছাকাছি।

এই সব সমতল ক্ষেত্রগুলো চাষ করে হয় ফসল বোনা হয়েছে, কিংবা ফলের গাছ লাগানো হয়েছে। এরপর আমরা জালালাবাদে এসে পৌছলাম। বেশ সুবিন্যস্ত শহর। আমরা এখানে অবস্থান করে অপেক্ষা করবো বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে। আলী আমাদের বললো যে, বিন লাদেনের স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ নগরের বাইরে হাদ্দা নামক স্থানে একটি ছোটখাটো তাঁবুঘেরা অঞ্চলে বাস করে।

জালালাবাদ বাজার এলাকায় আমাদের গাড়ি গিয়ে পৌছালো। রাস্তার মধ্যখানে অনেক কার্পেট বিছানো দেখে আমি হতভম্ব হলাম, ব্যাপার কি ? একজন বললো—স্থানীয় ব্যবসাদারদের কারসাজি। তারা এই কার্পেট রাস্তার মাঝে এই কারণে রেখেছে যে, এর ওপর দিয়ে গাড়ি–ঘোড়া চলার পর

কার্পেটগুলো খুব প্রাচীন বলে মনে হবে, আর বিদেশী ক্রেতারা 'অ্যান্টিক' বলে বেশি দাম দিয়ে কিনবে।

আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হল স্প্রিংহার হোটেলে। নামটি হয়েছে দক্ষিণের বরফ ঢাকা পাহাড়ের মনকাড়া দৃশ্যের অনুকরণে। আমি এই হোটেলে চার বছর পূর্বে এসেছিলাম। তখন এই হোটেলের চেহারা ছিল ভীতিপ্রদ, কারণ এখানে সোভিয়েত অফিসারদের ডেরা ছিল। চার বছর পর এই হোটেলের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে; অনেক কিছু বদলে চেহারা হয়েছে অন্যরকম। এক আফগান শিল্পপতি যিনি যুদ্ধের সময় কালিফোর্নিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে হোটেলটিকে আধুনিক আঙ্গিকে রূপদান করেন। নতুন রং ফেরানো, গরম পানির বন্দোবস্ত, সামনে বাগানের কেয়ারি ইত্যাদিতে হোটেলটিকে দর্শনীয় ও যোগ্য করে তোলা হয়েছে বোর্ডারদের কাছে। দুর্ভাগ্য যে, তার ব্যবসা-বিষয়বুদ্ধি বেশি প্রসার লাভ করতে পারেনি তালিবানদের অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার কারণে। তার দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পূর্বে, তালিবান কর্মকর্তারা মোল্লাদের 'কাঙ্গারু কোর্ট' বসিয়েছিল স্প্রিংহার হোটেলের ডাইনিং রুমে এবং ডিক্রি জারি করে এই বলেছিল যে হোটেলটি সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। মাঝে মাঝে হোটেল মালিককে হোটেলে বিষণ্ন বদনে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

আমাদের এই হোটেল রুম থেকে তালিবানদের সম্বন্ধে অনেক ইন্টারেস্টিং সংবাদ পাওয়া গেল। 'তালিবান' শব্দটা 'তালিব' শব্দের বহুবচন-এর অর্থ ধর্মীয় ছাত্র বা শিক্ষার্থী এবং নির্দিষ্টভাবে বোঝায় পাকিস্তানের ও আফগানিস্তানের মাদ্রাসার একদল ধর্মীয় ছাত্রকে। এই ধর্মীয় ছাত্ররা দেশের নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে ১৯৯০ সালের মধ্যভাগে। তালিবানরা বিন লাদেনকে এই কারণে আশ্রয় দিয়ে নিরাপত্তা দেয় যে, বিন লাদেন সোভিয়েতদের দেশ থেকে বিতাড়িত করায় লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি উভয় তরফের ছিল। আমি যখন খালেদ আল ফওয়াজকে লন্ডনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আফগানিস্তানে বিদ্যমান অবস্থায় ইসলামিক রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে। তিনি বলেছিলেন—তালিবানরাই নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করবে।

জালালাবাদে তালিবানরা জাপানি পিক-আপে চড়ে এন্টেনায় সাদা পতাকা উড়িয়ে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়লো। পিক-আপ ভর্তি দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের মাথায় কালো বা সাদা পাগড়ি বাঁধা—মধ্যযুগের যুদ্ধদৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু ঘোড়ার বদলে জাপানি টয়োটা পিক-আপ। শহরের মহিলাদের নির্দেশ মতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরখায় দেহ ঢাকতে হয়, যেন জীবন্ত মানুষ একটা মোটা কাপড়ের খোলের মধ্যে চাপা পড়ে গেল, বাইরে থেকে তাদের দেহের কোন অংশ নজরে পড়ল না। ভূতের মত সচল বস্তু।

একবার শহরের গাড়ি চালনার সময়ে আমরা ট্রাফিক জ্যামে আটকে গেলাম। এই প্রথম এ-দৃশ্য দেখলাম। কয়েক মিনিট পরেই জ্যামের উৎস বোঝা গেল

নামাজের সময় হয়েছে, তাই তালিবানরা গাড়ি চলাচল বন্ধ রেখেছে পাছে নামাজে বিঘ্ন ঘটে শব্দের জন্য। গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম এক তালিবান যোদ্ধা এক অসহায় মানুষকে পেটাচ্ছে লাঠি দিয়ে, কারণ সে তার বাই-সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিল, নেমে দাঁড়ায় নি।

তালিবানদের এই কঠোর শাসন ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা জালালাবাদে কয়েক দিন কাটিয়ে দিলাম। কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। কেন আমরা সেখানে অবস্থান করছি।

হয় তালিবানরা শাসনকার্যে পারদর্শী নয়, নয়তো, আমার ধারণায়, তারা আমাদের মিশন সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিল। অন্যান্য অনেক অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে এটাও একটা অব্যাখ্যাত বিষয়।

বিশ্ব ন্যাটমঞ্চে তালিবানরা ঘৃণ্য (Pariah) জীব বলে চিহ্নিত হয়েছিল। কেননা নারীদের প্রতি তাদের নির্মম নির্যাতন ও মানবেতর আচরণ বিশেষ করে মানবাধিকারের প্রতি বন্য আইনব্যবস্থা। বিশ্বে মাত্র তিনটি দেশ এ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তবুও তাদের কট্টর সমালোচকরা একথা অস্বীকার করতে পারেনি তাদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের কথা : আর তা হল একটি বিপ্লবোত্তর দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।

১৯৯০ সালের প্রথম দিকে আফগানিস্তান ছিল একটা তালিমারা সামন্ত সাম্রাজ্য যেখানে যুদ্ধবাজ গোত্র প্রধানরা ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ১৯৯৩ সালে কাবুল ভিজিটের সময় আমি সে-দেশে নৈরাজ্য, অরাজকতা, মগের মুলুক দেখতে পাই। একদা উপত্যকায় কোলাহলমুখর রাজধানী মনোরম কাবুল নগরী ধর্মীয় মোল্লা ও এথ্নিক নেতাদের মধ্যে দখলের লড়াইয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল। শিয়া মিলিশিয়া ইউনিট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি চেক পোস্টে সৈন্যরা হাস্যচ্ছলে আমাকে এন্টি-এয়ার ক্র্যাফ্‌ট গানের আসনে বসতে বলে এবং কয়েকটা শট্ চালাতে বলে। তারা একথা চিন্তা করেনি বা আমলে আনে নি যে আমার পরিচালিত শেলগুলো শহরে জনতার ভিড়ে পড়তে পারে।

এই সব মিলিশিয়ার মধ্যে অনেকই বালক-বারো-চৌদ্দ বছরের। একটি বালকের হাতে গ্রেনেড, অন্যজনের ঘাড়ে রকেট লেঞ্চার। তৃতীয় বালকটির হাতে একটি রাইফেল—কোন প্রকারে হাতে করে দাঁড়িয়ে আমার ক্যামেরার দিকে চেয়ে আছে ছবি তোলার আগ্রহে। তার বয়স মনে হল দশ।

এই যুদ্ধ বিগ্রহ আশপাশের সব কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের গায়ে শেল বর্ষণের চিহ্ন পরিস্ফুট। কাবুল যাদুঘর যেখানে বুদ্ধিস্ট শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন ছিল এখন খোলা আকাশের নিচে, কেননা এর ছাদ ও সিলিং মর্টারের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ। ১৯৩০ সালের একটি রোলস্ রয়েস গাড়ি যা আফগানিস্তানে রাজার নিজস্ব সম্পদ ছিল, সেটা যাদুঘরের মাঝে ভাঙাচোরা অবস্থায় ধ্বংসস্তূপের অংশ মাত্র। কাবুল এয়ারপোর্টের রান ওয়েতে জ্বলে-পুড়ে যাওয়া এয়ারক্র্যাফ্‌ট জঞ্জাল হয়ে পড়ে আছে।

মনে হচ্ছে আফগানিস্তানে যেন পোলো খেলার পরিবর্তে 'বুজকাশী' খেলা শুরু হয়েছে। 'বুজকাশী' পোলোর মতো ঘোড়সওয়াররা খেলে থাকে। তবে বলের স্থলে প্রতিযোগিতা হয় একটা মস্তকবিহীন বাছুরের মৃতদেহের অধিকার নিয়ে। এ খেলার নিয়ম হল—বাছুরের মৃতদেহ ঘোড়ার খুরে দলিত হবে, টানটানি হবে, তোলা হবে, অন্য প্রতিযোগীর কাছে হারিয়ে যাবে, আবার দখল হবে। এমনিভাবে দখল ও বেদখল হতে হতে সেই বাছুরের শবদেহের সব কিছুই ধুলোয় মিশে যাবে। কাবুল নগরী এখন গলাকাটা বাছুরের শবদেহ।

এই নৈরাজ্য ও অরাজকতার মধ্যেই ১৯৯৩ সালে দেখলাম যে দক্ষিণ পশ্চিমে আফগান নগরী কান্দাহার থেকে বের হয়ে এলে তালিবান। স্থানীয় নগরবাসীরা বছরের পর বছর ধরে মিলিশিয়ার অত্যাচারে ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ ছিল। 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি'র মতো—সাংবাদিকদের ভাষায় 'too good to chcek'। ১৯৯৪ সালে দু'জন স্থানীয় যুদ্ধবাজ, এক তরুণ বালকের জন্য, কান্দাহারের বাজারে ট্যাঙ্ক নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করে। এই ডামাডোলের মাঝে ধর্মীয় ছাত্রের একটি ছোট দল একচক্ষুবিশিষ্ট মোল্লার নেতৃত্বে নগর দখল করে ফেললে স্থানীয় লোকেরা তাদের স্বাগত জানায়। দু'বছরের মধ্যে মোল্লা ওমর ও তার লোকেরা দেশের প্রায় অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলে—কিছুটা স্থানীয় কমান্ডাদের টাকা দিয়ে বশ করে আর বাকিটা বুদ্ধি খাটিয়ে। এই বুদ্ধি হল অতি দ্রুতগতিতে পিক-আপ ভ্যানে আট-দশজন ভারি অস্ত্রধারী যোদ্ধা দিয়ে স্থান দখল করে নেয়া।

এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, তালিবানরা দেশের লোকের, আর কিছু না হোক, নিরাপত্তা এনে দিয়েছে। কান্দাহার থেকে কোয়েটা, পাকিস্তানের মধ্যে, একদা মিলিশিয়া চেক পয়েন্টগুলো তাদের খেয়াল খুশি মতো সাধারণ পথচারীদের কাছ থেকে অবৈধ 'ট্যাক্সের' নামে চাঁদা আদায় করতো, লুটপাট করে নিত। কিন্তু যখন ২০০০ সালে জানুয়ারি মাসে আমি ঐ সব রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করি, রাস্তার মধ্যে অন্য কোন বাধা ছিল না, ছিল শুধু রাস্তার মাঝে মাদি ও মদ্দা উটের যৌনক্রিয়া। লোকে যাত্রায় বাধা পেলেও এই অপারেশনে উভয় পক্ষ—জানোয়ার ও যাত্রী তৃপ্তি লাভ করতো। একপক্ষ কর্মে, অন্য পক্ষ দর্শনে।

সত্যি বলতে কি, সব ধরনের ক্রাইম এবং সামাজিকভাবে অন্যায় আচরণ তালিবানদের আমলে নিয়ন্ত্রণে এসেছিল কিছুটা কঠোর শাস্তির দ্বারা। কারণ চোর, ছ্যাঁচোড়, ছিনতাইকারী চাঁদাবাজদের 'হাত কেটে দেয়া, আর ব্যভিচারের শাস্তি ছিল পাথর মেরে মেরে ফেলা।' একটা অভিনব প্রথা প্রচলিত ছিল হত্যাকারীকে ভিকটিমের পরিবারের সদস্য কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া। এই হাত কাটা ও মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র জনগণের চিত্তবিনোদনের অনুষ্ঠান, কারণ খেলাধুলা, গানবাজনা, যাত্রা, থিয়েটার, টেলিভিশন ইত্যাদি সব বাতিল। দণ্ড দেয়া বা শিরশ্ছেদ ইত্যাদি হত স্টেডিয়ামে, আগে যেখানে ফুটবল খেলা হত। তাই এই কর্ম যখন স্টেডিয়ামে

জনগণের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হত তখন জনগণের উল্লাস করা ছাড়া আর কোন আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্র ছিল না। অনুষ্ঠিত হত শুক্রবারে ছুটির দিনে। যাই হোক, আমি যখন ১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে এক শুক্রবারে স্টেডিয়ামে গেলাম, তখন ফুটবল খেলা হচ্ছিল, কেননা এ ক'বছরে অপরাধীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় হাতকাটা বা মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য দোষী ব্যক্তি পাওয়া যেত না বললেই চলে।

জনগণের নিরাপত্তার উন্নতি হলেও, অনেক আফগান তালিবানদের সামাজিক নীতির বিরূপ সমালোচনা করতো। জালালাবাদে আমার হোটেলে দুটি লোকের সাক্ষাৎ পেলাম যারা আমার সাথে কথা বলতে চাইল। তারা আফগানিস্তানের জাতীয় বিমান কোম্পানি 'আরিয়ানা'-র পাইলট। তারা তালিবানদের নির্দেশ মতে দাড়ি রাখলেও এমনভাবে ছাঁটা, পরীক্ষা করা হলে, সরকারি সার্টিফিকেট পাবে না। যদি সিগারেট তালবান সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত—নিষিদ্ধ নয়, তারা নির্বিকারে ধূমপান করে যাচ্ছিল এবং চাপাকণ্ঠে তালিবান সরকারের নীতি-নির্ধারণগুলোকে মধ্যযুগের গেঁয়ো আচরণ বলে আখ্যায়িত করছিল। আর বলছিল এসব শহরবাসীদের জন্য মোটেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়।

আমি যখন বললাম যে, আর যাই হোক তালিবানরা একটা ভালো কাজ করেছে-দেশবাসীদের নিরাপত্তা এনে দিয়েছে। এর উত্তরে একজন বলল হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে নিরাপত্তা আছে জেলখানায়, বাইরে নয়।

একদিন সকালে আমি জালালাবাদের কেন্দ্রস্থল দিয়ে হাঁটছিলাম, সাথে ছিল আরনেট। তখন এক মহিলা সম্পূর্ণ বোরখাবৃত্ত হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াল। কাছ থেকে তার পায়ের জুতো বোরখার নিচে দেখা গেল। চকচকে নতুন একজোড়া জুতা। আমাদের কাছাকাছি এসে ইংরেজিতে বললো হ্যালো, সুপ্রভাত, হাউ আর ইউ-কেমন আছ ? সে আরো বলল 'তালিবানরা আমাকে এই পরিচ্ছদ পরতে বাধ্য করলেও আমার চিন্তাধারাকে বন্দি করতে পারেনি।' বোঝা গেল এখনও কিছু শিক্ষিত মহিলা এইভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে।

জালালাবাদ হোটেলে কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর, আমাদের কাছে বিন লাদেনের দূত এলো সংবাদ নিয়ে। লোকটি নিজেকে বিন লাদেনের 'মিডিয়া অ্যাডভাইজার' বলে পরিচয় দিল। লোকটি যুবক এবং তার ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা, যা তার মুখের বেশিভাগই ঢেকে রেখেছে। তাকে সদালাপী বলে মনে হল, তবে তার কাজে দক্ষতা আছে। জিজ্ঞাসা করল যে সে কি ক্যামেরা এবং সাউন্ড ইকুইপমেন্ট দেখতে পারে ? আমাদের যন্ত্রপাতি সার্ভে করার পর সে মন্তব্য করলো : তোমরা এসব যন্ত্রপাতি ইন্টারভিউতে আনতে পারো না। এতোদিন ফলাফল এমনি হবে চিন্তাই করিনি। সত্যি ভাগ্যটা মন্দ, আর কি!

কিছু আশার আলো পাওয়া গেল যখন মিডিয়া অ্যাডভাইজার বলল যে আমরা ইন্টারভিউর দৃশ্য গ্রহণ করতে পারি হাতের ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে। আমি জানতাম যে আমাদের পেশাগত যন্ত্রপাতি নিয়ে দৃশ্যগ্রহণ করলে কাজটা ভালো

হতো, কিন্তু তর্ক করার উপায় নেই। বিন লাদেনের ভয় যে, অপরিচিত ব্যক্তিদের ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে কিছু অদৃশ্য যন্ত্র লুকানো থাকে যাতে 'লোকেসানের' ছবিও ধারণ করা যায়। (আলী অবশ্য বলেছিল যে টেরি ওয়েট বলে অ্যাংগ্লিকান চার্চের এক এনভয় ১৯৮০ বৈরুতে বিদেশী হোস্টেজদের মুক্তি আলোচনাকালে নিজেই বন্দি হয়েছিল এ ধরনের ইলেকট্রনিক ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার কারণে)।

বিন লাদেনের লোকেরা কোন চান্স দেয় না, রাখেও না। আমাদের সাথে ঘড়িও নিতে দেয়া হয়নি। চলে যাওয়ার পূর্বে মিডিয়া অ্যাডভাইজার বলেছিল : শুধু পরনের কাপড়টুকু পরে আসবে, আর কিছু না। সে বলে গেল যে, পরদিনই আমাদের তারা নিয়ে যাবে।

পরদিন বিকালে একটা পুরনো সবুজ ভক্সওয়াগন ভ্যান আমাদের হোটেলে এসে দাঁড়ালো। আলী আমাদের তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়ে গাড়ির জানালার সব পর্দা টেনে দিল। সূর্য ডুবে গেলে আমাদের গাড়ি চললো পশ্চিমের রাস্তা ধরে কাবুলের দিকে। গাড়ির মধ্যে তিনজন অস্ত্রধারী প্রহরী মোতায়েন ছিল।

আমাদের যাত্রা গভীর নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে চলছিল। কারোর মুখে কথা নেই।

একটা লম্বা টানেলের মধ্য দিয়ে যাত্রার পর, আলী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে খুব ভদ্রভাবে বললো : এই পয়েন্টে আমরা অতিথিদের বলি যদি কোন গোপন যন্ত্র থাকে তাহলে স্বীকার কর, যাতে পরে কোন সমস্যা না হয়। আমাদের মনে হলো কোন 'সমস্যা' হলে, আর প্রাণ নিয়ে ফেরার উপায় নেই, সাথে সাথে ধড় থেকে কল্লা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমি ভয়ে ভয়ে আমার দুই কলিগের দিকে তাকালাম। আমি কি ধরে নিতে পারি যে আমার কলিকদের কাছে কোন সন্দেহজনক কিছু নেই। পরে আমি আলীকে আশ্বাস দিয়ে বললাম : আমরা পরিষ্কার। ইউ আর ক্লিয়ার।

রাত্রি হয়েছে এবং চাঁদের আলো বেশ টকটকে। এই আলোতে আমরা পাহাড়ি অঞ্চলের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। কিছুক্ষণের পর আমরা একটা ছোট উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম; এখন আমাদের গাড়ি থেকে নামতে বলা হল। আমাদের প্রত্যেককে কার্ডবোর্ড দিয়ে ঢাকা লেন্স যুক্ত চমশা দেয়া হল পরতে। ফলে আমরা অন্ধ হলাম। নজরে কিছুই পড়ছে না। এরপর আমাদের অন্য একটি গাড়িতে ওঠানো হল, উঠে বসার পর আমাদের চমশা খুলতে বলা হল। দেখলাম আমরা একটি জিপের মধ্যে, জানালা কালো রং করা–বাইরে দৃষ্টি পড়ে না। গাড়ি ওপরের দিকে উঠতে লাগলো—স্থানে স্থানে পাথর বিছানো পথ, অন্যখানে রাস্তা কিছু উন্নত, মেরামত করা। এই যাত্রা পথে আমরা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বললাম না। আমাদের কোন ধারণাই নেই, এ যাত্রার শেষ কোথায়।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা লোক লাফিয়ে আমাদের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির প্রতি আরপিজি তাক করলো। আরপিজি হল—রকেট প্রপেল্‌ড গ্রেনেড। সে চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বললো এবং ড্রাইভারের সাথে দ্রুত বাতচিত করে

রাস্তা ছেড়ে দিল। কয়েক মিনিট পরে ঠিক এ ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটলো। শেষে প্রায় অর্ধ–ডজনের মতো একটি দল বের হয়ে এলো এবং ইশারায় আমাদের গাড়ি থেকে নামতে বললো। তারা সবাই রাশিয়ান পিকে সাবমেশিন গান ও আরপিজিতে সুসজ্জিত ছিল।

'ভয় পেয়ো না'—তাদের হাট্টা–গোট্টা সৌদি দলপতি বলল। তারপর ভদ্রভাবে আমাদের গাড়ি থেকে নামতে ইশারা করলো। এরপর ভাঙা ইংরেজিতে সে বললো—"এবার তোমাদের তল্লাশি নেয়া হবে। তারা আমাদের পেশাগতভাবে দাঁড় করিয়ে লাল ফ্ল্যাশ লাইটযুক্ত যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো। মনে হল স্ক্যান্ করা হচ্ছে, কিছু লুকানো থাকলে তাকে শনাক্ত করা। তল্লাশিতে অবশ্য কিছু পাওয়া গেল না।"

তারপর আমাদের গাড়িতে চড়িয়ে পাঁচ হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ে পাথর ভর্তি উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হল। আফগানিস্তানে মার্চ মাসে পাহাড়ি অঞ্চলে বেশ শীত। ভাগ্যিস সাথে জ্যাকেট এনেছিলাম। এরপর আমাদের একটি মাটির কুটিরে নিয়ে যাওয়া হল, কম্বল সারি সারি টাঙানো। এখানেই বিন লাদেনের সাথে দেখা হবে। সেই কুটিরের চারপাশে মাটির কুটিরের সারি। সাধারণত এখানে সময় সময় 'কুচিজ'–রা বাস করে। এরা পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ আফগান। এরা মরু অঞ্চলেও ঘোরাফেরা করে গরু–ভেড়ার দল নিয়ে। আমরা একটা জেনারেটরের হাল্‌কা শব্দ শুনতে পেলাম। বিন লাদেনের লোকেরা চালু করেছে যাতে আমরা বাতি ও ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারি।

কুটিরের মধ্যে একটা কেরোসিন বাতি জ্বলছে তার আলোতে বিন লাদেনের অনুসারীদের মুখ দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু আরব, বাকিরা কালো, মনে হলো আফ্রিকান। তারা আমাদের ডিনার খেতে দিল এক প্লেট ভাত, নানরুটি, কিছু মাংস–কোন জন্তুর চেনা গেল না। ছাগল, না ভেড়া ? সেই অল্প আলোর মধ্যে চেনা মুস্কিল। আমি সাধারণত খুব ভালো করে নিশ্চিত না হয়ে রাস্তায় কোন খাদ্য গ্রহণ করি না; কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিছু মুখে তুলতে হল।

আমি হিসেব করে দেখলাম মধ্য রাত্রির কিছু আগে বিন লাদেন তার সাঙ্গা–পাঙ্গাসহ হাজির হল সাথে একজন দোভাষী এবং বডিগার্ড। লম্বা মানুষ, ছ'–ফুটের ওপর উঁচু, চোখা নাক। মাথায় পাগড়ি, সাদা জোব্বা গায়ে এবং সবুজ রং–এর সেনা–পোশাক। তাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হল। এমন নিরীহ মানুষ সাধু–ফকিরের চেহেরা, বিপ্লবী বলে মনে হয় না। তার চারপাশে স্তাবকের দল তাকে অতি শ্রদ্ধাভরে 'শেখ' বলে সম্বোধন করছে। হাতের কালাশনিকভ রাইফেলটা পাশে রেখে বসলো। তার চামচারা বললো যে—'তিনি এক রাশিয়ানকে হত্যা করে এই অস্ত্র উদ্ধার করেন'।

জোভেনাল তার বাতি ও ক্যামেরা ঠিকঠাক করে তৈরি হল। পিটার আরনেট ও আমি প্রশ্নাবলির লম্বা লিস্ট তৈরি করেছিলাম। সে সময় আমাদের বরাদ্দ ছিল,

এতগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়া মুস্কিল। আমাদের প্রশ্নগুলো আগাম দিতে বলা হল এবং বিন লাদেনের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার ও অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্নগুলো বিচার করে দেখলো। বারবার ওয়াল্টারের মত আমরা তার বংশের ঠিকুজী জানতে চাইনি। বিন লাদেন শুধু তার রাজনৈতিক মতবাদ ও কেন সে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ভায়োলেন্স প্রচার করে এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত।

গলার স্বর নামিয়ে বিন লাদেন আরবিতে আমেরিকার বিরুদ্ধে বলতে শুরু করল মুসলিমদের ওপর আমেরিকার ও সৌদি আরবের অবিচার ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। আমাদের মুখ্য সমস্যা আমেরিকান সরকার...আমেরিকার খয়ের খাঁ হয়ে সৌদি সরকারও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে। বিন লাদেনের এই অভিযোগ। সে রাখ-তাক না করে বলে গেল যে, তার আসল উদ্দেশ্য সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব গড়ে তোলা এবং সেখানে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সপ্তম শতাব্দির বিধান মতে সরকার চালু হবে—যেমন প্রফেট মোহাম্মদ-এর সময় ছিল। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আরব উপসাগরে মুসলমানরা জয়ী হবে এবং ঈশ্বরের ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাবে। আমাদের আশা যে, প্রফেট মোহাম্মদের কাছে যে ঐশীবাণী এসেছিল সে মতে শাসনকার্য পরিচালিত হবে।

বিন লাদেন সারা ইন্টারভিউর সময় মাঝে মাঝে আস্তে কাশি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে চা-এর সেবা করছিল। অবশ্য আফগান পার্বত্য অঞ্চলের ঠাণ্ডা লাগিয়ে সে তখন সর্দিতে ভুগছিলো। তবু তার মৃদু কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎকারের কাজ চলছিল। আর মাঝে মাঝে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছিল। তার পরে বলল : আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছি, কারণ আমেরিকা সরকার যে-সব কুকর্ম করেছে তা অন্যায় এবং জগন্য ও ক্রিমিনাল, বিশেষ করে ইসরাইলকে সাহায্য করায় তারা প্যালেস্টাইন দখল করেছে এবং প্যালেস্টাইনিদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চলছে তাদেরই সরাসরি সহযোগিতায়। তাদের কর্মকাণ্ড মানবতা-বিরুদ্ধ এবং তাদের আচরণ সভ্যসমাজের সকল মানবীয় আচরণ-বিরুদ্ধ। তারা যেভাবে দুর্বল দেশগুলোর ওপর তাদের অমানুষিক আচরণ করছে এর পূর্বে পৃথিবীর আর কোন বৃহৎ শক্তি করেনি। ইহুদিদের সাথে আমেরিকার গলাগলি, তাদের হটকারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার এত দূরে পৌছেছে যে তারা আরব ভূমি দখল করতে বসেছে। এর জন্য এবং অন্যান্য আগ্রাসন ও অবিচারের কারণে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছি, কারণ আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আমেরিকানদের সব মুসলিম দেশ থেকে তাড়াতে সক্ষম হব।

বিন লাদেনের বক্তব্য দেয়াকালে প্রায় তার ডজন খানেক অনুচর মনযোগ দিয়ে শুনছিল—বিশেষ করে যখন সে আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এই জেহাদের ডাক ছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যারা সৌদি আরবে ডেরা গড়ে বসে আছে। বিন লাদেন

'সৌদি আরব' কথাটা উচ্চারণ করে না, কারণ সৌদি রাজ বংশকে সে ঘৃণা করে; তাই সৌদি আরবের স্থলে দুটি পবিত্র ভূমি শব্দ সে ব্যবহার করে।

বিন লাদেন বলে এই দুই পবিত্র ভূমির দেশের জন্য সারা বিশ্বের মুসলিম দেশ ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আমাদের ধর্মে, এই দেশে কোন অমুসলিমের অবস্থান নিষিদ্ধ। এই জন্য আমেরিকার সিভিলিয়ানরা আমাদের টারগেট না হলেও আমরা সেই সেনাবাহিনীকে উৎখাত করার অভিপ্রায়ে সেই দেশের সিভিলিয়ানদের নিরপত্তার গ্যারেন্টি দিতে পারি না।

এই প্রথম বিন লাদেন পশ্চিমা দেশের প্রেসের কাছে বলে ছিল যে, আমেরিকান সিভিলিয়ানরা তার ধর্মযুদ্ধের শিকার হতে পারে। এর এক বছর পর সে এবিসি নিউজকে বলেছিল যে সে আমেরিকান সিভিল ও মিলিটারির মধ্যে পার্থক্য করেনা, উভয়েই তার লক্ষ্যবস্তু, যদিও কোরানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে ধর্মযুদ্ধে সিভিলিয়ানদের নিরাপত্তা আছে, তারা টারগেট নয়।

বিন লাদেন এও ব্যক্ত করে যে ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হওয়ায় আমেরিকা আরো ধনবান ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়েনের পতনের পর আমেরিকা আরো উগ্রবাদীও হটকারী হয়ে গেছে এবং তারা মনে করছে যে এখন তারা সারা দুনিয়ার মালিক এবং তারা একটা 'নতুন বিশ্ব প্রকৃতি' প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর।

বিন লাদেন 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ' বন্ধ হওয়ার পর যে বিশ্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার সমালোচনা করল কিন্তু সে এটা ভুলে গেল যে এই ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হওয়ার কারণে বিভিন্ন দেশের বর্ডার শিথিল হওয়াতেই তার সংস্থার মানুষরা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে পেরেছে। আমেরিকার সূত্র মতে, ১৯৯০ সালের পরেই প্রায় বিশটি দেশে তার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই দেশগুলোর মধ্যে কয়েকটি যা ঠাণ্ডাযুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর গড়ে উঠে—সে দেশগুলো হল ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া, তাজিকিস্তান ও আজারবাইজান এবং বিন লাদেন নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তিত ধারায় এই সব দেশে সন্ত্রাসীদের ধারাবাহিক অপারেশন চালিয়ে যেতে পারছে। যখন বিন লাদেন সৌদি আরব থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ সরিয়ে সুদান ও আফগানিস্তানে নিয়ে আসে তখন তার অনুসারীরা খুশি হয়ে বিশ্বায়নের পরিবেশকে স্বাগত জানায়। তারা তাদের আমেরিকান সেটেলাইট ফোন ও জাপানি কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম এক দেশ থেকে অন্যদেশে পাঠাবার সুযোগ গ্রহণ করে। বিন লাদেনের 'ফতোয়া' ফ্যাক্স করে অন্য সব দেশে পাঠানো হয়—বিশেষ করে ইংল্যান্ডে যেখানে আরবি ভাষায় সংবাদ ছাপিয়ে সারা মধ্যপ্রাচ্যে বিলি করা হয়। এইভাবেই বিন লাদেন তার বিশ্ব নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে।

বিল লাদেন তার নিজস্ব বিশ্বায়নের প্রস্তাব তুলে ধরল এবং বলল মুসলিম বিশ্বে আবার পুরানো দিনের খলিফা পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং তা শুরু হবে আফগানিস্তান থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অটোমেন সাম্রাজ্যের পর মুসলিম উম্মাহ ইসলামের সবুজ পতাকা তুলে কিছু সংগঠিত থাকলেও নড়বড়ে ছিল।

তখন অটোমেন সাম্রাজ্যের খলিফা ইউরোপের 'দুর্বল মানব' বলে পরিচিত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে সন্ধি হয় তাতে সিরিয়া ও ইরাকের অবস্থা, অস্তিত্ব ও তার ভিত দৃঢ় ছিল না, পশ্চিমা শক্তির তাঁবেদার রাষ্ট্র ছিল। বিন লাদেনের উদ্দেশ্য এমন অবস্থা তৈরি করা যাতে খলিফা পদ্ধতি পুনর্জন্ম নেবে যেখানে মুসলিম উম্মাহ বা কমিউনিটি তিউনিশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রফেট মোহাম্মদের নির্দেশিত বিধানের ওপর সব কিছু পরিচালিত হবে যেমন ব্রিটিশ সাম্রজ্যের পরিধি বিস্তৃত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইজিপ্ট থেকে বার্মা পর্যন্ত। খলিফার সাম্রাজ্যের পুনর্জন্ম ঘটবে হঠাৎ, যেমন ঘটেছিল হলি রোমান এম্পায়ের সাম্রাজ্য এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে বিন লাদেন ও তার অনুসারীদের হাতের মুঠির মধ্যে।

সাক্ষাৎকারকালে বিন লাদেনের দোভাষী যতদূর সম্ভব তার বক্তব্য ইংরেজিতে পরিচ্ছন্নভাবেই রূপান্তর করেছে, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। মধ্যে মধ্যে যদিও বিন লাদেনকে কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল ইংরেজি ভার্সানে পুরোটা রূপান্তর করার পূর্বে। তাই মনে হয়েছে বিন লাদেন ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলো না। এক প্রশ্নের জবাবে বিন লাদেন বলে যে আমেরিকা এখন দু'মুখো নীতি—ডবল ট্যান্‌ডার্ড অবলম্বন করছে সন্ত্রাসবাদী ব্যাপারে। একদিকে তারা সন্ত্রাসের ঘোর বিরুদ্ধে, অন্যদিকে প্যালেস্টাইনে সন্ত্রাস পালনে তৎপর। পরে সে বলল আমেরিকা আমাদের দেশ দখল করতে চায়, সম্পদ লুট করতে চায়, আমাদের ওপরে তাদের এজেন্ট দিয়ে শাসন করতে চায়—এবং শেষমেষ চায় আমরা তাদের তাঁবেদারি করি। আমরা অস্বীকার প্রতিবাদ করলে তারা বলে আমরা সন্ত্রাসী। আমেরিকার আচরণের প্রতি একটু দৃষ্টি দিয়েই আমরা দেখতে পাই যে এরা দরিদ্র প্যালেস্টাইনি শিশুদের আচরণের কড়া বিচার করে, যাদের দেশ ইসরাইল দখল করে বসে আছে। যদি ছোটছেলেরা পাথর ছোড়ে ইসরাইলদের বিরুদ্ধে, তারা বলে ওরা এই বয়সেই সন্ত্রাসী হয়েছে। অথচ যখন ইসরাইলি পাইলটরা জাতিসংঘের ভবন লেবাননে, যেখানে পালেস্টাইনি নারী ও শিশু ভর্তি ছিল—বোমা ফেলে, তখন আমেরিকা ইসরাইলি বোমারু বিমানকে দায়ী করে নিন্দাবাদ করেনি। (এ ঘটনা ১৮ এপ্রিল ১৯৯৬–এর। ইসরাইল জোর করে হেজবুল্লাহ গেরিলাদের জাতিসংঘের ভবন কানা, লেবালন আক্রমণ করে মারার অজুহাতে ১০২ জন লেবানিজ সিভিলিয়ান হত্যা করে। ইসরাইল জাতিসংঘের এই ভবনে আক্রমণের কথাকে দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করে—অবশ্য তাদের দাবি জাতিসংঘ পরে নাকচ করে দেয়)।

বিন লাদেন ক্ষুব্ধস্বরে আরও বলল মজার ব্যাপার হল মুসলিমদের যারা অধিকারের প্রশ্ন তোলে, আমেরিকানরা তাদের নিন্দা করে, কিন্তু, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে (গেরি আদমস্) রাজনৈতিক নেতা হিসেবে হোয়াইট হাউসে সম্বর্ধনা দেয়। যেদিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি আমরা আমেরিকাকে বিশ্বের সন্ত্রাসীদের নেতা হিসেবে দেখতে পাই। আমেরিকা হাজার হাজার মাইল দূরে এটম ফেলাকে সন্ত্রাসী কর্ম বলে মনে করে না, সেই বোমা শুধু

সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে না, সারা দেশের সিভিলিয়ানদেরসহ সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। সেই বোমা সারা জাতির ওপর–নারী–শিশু–বৃদ্ধসহ–কার্যকর হয় এবং সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এখনো পর্যন্ত সেই বোমার চিহ্ন জাপানে রয়ে গেছে।

তারপর বিন লাদেন আমাদের বিস্মিত করে স্বীকার করল যে তার সাথে যেসব আরব কাজ করে, তারাই ১৯৯৩-তে সোমালিয়ায় আমেরিকান ট্রুপস্ হত্যায় শামিল ছিল—এ দাবি বিন লাদেন আরব সংবাদপত্রে আগেই প্রকাশ করেছিলো। আমরা সেই আমেরিকান সেনাদের ছিন্ন–ভিন্ন মৃতদেহগুলো মোগাদিশুর রাস্তায় টানাটানি করতে দেখেছি টেলিভিশনে। আগে যা জানা ছিল না, ঘটনার পর জানা গেছে যে বিন লাদেনের দল সোমালীদের প্রশিক্ষিত করেছিল যারা এই অপারেশনকে কার্যকর করেছে।

বিন লাদেন আমাদের বলল আমেরিকানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করা হয়েছিল, কারণ মুসলিমরা বিশ্বাস করেনি যে আমেরিকানরা সোমালিয়ায় মুসলিমদের সাহায্যের জন্য গিয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবানি যে, সোমালিয়ার মুসলমান আফগানিস্তানে জেহাদরত আরব জেহাদিদের সহযোগিতা করেছিল। তারা মিলিতভাবে আমেরিকার দখলদার সেনাদের হত্যা করতে সফল হয়। বিন লাদেনের কাছে সোমালিয়ার সাফল্য একটা উত্তেজক বিজয়।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে কি বাণী তিনি পাঠাবেন জিজ্ঞাসা করা হলে, বিন লাদেন বলেছিল ক্লিনটন বা আমেরিকা সরকারের কোন কর্মকর্তার নাম তার কাছে ঘৃণা ও বিরক্তির। কেননা ক্লিনটন ও বুশ এবং আমেরিকান সরকারের নাম শুনলে তার মনে ঐসব নিষ্পাপ শিশুর ছবি উদয় হয়, যেসব শিশু এদের নিষ্ঠুর আক্রমণে ইরাকে মারা গেছে। বিন লাদেন ১৯৯৬ সালের মে মাসে ইরাকে প্রায় ৫ লাখ শিশু মারা পড়ে বলে উল্লেখ করে; জাতিসংঘ ১৯৯০ সালে ইরাকের ওপর তাদের প্রস্তাব না মানার কারণে যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল—সেই ঘটনাও উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করে।

বিন লাদেন আরো বলল যে মুসলিমদের হৃদয় আমেরিকা ও আমেরিকান প্রেসিডেন্টের প্রতি ঘৃণায় ভরে আছে। প্রেসিডেন্ট হৃদয়হীন—যে হৃদয় শত শত শিশু হত্যায় দ্বিধা করে না। আরব পেনিনসুলার অধিবাসীদের কোন ভাষা নেই প্রেসিডেন্টকে বাণী পাঠানোর জন্য, কেননা প্রেসিডেন্টের কোন শুভেচ্ছা বাণী আরবদের জন্য নেই। আপনাদের মাধ্যমে আমার কোন বাণী পাঠানোর থাকলে, সে বাণী আমি পাঠাবো আমেরিকান সেনাবাহিনীর ঐসব মায়েদের যাদের সন্তানরা সামরিক ইউনিফরম গায়ে চড়িয়ে আমাদের দেশে গর্বভরে পদচারণা করেছেন। আমি বলব যে, এ দৃশ্য বিলিয়ন মুসলিমদের ওপর নিছক প্ররোচনা, উস্কানি। এইসব মায়ের কাছে আমার নিবেদন, যদি তাদের সন্তানদের জন্য কোন মমতা থাকে তাহলে তারা যেন আমেরিকান সরকারের নীতির প্রতিবাদ করেন।

সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ হল; কিন্তু বিন লাদেন কয়েক মিনিট মামুলি কথাবার্তা বলার পর ভদ্রভাবে আমাদের চা পরিবেশন করল। তারপর কথাবার্তা মোড় নিল ইরান ও সাদ্দাম হোসেনের দিকে। গাল্ফ যুদ্ধের সময় আরনেট সাদ্দাম হোসেনের ইন্টারভিউ নিয়েছিল। বিন লাদেন বলল যে, ইরাকের স্বৈরশাসক চেয়েছিল কুয়েতের তেল কব্জা করতে। সে সত্যিকারের একজন মুসলিম নয়।

ছবি তোলার জন্য কয়েকটি পোজ দিয়ে বিন লাদেন যেমন তড়িঘড়ি করে এসেছিল, তেমনিভাবে চলে গেল। বিন লাদেন আমাদের সাথে একঘণ্টার কিছু বেশি সময় কাটিয়েছিল! কিন্তু মিডিয়া এডভাইজার ইন্টারভিউর টেপ দিতে গাঁইগুঁই করল। প্রথমত সে বিন লাদেনের কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা মুছে দিতে চাইল। বিন লাদেনের কয়েকজন গার্ড সেখানে মওজুদ থাকায় আমরা তাকে থামাতে পারলাম না। আমি দেখলাম টেপের কিছু কথাবার্তা ক্যামেরা থেকে মুছে দেবার চেষ্টা করল। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে সে আলীর সাথে একশর্ত জুড়ে দিল আমাদের টেপ দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে। কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হল। শেষে আলী জিতে গেল এবং আমাদের দুটো টেপ দিল। যা দেশলাই-এর বাক্স থেকে কিছুটা বড়। আমি ঐ দুটোকে খুব নিরাপদ স্থানে রেখে দিলাম—আমার প্যান্টের নিচে যে মানি-বেল্ট আঁটা ছিল তার মধ্যে।

আলী জিজ্ঞাসা করল ইন্টারভিউতে বিন লাদেন যেখানে ক্লিনটনকে আক্রমণ করেছে, তুমি কি সেটা ব্যবহার করবে ? তখন আমরা সেই কাদার কুটিরের বাইরে আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে। রাত তখন ভারি হয়েছে, চারদিক নিস্তব্ধ; শীতও পড়েছে। আকাশ পরিচ্ছন্ন, নির্মল। 'অবশ্যই করবো'—আমি আলীর প্রশ্নের উত্তর দিলাম। দেখলাম আলী অবাক দৃষ্টি মেলে চাইল। সে অবশ্য জানতো মিডিয়ার ওপর সরকারের কড়া নিয়ন্ত্রণ আছে।

পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা স্ক্রিপ্ট লিখলাম ও সম্পাদনা করলাম। এটা প্রচার করা হল ১৯৯৭-এর ১২মে আমেরিকা থেকে। শত শত দেশের মানুষের কানে গেল এই ইন্টারভিউর কথা। সৌদি আরাবিয়াতে সেই সংবাদপত্রের কপি বাজেয়াপ্ত হল যাতে ছেপেছিল সে কাহিনী। আর আমেরিকান এসোসিয়েট প্রেস আমেরিকার সংবাদপত্রের কিছু অংশ নিয়েছিল, তাছাড়া সে-কাহিনীর আর অঙ্গাছেদ হয়নি।

কিন্তু আমাদের ব্রডকাস্ট-এর শেষ লাইনটা আমার কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বারবার।

তার ভবিষ্যৎ প্ল্যান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়—যখন বিন লাদেন বলেছিল—

—সেটা মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা দেখবেন এবং শুনবেন—আল্লাহ হাফেজ।

অধ্যায়—এক

আমেরিকা যখন ঘুমিয়ে

(While America Slept)

'I have always dreamed', he mouthed, fiercely, 'of a band of men absolute in their resolve to discard all scruples in the choice of means, strong enough to give themselves frankly the name of destroyers, and free from the taint of resigned pessimism which rots the world. No pity for anything on earth, including themselves, and death enlisted for good and all in the service of humanity...'

Joseph Conrad, *The Secret Agent*

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের প্রভাত। বিশ্বের অন্যান্য প্রভাতের মত আমেরিকায় এই প্রভাত সরব ও প্রাণবন্ত ছিল। আমেরিকার ইস্ট—কোস্টে, বাতাস ছিল নির্মল ও স্নিগ্ধ, আকাশ ছিল অন্তহীন অমলিন ও সবুজ। আমেরিকার সকালের মতোই সব কিছু। সুন্দর, সমুজ্জ্বল। সাথে কুকুর—চেন হাতে করে বেড়াবার মতো; রাস্তার ধারে কাছে যাবার সময় এক কাপ গরম কফি খাবার মতো এবং আকাশে বিমান ভ্রমণের উপযুক্ত একটি সকাল।

কিন্তু নাইনটিন মিড্ল ইস্টার্ন মানুষদের জন্য যারা বোস্টনের নিউআর্ক (Newark)—এর প্লেনে আরোহণ করেছিল এবং ওয়াশিংটন ওয়েস্ট কোস্টের জন্য এই সকালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবহাওয়ার ইতর বিশেষে একটু দেরি হলে, আমেরিকার শত্রুদের প্ল্যান মারাত্মকভাবে বানচাল করে দিতে পারতো।

সকাল ৭—৪৫ মিনিটে লস এঞ্জেলেস—এর জন্য আমেরিকান এয়ার লাইনস্ ফ্লাইট ১১ এবং তেরো মিনিট পর ইউনাইটেড এয়ারলাইনস্ ফ্লাইট ১৭৫—র গন্তব্যস্থল একই ছিল। তিন মিনিটের মধ্যে। ইউনাইটেড এয়ারলাইনস্ ফ্লাইট ৯৩ সানফ্রান্সিস্কোর জন্য নিউআর্ক ছেড়ে দিল। সকাল ৮—১০ মিনিটে আমেরিকান এয়ারলাইনস্ ফ্লাইট ৭৭ লস এঞ্জেলেসের জন্য ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্ট ছেড়ে গেল।

বক্সকার্টার ও চাকুসহ কয়েকজন মানুষ অতি ক্ষিপ্রগতিতে দখল করে নিল এই চারটি প্লেনের নিয়ন্ত্রণ এবং প্লেনের গতি ঘুরিয়ে দিল তাদের লক্ষ্যবস্তু ম্যানহাটন্ ও ওয়াশিংটনের দিকে। সকাল ৮-৪৫ মিনিটে আমেরিকান এয়ারলাইনস্ ফ্লাইট ১১ অন্যান্য প্লেনের মতো লম্বা যাত্রার জন্য ট্যাঙ্ক পরিপূর্ণ ছিল জ্বালানি দ্রব্যে—এই প্লেন সজোরে আঘাত করলো ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারকে, ভবনের মধ্যে বিশাল আগুনের গোলা ঢুকে গেল। বিশ মিনিট পরে ইউনাইটেড এয়ারলাইনস্ -এর ফ্লাইট ১৭৫, উড়ন্ত বোমার মত দক্ষিণ টাওয়ারে ফেটে পড়লো। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে, উভয় আকাশচুম্বি ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। সকাল ৯-৩৯ মিনিটে, আমেরিকান এয়ার লাইট ফ্লাইট ৭৭ পেন্টাগনের একাংশ ধসিয়ে দিল। কেবলমাত্র ইউনাইটেড এয়ারলাইনস ফ্লাইট ৯৩ কোন রকমে একটা সংঘাত এড়িয়ে গেল। প্লেনের মধ্যে কেমন ধ্বস্তাধস্তি হয়েছিল কেউ জানে না, কিন্তু জেট প্লেনটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নেমে পেনসিলভানিয়ায় পিট্সবার্গ-এ বিধ্বস্ত হল। যাত্রী যত ছিল প্রাণে বাঁচলো না।

একঘণ্টার ওপর হবে এমনি সময়ের মধ্যে পাঁচ হাজারের বেশি আমেরিকান প্রাণ হারালো এই ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাসে, যা আমেরিকাতে প্রথম। এই অচিন্ত্যনীয় ক্রাইমের জন্য শুধু আমেরিকান মারা গেল না, পৃথিবীর অন্য পঞ্চাশটি দেশের গ্রেট ব্রিটেনসহ দুশোর বেশি নাগরিক প্রাণ হারাল এই অমানুষিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে।

নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে এই দ্বৈত আক্রমণ আমেরিকার বিরুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনের জেহাদের সর্ব-বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা—যে জেহাদ মাত্র এক দশকের পূর্বে ইয়েমেনের এক হোটেলে আমেরিকান সেনাবাহিনীর ওপর বোমাবর্ষণ থেকে শুরু। ঐ হোটেলে একজন অস্ট্রেলিয়ান টুরিস্টও মারা যায়, কিন্তু তারপর থেকে পরের বছরে আক্রমণগুলো আরো সফিস্টিকেটেড ও মারাত্মক আকারের ছিল। ১৯৯৮-এ আফ্রিকায় আমেরিকার দুটি এম্বেসিতে দুশোর বেশি মানুষ মারা পড়ে বোমার আঘাতে। তারপর ২০০০ সালের অক্টোবরে ইয়েমেনে আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ ইউএসএস কোলে বোমা মেরে ১৭ জন আমেরিকান সেন্যের প্রাণহানি ঘটানো হয়।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভিকটিমদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক দুর্দৈব ঘটনা হল জন ও' নীলের মৃত্যু। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি বিন লাদেন সম্বন্ধে বেশি খবরাখবর রাখতেন এবং তিনি এম্বেসি বোম্বিং ও কোলে জাহাজ আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে এফবিআই-এর তদন্ত পরিচালনা করেছিলেন। একজন স্পষ্ট-বক্তা-ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইউএস সরকারের কট্টর ব্যুরোক্রাসি-মনা কর্মকর্তাদের সুনজরে না থাকায় মাত্র দু'সপ্তাহ আগে আফবিআই থেকে অবসর নেন এবং ট্রেড সেন্টারে নিরাপত্তা দলের নেতারূপে উদ্ধার কাজ করতে গিয়ে দেয়াল চাপা পড়ে মারা যান।

যদিও সেপ্টেম্বরের আক্রমণ খুবই আকস্মিক, তবুও বোঝা গিয়েছিলো যে বিন লাদেন আমেরিকা আক্রমণের পরিকল্পনা ২০০১ সালের গ্রীষ্মেই করছিল। জুন

মাসে যখন বিন লাদেনের কয়েকজন সহচর ইয়েমেনের ইউএস এম্বেসিতে ধরা পড়ে তখন এম্বেসি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়, কেননা আসামিদের কাছে কিছু ম্যাপসহ এক্সপ্লোসিড পাওয়া যায়। ঐ মাসেই নিউ দিল্লিতে ভারতীয় পুলিশ দু'জন লোককে আটকায় যারা আমেরিকান এম্বেসির ভিসা সেকশন বিন লাদেনের নির্দেশে উড়িয়ে দেয়ার মতলব করছিল। জুলাই মাসে, আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট সাবধান করে দেয় যে আরাবিয়া পেনিনসুলাতে আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু লোক সহসা সন্ত্রাসী কারবার করার মতলব আঁটতে পারে।

আমেরিকান টারগেটের বিরুদ্ধে বিন লাদেনের আক্রমণের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়—আল-কায়েদার রিক্রুটমেন্ট-টেপ থেকে, যা ঐ গ্রীষ্মের সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে অতি দক্ষতার সাথে প্রচার করা হয়, এর আভাস পাওয়া যায় বিন লাদেনের, সূক্ষ্মভাবে পাঠানো, টেলিগ্রাফ বার্তা থেকে।

একটি টেপে বিন লাদেন ও তার অতি নিকট সহযোগীরা আবেগপূর্ণ ভাষায় ভাষণ দেয় চেচনিয়া, কাশ্মির, ইরাক, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া ও মিশরের মুসলমানদের অত্যাচারের ব্যাপারে। যার মর্ম ছিল যে সেখানকার মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে এবং জেলে পোরা হচ্ছে। বিন লাদেনের জন্য মুসলিমদের সবচেয়ে অবমাননার ব্যাপার হল আরবের পবিত্র ভূমিতে আমেরিকানদের লাগাতার অবস্থিতি। তার বক্তব্য হল যে আমেরিকানরা ইহুদি মহিলাদের আমদানি করে পবিত্র ভূমির যেকোন স্থানে ছেড়ে দিচ্ছে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে। অভিযোগ হল যে, সৌদি শাসকরা হোয়াইট হাউসের 'ঈশ্বরের' পূজা করে, কারণ সেখানে গিয়ে তারা আমেরিকান নেতাদের যেমন কলিন পাওয়েল—মূর্তি পূজা করছে তাদের সাথে সিটিং করছে, লাঞ্চ ডিনার খাচ্ছে।

বিন লাদেন বলে যদি তোমরা মুসলিমরা যুদ্ধ না কর, আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন। তারপর এই নির্বাসিত সৌদি মুসলমানদের এই সমস্যা কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে তার চালচিত্র খসড়া করে দিয়ে বলে যারা এই ধর্মযুদ্ধের শৈল্পিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে চায় তাদের আফগানিস্তানে আসা উচিত। এই টেপে দেখানো হয় শতাধিক মুখোশ পরা বিন লাদেন বাহিনী তার আল-ফারুক ক্যাম্পে ট্রেনিং নিচ্ছে—এই ক্যাম্প আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষার্থীদের হাতে কালো পতাকা আর মুখে আরবি বাক্য 'শয়তান ঠেকাও'। ধর্ম যোদ্ধারা আরপিজিও এন্টি-এয়ার ক্র্যাফ্ট্ গান ছুড়ছে লক্ষ্যবস্তু তাক করে; বিন লাদেন নিজেও তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লো। টেপে এও দেখানো হয়েছে অনেক কিশোর বালক, এগারো বছরের ওপরে, মিলিটারি পোশাক পরে সেখানে একইভাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

বিন লাদেন ঐ টেপে তার আল-কায়েদার আমেরিকা-বিরুদ্ধ অপারেশনের সংকীর্তন করল এবং ১৯৯৮ সালে কেনিয়াতে আমেরিকান এম্বেসিতে বোমা ফাটানোর ঘটনার উল্লেখ করে গর্বভরে বলল, এটা করা হয়েছিল এই জন্যই যে পূর্ব আফ্রিকায়

মার্কিন গোয়েন্দাদের সবচেয়ে এটা বড় মিলন কেন্দ্র ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আঘাতটা বেশ জোরদার হয়েছিল। এই আঘাতটা দেয়া হয় মার খাওয়ার আস্বাদ কেমন তা বোঝানোর জন্য। 'কোল'-এর ওপর আক্রমণ হওয়ায় বিন লাদেন বেশ খোশ হল। 'আমাদের ভাইয়েরা আদেনে 'কোল'-এতে আঘাত হেনেছে। তারা 'ড্রেসট্রয়ার'কে ধ্বংস করেছে—সেটা পানির ওপর দিয়ে চলাফেরা করলে আপনারা আতঙ্কিত হতেন। এটাকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র 'ডেস্ট্রয়ারের' সাহায্যে ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করেছি; যখন, ধাক্কাটা লাগল, তখনই যুদ্ধ আরম্ভ হল।'

টেপের শেষাংশে বিন লাদেন উল্লেখ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আরো ব্যবস্থা নেয়া হবে। 'ইসলামের বিজয় আসছে এবং ইয়েমেনের বিজয়ের যাত্রা অব্যাহত থাকবে।' আল-কায়েদার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি মধ্যপ্রাচ্য মহল আমাকে বলেছে যে ট্রেড সেন্টার আক্রমণের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আফগান ফেরত প্রশিক্ষিত সৌদিদের মধ্যে বলাবলি করতে দেখা গেছে শিঘ্রী একটা বড় ধরনের অপারেশন ঘটবে—তবে কখন কোথায় তা কেউ জানে না।

ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ভিডিওটেপে আল-কায়েদা সংস্থার সদস্যদের কর্মপন্থা, বিন লাদেন ও তার অনুচরদের তৎপরতা, এই বিংশ শতাব্দির আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তবিদ্যায় উন্নত অস্ত্র সম্ভারের প্রয়োগ ও সংরক্ষণ এক ভয়াবহ ধর্মযুদ্ধের ইঙ্গিত দেয়। এর ফল হচ্ছে—a fusion of races, একটি জাতির সংমিশ্রণ। তাই আমি এর নাম দিয়েছি "Holy War Inc."-ধর্মযুদ্ধ এক্ত্রীভূত।

একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টগনের দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না—এমন সংঘবদ্ধ ও সাফল্যজনক আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে না। বিন লাদেনের লোকের মধ্যে কয়েকজন পাইলট হিসেবে আমেরিকায় প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তারপর প্যাসেঞ্জার জেট বিমান উড়িয়ে ঢুকে পড়েছে পৃথিবীর বিখ্যাত ভবনে—আমেরিকার নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে। ধ্বংসের সাথে সাথে নিজেদের বলিদান দিয়ে সোজা চলে গেছে স্বর্গোদ্যানে। আল্লাহর রাহে শহীদ হয়েছে। কিন্তু আমেরিকা বা বিশ্বের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যায়।

এরা প্যালেসটাইনের 'ইন্তিফাদ'-র মত, আত্মঘাতী বোমাবাজ না। তারা উচ্চ শিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক যারা আমেরিকাতে বসবাস করেছে ক্যালিফোরনিয়ায়, ফ্লোরিডায় এবং ভার্জিনিয়ায়। তারা টিপিক্যাল উগ্র মৌলবাদীদের মত দাড়ি-ধারী ছিল না। সম্পূর্ণ চাঁচাছোলা মুখমণ্ডল। তারা তাদের পরিকল্পনা একটা জিমনাশিয়ামে করেছিল, পিজা খাওয়ার জন্য হোটেলের ওয়েটারকে অনুরোধ করেছিল এবং ইন্টারনেটে তাদের ফ্লাইটও বুক করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পাঁড় মাতাল—যা মুসলিম আইনে মারাত্মক অপরাধ। তারা নিজেদেরকে এমন চমৎকারভাবে, বিন লাদেনের অপারেশন কাজের জন্য, নিয়োজিত করেছিল, আসল পরিচয় গোপন

করে। এদের কারোর মনে কোন সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এইসব হাইজ্যাকারদের মানুষের কাছে পুরোপুরিভাবে একবিংশ শতাব্দির আমেরিকাবাসী বলে ধারণা জন্মে দেয়। বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক উপযুক্তভাবে প্রযুক্তিযুক্ত ছিল, তাই ধর্মযুদ্ধে এইসব প্রশিক্ষিত কর্মীদের আসল উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারেনি। ১৯৯০-র দশকে আফগানিস্তানে বিন লাদেনের এক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের নাম ছিল আল-বদর; কেননা, ৭ম শতাব্দিতে প্রফেট মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন; কিন্তু আল-কায়েদার সদস্যদের RDX ও C4 এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আধুনিক ব্যবস্থায় দক্ষ করে তোলা হয়েছিল—বদর যুদ্ধের মত ঢাল-তলোয়ার ছিল না। তবে আল-কায়েদার সদস্যদের মধ্যযুগীয় কায়দায় তাদের আমির বা নেতার প্রতি আনুগত্য (বায়েত) প্রকাশ করার কড়া নিয়ম ছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালের প্রথমদিকে সুদান ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত সদস্যদের মাসিক ভাতার বন্দোবস্ত ছিল—যা দিয়ে তারা পরিবারের ভরণপোষণ ও ব্যবস্যা-বাণিজ্যের কাজে লাগাতে পারতো। ১৯৯৬ সালে যখন বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন সে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত আমেরিকান সৈন্যদের 'ক্রুসেডার' বলে চিহ্নিত করে যেন মধ্যযুগের ক্রুসেড অব্যাহত রয়েছে। বিন লাদেন তার যুদ্ধ ঘোষণায় সই করেছিল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালার উচ্চচূড়া থেকে, যেখানে আধুনিক জগতের সাথে কোন পরিচয় ছিল না। এই যুদ্ধ ঘোষণা লিখিত হয় 'এপ্‌পল কম্পিউটার'-এ, তারপর ফ্যাক্স বা ই-মেইলের মাধ্যমে ব্রিটেন ও পাকিস্তানে তার অনুসারীদের কাছে প্রেরণ করা হয়। এইসব বার্তা লন্ডনে অবস্থিত আরাবিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে যার সারমর্ম সারা মধ্যপ্রাচ্য ও আমেরিকায় নিউইয়র্কে সেটেলাইটের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হত। এইভাবে আধুনিক কায়দায় বার্তাও নির্দেশ বিলি হত আত্মঘাতী সদস্যদের মাঝে। এদের পালন পোষণ কিভাবে হতো সে সংবাদ কেউ জানতো না। ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই ছিল।

ইউএস সিকিউরিটি এজেন্সির অধিকর্তা বলেন যে, বিন লাদেনের উত্তর-প্রযুক্তিপূর্ণ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, যা ইউনাইটেড স্টেটস্-এর ছিল না। সৌদি উগ্রপন্থী অনুসারীরা ফ্যাক্স, সেটেলাইট ফোন ও ই-মেলের মধ্য দিয়ে বার্তা সঠিক স্থানে পৌছে দিত। তারা ম্যাকইনতোশ ও তোশিবা কম্পিউটারে বার্তা-মেমোগুলো দুর্বোধ্য ভাষায় বা কোডের দ্বারা রূপান্তর করে রাখতো সময়মত বিলি-বন্দোবস্ত করার জন্য এবং ১৯৯০-র দশকের মধ্যভাগে শত শত পৃষ্ঠায় সমন্বিত অবস্থায় CD-ROM তৈরি করে রাখতো। যাতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ও নির্দেশাবলী থাকতো—কেমন করে বোমা বানাতে হয় এবং প্যারা মিলিটারি অপারেশন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সাফল্যজনকভাবে পরিচালনা করতে হয়। বিন লাদেনের ভ্রমণ পদ্ধতিও সমভাবে আধুনিক কায়দায় করা হয়। যখন বিন লাদেন সুদানে ছিল, সে সাধারণত কয়েকজন পাইলটকে তাৎক্ষণিকভাবে ডাকার ব্যবস্থা

রেখেছিল এবং যখন ১৯৯১ সালে পরিবারবর্গ ও অনুচরসহ পাকিস্তান থেকে সুদানে ভ্রমণ করে তখন ভ্রমণ করেছিল তার ব্যক্তিগত জেটবিমানে।

যখন সে তার দৃষ্টি ধর্মযুদ্ধের দিকে নিবদ্ধ করল, তার ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্ব অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগায় পারিবারিক-কোম্পানি রূপে। ১৯৮০-র দশকে, আফগান যুদ্ধের সময় সে পাকিস্তানে ও আমেরিকায় অফিস স্থাপন করে, সৌদি আরব থেকে ফান্ডের ব্যবস্থা করে, বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে সে ধর্মযোদ্ধাদের রিক্রুট করে এবং নিজের পারিবারিক কোম্পানির সম্পদকে কাজে লাগায় আফগানিস্থানে ধর্মযুদ্ধে সৈনিকদের জন্য বিভিন্ন স্থানে 'বেস' স্থাপন করে।

ইসলামী মৌলবাদী র‍্যাডিকেল ব্যক্তিত্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিন লাদেন কাজে লাগিয়েছিল, যেমন প্যালেস্টাইনের আবদুল্লাহ আজম, মিশরের শেখ ওমর আবদেল রহমান এবং ইয়েমেনের আব্দুল মজিদ জিনদানী—যারা কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড থেকে ইসলামী চিন্তাধারায় শিক্ষাগ্রহণ করেছিল। শুধু তাই নয় এইসব মানুষ বিন লাদেনের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে, নতুন প্রজন্মের উগ্রবাদী মৌলবাদীদের মত, আধুনিক টেকনিক্যাল বিষয়ে—যেমন মেডিসিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে পড়াশোনাও করেছিল। কিন্তু ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্সের সূক্ষ্ণ দিক-নির্দেশনাকে আধুনিক পদ্ধতিকে ভ্রূকুটি করেছে।

সুতরাং এটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে বিন লাদেনের শীর্ষ সহযোগী উচ্চ মধ্যবিত্ত মিশরীয় পরিবারের একজন দক্ষ চিকিৎসক বা লন্ডনের সাবেক মিডিয়া প্রতিনিধি একজন সৌদি ব্যবসায়ী যার জন্ম কুয়েতে। তিনি আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় অভিজ্ঞসম্পন্ন ব্যক্তি। আমেরিকায় বিন লাদেনের সামরিক পরামর্শদাতা মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। তার মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ডিগ্রি ছিল এবং ক্যালিফোরনিয়ায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছে। বিন লাদেনের মিশরীয় জঙ্গিপুরুষ রিফিয়া আহমদ তাহা একজন একাউন্টেন্ট, যে বিন লাদেনের সহ-স্বাক্ষরকারী হিসেবে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় সহযোগী ছিল ১৯৯৮ সালে। অন্য একজন শীর্ষ আল-কায়েদা কর্মকর্তা, আমদুহ মাহমুদ সলিম ইরাকে ইলেট্রিক্যাল বিষয়ে পড়াশোনা করে। বিন লাদেন নিজেই কলেজে অর্থনীতিতে স্টাডি করে এবং নিজের পরিবারের জন্য, তরুণ বয়সে। সৌদি আরবে নির্মাণ কর্মে-কনস্ট্রাকশন ব্যবসায় তদারকি করেছে। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে সে নিজেই সুদানে আপন ব্যবসায়ে সক্রিয় বিজিনেসম্যান ছিল।

সত্যি বলতে কি, আল-কায়েদার কর্মকাণ্ডে সৌদি আরবে লাদেন গ্রুপের যে বিশাল নির্মাণ কোম্পানি ছিল তার সাথে সমন্বয় রেখে সব ধরনের কাজকর্মে বিন লাদেন সম্পৃক্ত ছিল। এই বিশাল নির্মাণ কোম্পানি বিন লাদেনের পিতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া ধর্মীয় ব্যক্তি। এই কোম্পানির শাখা মধ্যপ্রাচ্যে ও তার বাইরে এশিয়াতে অপারেট করত। বিন লাদেন এই কোম্পানির

একজন পরিচালক ছিল তবে মূলত তার কাজকর্ম ও চলন-ধরন আল-কায়েদার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল। বিন লাদেন তার 'শুরা' কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করে আল-কায়েদার নীতি নির্ধারণ করত। এই শুরা আল-কায়েদা গ্রুপের নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। এই 'শুরার' অধীনে সামরিক বিষয় সংক্রান্ত, ব্যবসার স্বার্থ এবং ফতোয়া সম্বন্ধে যে সব কমিটি ছিল, তারা শুরার কাছে জবাবদিহি এবং দায়িত্ব পালন করত। এই ফতোয়া কমিটি ইসলামী আইন ও মিডিয়া গ্রুপের জন্য নির্দেশ জারি করত।

একবার নীতি নির্ধারণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে পাঠানো হত, তারপর, উপযুক্ত সময়ে, গ্রুপের নিম্ন পর্যায়ে বিলি করা হত। পদাতিক বাহিনীর অনেকেই বিন লাদেনের সাথে অতি সামান্য কিংবা কোন যোগাযোগ রাখতো না। নির্দেশ মত কাজ করে যেত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৭ সালে বিন লাদেনের কেনিয়া সেলের ইনফরমেশন অফিসার। যে পরে নাইরোবির আমেরিকান এম্বেসিতে বোম্বারির নেতা ছিল, সে তার কম্পিউটারে একটা ডকুমেন্টে উল্লেখ করেছে যে কেনিয়া সেলের মিশন হল আমেরিকানদের আক্রমণ করা; এবং বলেছিল যে—'আমাদের পূর্ব আফ্রিকার সেল-সদস্যরা বিন লাদেনের অপারেশন সম্বন্ধে জানতে চাইতো না, আমরা শুধু যন্ত্রের মত ছিলাম এবং আমাদের সেইরূপে ব্যবহারও করা হত।' কেনিয়ার আমেরিকান এম্বেসিতে আত্মঘাতী বোমারুদের কখনোও সরাসরিভাবে বিন লাদেন নির্দেশ দেয়নি এবং তার অনুসারীদের অনেক নেতা এমনকি বিন লাদেনকেও কখনো দেখেনি। এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ হল যে, তানজানিয়ায় আমেরিকান এম্বেসিতে বোমাবাজিতে যে সরাসরি যুক্ত, সে ছিল খালফান খামিস মোহাম্মেদ। এই বোমাবাজিতে তানজিনিয়ার আমেররিকান এম্বেসি সম্পূর্ণভাবে উড়ে গেছে। এঘটনা ঘটে ১৯৯৮ সালে। এই আক্রমণের পর এবিসি নিউজে, বিন লাদেন আল-কায়েদার গ্রুপের নিখুঁত ত্রুটিহীন সাফল্যের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করেছিল। বিন লাদেন বলেছিল "আমাদের কাজ হল উগ্রপন্থীদের উত্তেজিত করা। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা কাজে সফলতা আনি এবং এসব ক্ষেত্রে কতিপয় মানুষ আমাদের উত্তেজনা সৃষ্টির কাজে ও অপারেশনে সাড়া দিয়ে থাকে।"

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, আল-কায়েদা এক প্রকার মাল্টি-ন্যাশনাল হোল্ডিং কোম্পানি যার চেয়ারম্যান হল বিন লাদেন এবং এই হোল্ডিং কোম্পানির প্রধান কার্যালয় আফগানিস্তানে। প্রথাগতভাবে হোল্ডিং কোম্পানি হল আসল ব্যবস্থাপনা পরিষদ, যারা খণ্ডভাবে বা সম্পূর্ণভাবে অন্যান্য কোম্পানিগুলোর তদারক করে থাকে। কখনো কখনো হোল্ডিং কোম্পানিগুলো ক্রিমিন্যালরা ব্যবহার করতো তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডের আবরণ হিসেবে। অন্যান্য দেশে এই হোল্ডিং কোম্পানির সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো কোন নিয়মকানুনের ধার ধরতো না,

স্বাধীনভাবে অপারেশন করতে পারতো। মিশর, পাকিস্তান, আলজিরিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া ও কাশ্মিরে যেসব মিলিটান্ট সাবসিডিয়ারি সংস্থাগুলোকে আল-কায়েদার হোল্ডিং কোম্পানিতে ইনকরপোরেট করেছিল আল-কায়েদা কর্তৃপক্ষ।

আফগানিস্তানে আল-কায়েদা ক্যাম্পে জর্ডানিয়ান, তুর্কি, প্যালেস্টাইনি, ইরাকি, সৌদি, সুদানিজ, মরোক্কান, ওমানি, তিউনিশিয়ান, তানজিনিয়ান, মালয়েশীয়, ভারতীয়, ফিলিপেনো, চেচেন, উজবেক, তাজিক, চাইনিজ, উঘুরী, বার্মিজ, জার্মানি, সুইডিশ, ফ্রেঞ্চ, আরব-আমেরিকান এবং আফ্রিকান-আমেরিকান—এসব দেশের লোকেরা আকৃষ্ট হয়ে কোয়ালিশন সদস্যরূপ প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এই ক্যাম্পের স্নাতকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে সন্ত্রাসী করবার ও ধর্মযুদ্ধের ফরমূলা রপ্তানির কাজে নিয়োজিত ছিল। যেমন বিন লাদেন স্বয়ং বলেছে যে "আল্লাহকে ধন্যবাদ এই মুসলিম ভ্রাতারা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটেয়ে আছে এবং কে কোথায় কি করছে এবং কে এই সংস্থার (আল-কায়েদা) সাথে জড়িত আমি জানি। এইটুকুই বলতে পারি"—একজন সিইও'র (চিফ নির্বাহী কর্মকর্তার) সত্য বক্তব্য।

ওসামা বিন লাদেন নেতা-কর্মীদের প্রেরণা জোগাতে যে-কোন বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য। প্রখ্যাত ইসলামী মিলিট্যান্টদের ধারণা ছিল যে, তারা একটা কম্লিকেটেড কর্মের সাথে জড়িত। ১৯৯৯ সালে আমেরিকান সিনেটে সিআইএ'র পরিচালক জর্জ টেনেট মন্তব্য করেছিল যে বিন লাদেনের পৃথিবীব্যাপী যে নেতাকর্মী ও এসোসিয়েটস্ আছে, তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মারাত্মক রকমের হুমকি এবং এই সন্ত্রাসী হুমকি প্রধানত আমেরিকার বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং এই মন্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগন আক্রমণের নয় দিন পর প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বিন লাদেনকে এই সন্ত্রাসীদের গড-ফাদার হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং ঘোষণা দেন যে মাফিয়া চক্রের ক্রিমিনাল কর্মকাণ্ডের মত আল-কায়েদাও সন্ত্রাসী কাজ করে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের এক নামকরা ধর্মীয় স্কুলের হেডমাস্টার অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে। সে বলেছিল যে বিন লাদেন একজন হিরো, নায়ক; কেননা সে বাইরের শক্তিশালী দেশগুলো—যারা মুসলিমদের ধ্বংস করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করছে। একটি ছোট বালক কোরান হাতে নিয়ে, বিন লাদেনের মাতৃভূমি ইয়েমেনের দক্ষিণে প্রত্যন্ত এক গ্রাম্য পরিবেশে আমাকে বলেছিল—'আমরা বিন লাদেনকে ভালবাসি। তিনি আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করছেন এবং তিনি আফগানিস্তানে'। ২০০০ সালে, বসন্তকালে, লন্ডনের এক কনফারেন্সে শামিল হলে, আমি অনুরূপ বক্তব্য শুনেছিলাম। ঐ কনফারেন্সে কয়েক শত মন্ত্রমুগ্ধ নারী-পুরুষের সামনে মূল বক্তা বিন লাদেনের প্রশংসা করে বলেছিল যে—'এই মানুষটি ইসলামের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছে।' বিন লাদেনের জন্য বিভিন্ন স্থানে আমি শুনতে পাই—বিন লাদেন একজন হিরো, বিন লাদেন এক শীর্ষ সন্ত্রাসী,

বিন লাদেন ইসলামে যুদ্ধবাজদের জন্য পতাকা বহনকারী; সম্ভবত বিন লাদেন একজন মহান ব্যক্তি, এই সব বিভিন্ন পদবি।

বিন লাদেন সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে অন্ধকার আবরণে রেখে বহু ব্যক্তি তার প্রশস্তি গেয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছে। যার অধিকাংশ অসত্য। বিন লাদেন সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদাদি ছানবিন, বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে দেখা যায়, প্রায় হাজার খানের প্রবন্ধ ও পুস্তক রচিত হয়েছে। জেনির ইন্টেলিজেন্স রিভিউর কথা ধরা যাক, সেখানে দেখা যায় যে বিন লাদেন আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রি গ্রহণ করেছে এবং ১৯৮০-র দশকে সিআইএ তাকে প্রভূত অর্থ সাহায্য দিয়েছে আফগানিস্তানে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য। বিন লাদেন কখনো ইউনাইটেড স্টেটস-এ কিংবা আমেরিকায় কোন ইনস্টিটিউটে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ করেনি বা আফগান যুদ্ধের সময় সিআইএ কর্তৃক অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেনি। এসব আফগানিস্তানের অপারেশন এজেন্সির মিথ্যা প্রচারণা, যাকে মৌলিক সত্যরূপে রূপায়িত করে মানুষের কাছে অসচ্ছ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে।

অথবা, এনবিসি-র পরিবেশিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলো ধরা যাক, তাতে বলা হয়েছিল এক 'বিদেশী বন্ধুরাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস' আমেরিকার কর্মকর্তাদের বলেছিল যে বিন লাদেন মাত্র 'একবছর বাঁচবে।' ঐ কাহিনীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে 'নির্বাসিত সৌদি' হৃদযন্ত্রের সমস্যা, সম্ভবত ক্যান্সার। নিয়ে মারাত্মকভাবে ভুগছে। বিন লাদেনের আশু মহাপ্রস্থানের সংবাদ ও কাহিনীগুলো নিছক অতিরঞ্জিত সংবাদ, কারণ পরবর্তী বছরগুলোতেও সে সবল ও সুস্থ দেহে বেঁচে আছে।

এই সব 'হলুদ সাংবাদিকতা' দৈনিক জার্নালিজম চাপের মুখে পরিবেশিত, কিন্তু তার সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থগুলো বিন লাদেনকে যে অতিমানব হিসেবে চিহ্নিত করেছে সেগুলো প্রায়ই ভ্রান্তিমূলক। উদাহরণ স্বরূপ—'Study of Revenge Suddam Hussains Unfinished War against America' যুক্তি দেখায় যে 'সম্ভবত ইরাকই ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা ফাটিয়েছে, এই থিওরিকে কতকগুলো তথ্য দিয়ে সার্পোট করা হয়। কিন্তু লেখক আরও মন্তব্য করেছেন যে ১৯৯৮ সালে আফ্রিকায় আমেরিকান এম্বেসি দুটিতে যে বোমাবাজি করা হয় সেটা ইরাক ও বিন লাদেনের যুগ্ম-অপারেশন। এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক কোর্টে চার ব্যক্তির বিচারের সময়—যে হাজার হাজার পৃষ্ঠার নথি পেশ করা হয়েছিল তাতে ঐ দুই এম্বেসিতে বোমাবাজির জন্য ইরাকের কোন সম্পর্ক ছিল না, উল্লেখও ছিল না।

আর একটি গ্রন্থ, 'Dollars for Terror The United States and Islam' যা একজন সুইস সাংবাদিক রিচার্ড ল্যাবেভিয়র, বিন লাদেন সম্পর্কে কতকগুলো উদ্ভট (bizzarre) দাবি করে বলেছেন যে, বিন লাদেন একজন সাবেক সিআইএ এজেন্ট; ১৯৭৭ সালে সে তার নিজের জেট বিমানে সকলের

অগোচরে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করে; উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসীদের এক মিলন সভায় মিশরগামী টুরিস্টদের আক্রমণ করা এবং ইয়েমেনের 'কাথ' (qat) বৃক্ষ চাষের প্রধান পথগুলো নিয়ন্ত্রণ করা—যে বৃক্ষের পাতা খেলে নেশার ঘোর হয়। এই বৃক্ষের পাতা Horns of Africa তে এবং আরাবিয়ান পেনিনসুলার দক্ষিণ অংশের লোকেরা খায় ও নেশায় মত্ত থাকে। সম্ভবত লেবেভিয়র (Labeviere) এই গ্রন্থ ঐ বৃক্ষের পাতা চিবিয়ে রচনা করেন।

বিন লাদেন সম্বন্ধে অন্যান্য অসত্য সংবাদ পরিবেশনের দৃষ্টান্ত দেখা যায় ইউসেফ বোদান্সকির বিশাল গ্রন্থে। এতে বলা হয় বিন লাদেন সন্ত্রাসবাদের কংগ্রেসানাল টাস্ক ফোরস্-এর পরিচালকের উপাধিতে ভূষিত হয়। 'বিন লাদেন' নামে একটি গ্রন্থে 'Bin Laden The man who dedared war on America-তে বোদান্সকি উল্লেখ করেছেন যে, বিন লাদেন টিন-এজ বয়সে বৈরুতে মদ্যপান ও নারীভোগ করতো এবং একটি মদ বিক্রি করা বারে মারপিটে জড়িত ছিল। যারা বিন লাদেনকে জানে, তারা তাকে পাঁড় গোঁড়া ধর্মীয় ব্যক্তি হিসেবে জানে তার সেই কিশোর বয়স থেকেই এবং সতের বছর বয়সে সে বিবাহ করে। সম্ভবত বোদান্সকি বিন লাদেনকে তার বিশজন ভাই ও সৎভাইদের মধ্যে অন্য কাউকে বিন লাদেন ভেবে ভ্রান্ত হয়েছিলেন। বোদান্সকি আরো লেখেন যে, ১৯৪৪ সালে বিন লাদেন লন্ডন ভ্রমণ করে এবং সেখানে ওয়েমব্লির উপ-শহরে পাকাপাকিভাবে বসবাস (settled) করার চেষ্টা করে। লেখকের এই ধারণা দেখে লন্ডনে বসবাসরত আরব বিচ্ছিন্নবাদী ও সাংবাদিকরা বেশ হাসাহাসি করেছিল।

রোদান্সকি আর একটা ফ্যানটাস্টিক দাবি করেন : তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে লং আইল্যান্ড সাইন্ডে টি, ডবলিউ-এ ফ্লাইট নং ৮০০ যে বিধ্বস্ত হয়, তাতে ২৩০ জন ব্যক্তি মারা যায় এবং এই অপারেশন ইরান ও বিন লাদেনের যুগ্ম-অপারেশন ছিল। যাইহোক, দু'বছর ধরে এ বিষয়ে বিশদভাবে তদন্ত করে দেখা যায় যে, এটা কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়, স্বাভাবিক দুর্ঘটনা। এই তদন্ত পরিচালনা করেছিল ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফ্টি বোর্ড এবং এফবিআই। তারা সন্ত্রাসীবাদের কোন দলিল হাতে পায়নি।

একটা প্রশ্ন উঠ্তে পারে কেন বিন লাদেন সম্পর্কে কেন এ ধরনের অসমর্থিত রিপোর্টিং করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয় ? প্রথমত, তার সম্বন্ধে লিখিত ইতিহাস ছিল না, তাই বিন লাদেন সম্বন্ধে প্রামাণ্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি কেন না, বিন লাদেনের সাথে যোগাযোগ রাখার কোন মাধ্যম ছিল না। দ্বিতীয়ত, বিন লাদেন সর্বাত্মকভাবে নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবার সম্পর্কে উত্থিত প্রশ্ন এড়িয়ে চলতো আর তার পরিবারবর্গের সদস্যরা কোন বিষয়ে মুখ খুলত না। শুধু, পরিবারের একটি 'কালো ভেড়া'র (Black Sheep) দল বিক্ষিপ্তভাবে বহু দূর থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রচার করত। পরিশষে, বিন লাদেন মানহানিকর উপাধিকে আমলে আনতো না, উপেক্ষা করত। তার সম্বন্ধে যে-কোন ব্যক্তি নিন্দাবাদ

করলে তারা জানতো বিন লাদেন তাদের বিরুদ্ধে কোন দিনই মানহানির মামলা করবে না।

বিন লাদেন সম্বন্ধে কোন প্রতিবেদন বা বক্তব্য প্রকাশ করা বড় কষ্টকর কেননা, সে বহুরূপীয় ভূমিকায় অভ্যস্ত। প্রথমত, সে শত শত জঙ্গি কোর-ক্যাডারের নেতা ছিল, যার হাতে ক্যাডার সদস্যরা 'বায়াত' গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। অন্যদিকে, পৃথিবীব্যাপী তার বিশাল সংস্থার হাজার হাজার ধর্মযোদ্ধার কাছে আদর্শ ব্যক্তি রূপে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল, এমন কি যারা তার সংস্থার বাইরে ছিল তারাও বিন লাদেনের দিকে চেয়ে থাকতো, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার জন্য। ১৯৯৮ সালে আগস্ট মাসে বিন লাদেনের প্রতি ইউএস ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে বলতে গেলে সে মিলিয়ন মানুষের সাধুবাদ লাভ করে এবং তারা বিন লাদেনকে পশ্চিমা শক্তিকে প্রতিহত করার প্রতীকরূপে চিহ্নিত করেছে। পরিশেষে, আমেরিকান মিসাইল প্রক্ষেপণের কালে ক্লিনটন প্রশাসনের কর্মকতারা প্রেসিডেন্ট থেকে নিম্ন পর্যায়ের স্টাফ পর্যন্ত বর্তমানে স্মরণীয় সন্ত্রাসী আক্রমণের মাস্টার মহিন্ত—মূল হোতারূপে ধারণা করেছিল। শুধু তাই নয় জেম্‌স্ বন্ড ছায়াছবির আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ভিলেন রূপে তাকে চিত্রিত করা হয়। সেই চিত্রিত পোট্রেটে ১১ সেপ্টেম্বরের ধ্বংসাত্মক ঘটনাকে আন্দাজ করা যায়।

বিন লাদেনের প্রতি সহানুভূতিশীল যারা তাকে পাগড়িঅলা রবিনহুড বলে ডাকে, নটিংহাম জঙ্গলে নয়, আফগানিস্তানে মধ্যযুগীয় পাহাড়ি অঞ্চলে জনপরিত্যক্ত এলাকায়। তার চারদিকে ঘিরে থাকে রামগরুড়ের ছানার মত মুখ করে একদল সহচর, তীর ধনুক ও 'ক্রসবো' নিয়ে নয়, সঙ্গে রকেট-চালিত গ্রেনেড এবং সি-৪ এক্সপ্লোসিভ নিয়ে এবং পশ্চিমের মোড়ল রাজ্যের নাকে দম চড়িয়ে। বিন লাদেনকে সকলেই জেহাদের 'পাইড পাইপার' বলে ভালোই বোঝে। ধর্মযুদ্ধে তার আহ্বানে সাড়া দেয় অসন্তুষ্ট ও অর্ধভুক্ত মুসলিম যুবকরা-আলজিরিয়া থেকে পাকিস্তান-এমন কি ক্যালিফোরনিয়া পর্যন্ত। তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করতে আসে সশস্ত্র সংঘাতে যা প্রথাগত পদ্ধতিতে অর্জন করা যায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কিসের তাগিদে তারা বিন লাদেনের এই ডাকের প্রতি আকৃষ্ট হয় ? বিন লাদেনের আদর্শগত মূলমন্ত্র হচ্ছে এন্টি আমেরিকানবাদ এবং মধ্যপ্রাচ্যের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের অন-ইসলামিক কর্মধারার বিরুদ্ধে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারগুলোকে সে ইসলামিক নীতি বিরুদ্ধ মনে করে এবং সে চেচেনিয়া ও ফিলিপাইনদের গেরিলা-আন্দোলনকে সমর্থন করে। সুতরাং এই হচ্ছে বিন লাদেনের রাজনৈতিক ধারণা এবং সন্ত্রাসী অপারেশন যার ওপর সে সওয়ার হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যকে সে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিচার করে।

১১ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণ-পূর্ব এক ইন্টারভিউতে পাকিস্তানে ১৪০ মিলিয়ন মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রের সামরিক শাসন জেনারেল পারভেজ মুশারফ যথার্থভাবে বিন লাদেনের উল্লেখ করেছেন। বিন লাদেনের এই জেহাদি আহবান

সম্বন্ধে তিনি বলেন পাকিস্তানে বিন লাদেন 'The western demonization of OBL' বলে খ্যাত এবং বিশ্ব মুসলিমের কাছে সে একজন 'cult figure'–সে হলিউড মুভি ও টিভি সিরিয়েলের ছবিগুলো মানুষের নৈতিক চরিত্রের ও মূল্যবোধের অবনতি ঘটায় বলে মনে করে; তাছাড়া ইসরাইলি সেনাবাহিনীর দ্বারা প্যালেস্টাইনের মুসলিম নিধনের প্রতি আমেরিকার প্রচ্ছন্ন সমর্থন, চেচেনিয়ায় মুসলিমদের রাশিয়ার অত্যাচারের কাহিনী, বসনিয়া ও কসোভোর মুসলিমদের প্রতি পশ্চিমা দেশের অমানুষিক নির্যাতন ও প্রাণহানি এবং ভারতের কাশ্মিরি মুসলিমদের ওপর অত্যাচার বিন লাদেনকে সোচ্চার করেছে...। It is a very long list of complaints that has generated a strong presention complex that the OBL cult figure has come to embody. মুসলিম সন্ত্রাসবাদের মূলে বা গোড়াতে বিন লাদেন একজন হিরো।

টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞ যুবকরা যারা 'হলি ওয়ার ইনকর্পোরেটেড (Inc)'–এর দেশ কাঁপানো সন্ত্রাসী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হচ্ছে রামজি ইউসেফ, যার পরিবারের সদস্যরা বালুচ পাকিস্তানি; কুয়েতে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে, শিক্ষা ক্ষেত্রও ছিল, পালন–পোষণও হয়েছে। পরে সে যুক্তরাজ্যের ওয়েলস্–এ ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ পড়াশোনা করে সেখানে প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করার পর উত্তম ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারে। আর সন্ত্রাসী জীবন (কেরিয়ার) নিয়ে গিয়েছিল আফগানিস্তানে, নিউইয়র্কে, থাইল্যান্ডে, ফিলিপাইন্সে এবং পাকিস্তানে। পাকিস্তানে থাকা অবস্থায় ইউসেফ দেশের প্রথম নারী প্রাইমমিনিস্টার বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করার চেষ্টা করে। সত্যি বলতে কি, সে একাই বিশ্ব–জেহাদের শীর্ষ ব্যক্তি।

ইউসেফ টিপিক্যাল মৌলবাদী জঙ্গি ছিল না। ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ ও ভোগবাদী হিসেবে সে পরিচিত ছিল। তবুও আল–কায়েদার বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলে। পাকিস্তান আফগান বর্ডারে বিন লাদেনের ক্যাম্পে শিক্ষাগ্রহণ করে, ফিলিপিন্সে বিন লাদেনের অনুসারীদের সাথে বিনিদ্রভাবে কাজ করেছে এবং পাকিস্তানে বিন লাদেনের গেস্ট হাউসে বসবাসও করেছে। পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধে ইউসেফের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রসিদ্ধি পায় ঐ সব প্ল্যান বাস্তবায়নে যার মধ্যে ডজন খানেকের মত আমেরিকান প্যাসেঞ্জার জেট উড়িয়ে দেয়া, পোপ দ্বিতীয় জনের রাজনৈতিক হত্যা, ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত সিআইএ'র সদর দপ্তরে বিমান বিধ্বস্ত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তার ধ্বংসাত্মক প্লট ও পরিকল্পনা উদ্‌ঘাটিত হয় যখন ফিলিপিনো পুলিশ তার ম্যানিলা এপার্টমেন্টে ল্যাপটপ কম্পিউটারে তার প্ল্যানের রূপরেখা আবিষ্কার করে। এটা ঘটেছিল ১৯৯৪ সালে। পরবর্তীতে পুলিশি ইন্টারোগেশনে ইউসেফের এক সহযোগী–ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রাসীদের 'কোডনেম' বোজিন্‌কা (Bojinka) এবং বিস্তারিতভাবে প্ল্যান–পরিকল্পনার কথা সরবরাহ করে।

১৯৯৫ সালে পাকিস্তানে ইউসেফ যখন শেষে ধৃত হয় এফবিআই-এর এজেন্ট তাকে নিয়ে নিউইয়র্কে ফিরে আসে। যে হেলিকপ্টারে তাকে ম্যানহাটন জেলে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় সে হেলিকপ্টারটি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। তখন এজেন্টদের মধ্যে একজন মন্তব্য করে যে টাওয়ার দুটো এখনো দাঁড়িয়ে আছে। 'ও দুটি দাঁড়িয়ে থাকতো না যদি আমার পর্যাপ্ত অর্থ ও এক্সপ্লোসিভ থাকতো'—মন্তব্যের জবাব দিয়েছিল ইউসেফ এই একটি বাক্যে।

আল-কায়েদার অর্থ ও সময় ছিল তাই ১১ই সেপ্টেম্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিমিত্তে ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকে সন্ত্রাসীরা আমেরিকায় আগমন করে এবং পরিশেষে ১৯৯৩ সালে ওয়ালর্ড ট্রেড সেন্টারে বোজিন্‌কাররা তাদের পরিকল্পনা মত আক্রমণ চালায়।

মিশরীয় মোহাম্মদ আতা, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের অপারেশনের হোতাদের একজন। তার ধর্মীয় উন্মাদনার সাথে টেকনিক্যাল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটেছিল এবং আল-কায়েদা সম্ভ্রান্ত রিক্রুটদের মধ্যে আতা আদর্শস্বরূপ ব্যক্তিত্ব ছিল। আতা ১৯৬৮-এ কায়রোর এক ধর্মীয় মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ১৯৯২ সালে সে জার্মানি চলে যায় এবং সেখানে হামবুর্গের টেকনিক্যাল ইনস্‌টিটিউটে শহর পরিকল্পনা ও সংরক্ষণ বিষয়ে পড়াশোনা করে। জার্মানিতে সেমি-পার্মানেন্ট ছাত্ররূপে জীবনযাপন করে, গ্র্যাজুয়েশন করতে সাত বছর ব্যয় করে। তার প্রফেসরদের মধ্যে দিমিটার মাশুল (Machule) আতাকে একজন সূক্ষ্ম (Precise) চিন্তাবিদ রূপে স্মরণ করেন, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বের ওপর তার বিরূপ ধারণা ছিল। সে কখনও এলকোহল পান করতো না কিংবা কোন নারীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেনি। আতার ধর্মীয়তা তাকে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ইসলামিক ছাত্র-সংঘ গড়ে তুলতে এবং গড়েছিলও। এই সংঘের পঞ্চাশজন সদস্যদের মধ্যে তার দু'জন রুমমেট ছিল যারা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

২০০০ সালে মে মাসে আতা বার্লিনে অবস্থিত আমেরিকান এম্বেসিতে ভিসার জন্য দরখাস্ত করে। তারপর প্রেগ হয়ে আমেরিকায় ঘুরপথে যাত্রা করে। প্রেগে সে একজন ইরাকি ইনটেলিজেন্ট এজেন্টের সাক্ষাৎ পায়। এই সাক্ষাৎ খুব একটা বড় ব্যাপার ছিল না। কারণ একটি মিটিং-এ আল-কায়েদা ও ইরাকি মিলে ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। একজন সিনিয়র ইউএস প্রতি-সন্ত্রাসী কর্মকর্তা দাবি জানিয়ে আমাকে জানিয়েছিলেন যে 'ঐ মিটিং শেষে কোন কিছুর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে বা কোন কনক্লুশন-এ আসতে পারেনি।'

আতা ৩ জুন-এ নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে প্রেগ ত্যাগ করল। তার যাত্রার প্রথম বিরতি হয় ওক্‌লাহামার নরম্যান শহরের বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লাইট স্কুলে। এই স্থানেই আল-কায়েদার একজন আমেরিকান রিক্রুট, ইহাব আলী, নব্বুই দশকের প্রথম দিকে বিমান চালনায় শিক্ষা গ্রহণ করে। তারপর সে বিন লাদেনের পাইলটদের একজন হিসেবে সুদানে চলে যায়।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আতা প্রথমে ভেনিস ও পরে ফ্লোরিডায় সরে যায় যেখানে জুলাই ও নভেম্বরের মধ্যে হাফমান (Huffman) এ ভিয়েশন-এ বিমান চালনা শিক্ষা করে। সে তার শিক্ষার জন্য ২৫ হাজার ইউএস ডলার প্রদান করে এবং পরবর্তীতে এক ইঞ্জিন ও মাল্টি-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমান চালনার জন্য সার্টিফিকেট পায়। ঐ বছর (২০০০) ডিসেম্বর মাসে আতা অন্য ফ্লাইট স্কুলে ছয় ঘণ্টা ব্যয় করে এবং বোয়িং ৭২৭ স্টিমুলেটর চালনা অভ্যাস করে। সেখানকার প্রশিক্ষক এই জেনে হতচকিত হয় যে আতা অন্যান্য ছাত্রের মত টেকিং-অফ ও ল্যান্ডিং সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে আগ্রহী না হয়ে শুধু চলতি বিমান চট করে অন্য দিকে গতি ঘোরানো অভ্যাসে রত ছিল। আমেরিকায় থাকা অবস্থায় পাকিস্তান থেকে এক লাখ মার্কিন ডলার তারযোগে আতার কাছে প্রেরণ করা হয় যে অর্থ আতা অন্যা ষড়যন্ত্রকারীদের বিমান চালনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য বেটে দেয়।

২০০১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে, আতা ফ্লোরিডায় ছোট বিমান বন্দর বেলী গ্লেড (Belle Glade)-এ ভিজিট করে। এখানে সে খোঁজ খবর নেয় এই মর্মে যে একটি 'ক্রপ-ডাস্টিং' (crop-dusting) বিমান কতদূর উড়তে পারে এবং কি পরিমাণ বিষ (Poison) বহন করতে পারে। প্রতি-সন্ত্রাসীর পরিকল্পনাকারীরা সেই সময় একটি ক্রপ-ডাস্টারে কেমিক্যাল ও বাইওলজিক্যাল এজেন্ট বিতরণের জন্য আমেরিকায় একটি বড় শহরে প্রেরণ করে। আতা এবং তার সহযোগীরা আগ্রহী হয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের পর ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারে একটি ক্রপ-ডাস্টার ক্রয় করার জন্য ঋণের আবেদন করে।

আগস্ট মাসে ২৮ তারিখে আতা আমেরিকান এয়ারলাইনস্ ফ্লাইট ১১-র একটি টিকিট কেনে বোস্টনে যাবার জন্য। প্রায় এক সপ্তাহ পরে সেও তার হামবুর্গের এক বন্ধুসহ ফ্লোরিডার হলিউড বারে এলকহল পান করবার জন্য যায়- যা আতার চরিত্রের বিপরীত কারণ সে কোনদিনই ড্রিঙ্ক করেনি। চারদিন পর ১১ সেপ্টেম্বরে সকালে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি ক্যামেরা ডিপার্টচার এলাকায় প্রবেশের জন্য আতার গতিবিধি ধরা পড়ে। যখন পোর্টল্যান্ড ও মেইন থেকে ফ্লাইট এসে পৌছানের কথা। ঐ প্লেনের একটিতে বোস্টনে যাবার জন্য আতার টিকিট ছিল ফ্লাইট ১১ সিডিউলে।

আতার ব্যাগে, ফ্লাইটে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে, তদন্তকারীরা আরবি ভাষায় ৫ পাতা আবিষ্কার করে যাতে আতার পৃথিবী থেকে চিরতরে সরে যাবার নির্দেশ ছিল। ঐ আরবি ডকুমেন্টে একস্থানে নির্দেশ ছিল—"যখন তুমি প্লেনে উঠবে, তখন মনে মনে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমার সব দরজা আমার কাছে খুলে দাও। হে ঈশ্বর, তোমার কাছে যারা প্রার্থনা করে সাহায্যের জন্য, তুমি তাদের সাহায্য কর। আমি তোমার কাছে মাফ চাই। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি আমার রাস্তা হাল্কা করে দিও। আমি প্রার্থনা করি তোমার কাছে, যে দায়িত্বের গুরুভার আমার ওপর আছে, তুমি তুলে নিও।" ফ্লাইট টেক-অফ-এর ঠিক

একঘণ্টা পর আতা আমেরিকান এয়ারলাইনস্ ফ্লাইট ১১-র গতি ফিরিয়ে ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারের দিকে ধাবিত হয়। একজন সাবেক শহর প্ল্যানিং ও সংরক্ষণের ছাত্র, ঐতিহাসিকভাবে শহর বিধ্বংসের একজন রূপকার হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

বিন লাদেন অবশ্য কেবলমাত্র একজন ইসলামিস্ট জঙ্গি পুরুষ নয়। সে আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের 'অন-ইসলামিক' সরকার-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু রূপে প্রকাশিত। এছাড়া ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকের আরব সন্ত্রাসীদের থেকে সে ভিন্নতর ছিল। তাদের মধ্যে অন্য কেউ এতো বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেনি। তারা শুধু ইসরাইল রাষ্ট্রবিরোধী ছিল এবং প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ডাক দিত। বিন লাদেনের কর্মধারা ছিল বিশ্বব্যাপী, ছিল একতার ডাক। বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী জোস জাগিয়ে অ-মুসলিম শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি এবং শুধু ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করা নয়; অবশ্যই সে ইসরাইল রাষ্ট্র-বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু সে ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার সামরিক আক্রমণকে বন্ধ করার জন্য জঙ্গি মুসলিমদেরও ডাকও দিয়েছিল। তার দাবি ছিল 'মুসলিম' ন্যুক্লিয়ার অস্ত্র তৈরি করার; দাবি ছিল বিশ্বব্যাপী আমেরিকার সামরিক ও বেসামরিক মানুষদের খতম করা ধর্মীয় কর্তব্য, কারণ মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে গাল্‌ফ-এ আমেরিকান সেনাবাহিনীর সমাবেশ; সে মিশরীয় ও সৌদি আরবের সরকারের রূঢ় সমালোচনা করত এই কারণে যে কেন তারা সত্যিকারের ইসলামিক আইন প্রতিষ্ঠা করে না। আর ছিল সারা বিশ্বজুড়ে ধর্মযুদ্ধের প্রসারতার প্রতি আন্তরিক সমর্থন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যখন রাষ্ট্র সমর্থিত আরব সন্ত্রাসী ১৯৮০-র দশকে সন্ত্রাসী কারবারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা ছিল না, তখন বিন লাদেন ও তার সহযোগীরা লাগাতার নতুন অপারশনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং ১১ সেপ্টেম্বর সাফল্যের পর বিন লাদেনের আক্রমণেচ্ছা ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো—কারণ এই সাফল্যকে সে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতীক বলে মেনে নেয়।

তারপর এই সাফল্যের ফলাফল চতুর্দিকে হিল্লোলিত হয়ে গেল। পৃথিবীতে উন্নত ও বিবর্ধনের কৃষ্টির সাথে, বিন লাদেনের ধারণা ও কার্যক্রমে ইয়েমেন থেকে কেনিয়া তারপর ইংল্যান্ড পর্যন্ত মুসলিম জঙ্গিদের বিশ্বাস ও কর্মতৎপরতায় প্রভাব ফেলতে থাকে। আংশিকভাবে এ ছিল সময়ের ব্যাপার। একবিংশ শতাব্দিতে যোগাযোগ সহজতর হওয়ায় বিন লাদেনের বাণী এখন সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে অতি দ্রুত চলে যায়—যা পূর্বে পৌছাতে লাগতো অনেক সময়। বিন লাদেনের ইন্টারভিউ, সিএনএন, টাইম ও নিউজ উইকের সাংবাদিকদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হল। আরবদেশের মিডিয়া কাতারের আল-জাজিরার টেলিভিশন এবং লন্ডনের আল-কুদস্ আল-আরাবি সংবাদপত্রের সাহায্যে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ছড়িয়ে পড়লো। ঐসব সংবাদের প্রতিবেদনের সূত্র ধরে পশ্চিমা টেলিভিশন নেটওয়ার্কেও তার সার্ভিসে প্রচারও করলো।

ইন্টারনেট মাধ্যমে হলি ওয়ার ইন কর্পোরেটেড–এর ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। ২০০১ সালে আল–কায়দার দ্বারা রিক্রুটমেন্ট ভিডিও টেপ ডিভিডি (DVD) আকারে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে কম্পিউটারে এর কপি তৈরি করা সহজ হয় এবং কয়েকটি বিশেষ স্থানে বিলি–বন্দোবস্তের ব্যবস্থা হয়; উপরন্তু বিন লাদেন ও জেহাদি কেন্দ্রে ওয়েভ–সাইট তৈরি করা হয় যেমন লন্ডনে অবস্থিত আজম. কম যেখান থেকে বিস্তারিতভাবে প্রোডাকট ও সার্ভিসেস পৌঁছে যেতো। (উল্লেখ্য, ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের পর লন্ডনের আজম. কম ব্যবহার করা ছিল কষ্টকর)।

আজম. কম বিশ্বে সংঘাতে জড়িত শহীদদের জীবনী প্রচার করতো, এসব যুদ্ধের ভিডিও টেপ, জেহাদি নেতাদের সাথে সাক্ষাৎকারে ব্যবহার করতো এবং উল্লেখিত জেহাদের আদর্শবাদ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক বিক্রি করতো। এই সাইটে ২০০০ সালে চেচনিয়ায় যুদ্ধকালে খাল্লাদ আল–মাদানি নামে এক সৌদি নিহত হয়। সেই মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল সে–দৃশ্যের ছবিও দেখানো হয়েছে। মাত্র একদিনের মধ্যেই মাদানির পরিবারের কাছে বিভিন্ন দেশ থেকে শোকবাণী পাঠানো হয়েছে—যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউনাইটেড স্টেটস, লেবানন, মালয়েশিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, সৌদি আরাবিয়া, তুর্কি, শ্রীলঙ্কা ও ভারত।

১৯৭০ ও ১৯৮০–র দশকে মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসী গ্রুপের জন্য রাষ্ট্র সমর্থন প্রয়োজন ছিল অর্থ ও অবকাঠামো সরবরাহের জন্য, যা পূর্বে দেয়া হত বিজিনেস চালু রাখার জন্য। (আদর্শ সংস্থা হিসেবে আবু নিদাল অরগেনাইজেশন–যাদের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও হাইজ্যাকিং–এর জন্য প্রথমে ইরাক অর্থ ও অবকাঠামো জুগিয়েছিল ১৯৭০–র দশকে, তারপর জুগিয়ে ছিল সিরিয়া ও লিবিয়া ১৯৮০–র দশকে)। অবশ্য বিন লাদেন এমন একজন ব্যক্তি যার প্রভূত অর্থসঞ্চিত আছে এবং স্পন্সরশিপ ছাড়াই অপারেশনের কাজ চলতে পারে—যখন নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে ধর্মযুদ্ধ আজারবাইজেন থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত শুধুমাত্র কম্পিউটারে মুষিক (মাউস) ঘোরালেই তড়িৎ গতিতে নির্দেশ বাণী পৌঁছে যায়। হলি ওয়ার ইনকর্পোরেটেড (Holy War Inc) এইভাবে 'Privatization of terrorism'–কে একব্যক্তির দ্বারা পরিচালনা সম্ভব—যা এক দশকের পূর্বে রাষ্ট্র–সমর্থিত ব্যক্তি মালিকানায় কোন কোম্পানি বা শিল্প–প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ রাখতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৮৬ সালে লিবিয়ান টারগেটে আমেরিকান বোম্বিং–এর (যা রাষ্ট্র সমর্থিত ছিল) সাথে বিন লাদেনের মত একক ব্যক্তির পক্ষে জার্মানির ইউএস বেসে আমেরিকান সৈন্যদের হত্যাকাণ্ড এবং ইউএস নেভির ক্রুজ–এর ওপর মিসাইল আক্রমণ পরে আফ্রিকান এম্বেসিতে বোম্বিং–এর তুলনাই চলে না। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা আমেরিকার সরকার ও দেশবাসীর মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিন লাদেনের আহ্বান ও বাণী পূর্ববর্তী আরব জঙ্গি স্লোগান–এর গুণগতভাবে অনেক পার্থক্য। অতীতে আরব জঙ্গিদের দৃষ্টি শুধুমাত্র নিবন্ধ ছিল

প্যান-আরাবিয়ানের রাজনৈতিকভাবে মঞ্জিলে পৌছানোর জন্য অথবা প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র সৃষ্টির কারণে। সত্যি বলতে কি, বিন লাদেন একাই ধর্মীয় যুদ্ধ পরিচালনা করছে, তার কর্মকাণ্ড উলেমা কর্তৃক সমর্থিত ও অনুমোদিত এবং সে আন্তরিকভাবে জিহাদের অনুগামী; শুধু বিধর্মী পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে নয়, মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যেক 'খোদাদ্রোহী' রাজ্যের বিরুদ্ধেও এবং মুসলিমদের প্রতি ইন্ডিয়া অথবা রাশিয়ানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

বৃহত্তর ইসলামিস্ট জঙ্গিদের আন্দোলনসমূহ বিন লাদেনের কর্মকাণ্ড থেকে উৎসাহিত ও অনুপ্রেরিত হচ্ছে এবং বিন লাদেনের হলি ওয়ার কর্পোরেটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে। যেসব মানুষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় তারা সাধারণত উচ্চ শিক্ষিত এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের জেহাদের পেছনে অতি আধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

পাকিস্তানের লস্কর-এ-তাইবার মুখপত্র আবদুল্লাহ মুন্তাজির-এর সাথে আমি ১৯৯৯ সালে দেখা করি। লস্কর-এ-তাইবা হল বৃহত্তম জঙ্গি সংস্থা কাশ্মির মুক্ত করার জন্য এবং আফগান জিহাদ গ্রুপরূপে ১৯৮৫-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। সালোয়ার কামিজ সার্ট ও প্যান্ট এবং জিন্স জ্যাকেট পরিহিত এই মুন্তাজির কলেজে গণিতবিদ্যায় পড়াশোনা করে এবং আফগানিস্তানের গেরিলা আক্রমণের কায়দাকানুন রপ্ত করে। সে এমন ব্যক্তি যে তার কাজে পূর্ব পশ্চিমে উভয় দেশেই সমানভাবে গতায়াত করে। তার সাথে যখন দেখা করি তখন রমজান মাস থাকায় সে রোজা ছিল তবুও আমাকে চা-পানে আপ্যায়িত করে। ইসলামাবাদে এই সংস্থার একটি ছোটখাটো অফিস ফ্যাক্স মেশিন ও কম্পিউটারে পরিপূর্ণ। মুন্তাজিরের সাথে যখন ইসলামাবাদে যাই, তখনই সে একটা মেসেজ পেল ওয়েব সাইটের মাধ্যমে, চেচেন বিদ্রোহীদের কাছ থেকে রিসিভ করল। চেচেন বিদ্রোহীদের জন্য মুন্তাজির অর্থ সংগ্রহ করে তাদের সাহায্য করে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য। মেসেজটি চেক করতে করতে সে বললো—"এই প্রযুক্তি অতি উত্তম বস্তু, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কোন পশ্চিমা সিভিলিয়নদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করি।"

The Holy War Inc প্রপঞ্চকে আদেনের ইসলামিক সেনাবাহিনী অনুসরণ করে। এই সেনাবাহিনী দক্ষিণ ইয়েমেনে অবস্থিত। এটা আল-কায়েদার একটি এফিলিয়েটেড সংস্থা। এই সংস্থা ১৯৯৮ ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমা টুরিস্ট দল অপহরণ (কিডন্যাপ) করে। এইসব অপহরণকারী সেটেলাইট ফোন ব্যবহার করে। তাদের মিডিয়ার প্রতিনিধি হল একজন মিশরীয়-নাম আমির হামজা। এখন ব্রিটিশ নাগরিক। আমির হামজা জেহাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যেখানে ট্রেনিং ক্যাম্প আছে তাদের জন্য এর সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্যদের ব্যাংক একাউন্ট সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক ওয়েব-সাইট ব্যবহার করে। আলজিরিয়ার সশস্ত্র ইসলামিক গ্রুপ ফরাসি ভাষায় 'GIA' বলে পরিচিত। এরা আল-কায়েদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখে।

এরা বিশ্বব্যাপী Holy War Inc-এর জন্য কাজ করে। গত দশকে GIA চারটি মহাদেশে অপারেশন চালিয়েছিল। এই গ্রুপের সদস্যরা বেলজিয়ামে ব্যাংক লুট করে, কানাডা ও লন্ডনে সেল (Cell) প্রতিষ্ঠা করে। প্যারিসে এক সাবওয়ে স্টেশনে বোমা মারে, ইউরোপে জাল পাসপোর্ট তৈরি করার জন্য অফিস চালায়, লস এঞ্জেলেস-এর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। আফগানিস্তানে বিন লাদেনের ক্যাম্পগুলোতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, বসনিয়ার জন্য যুদ্ধ করেছে এবং নিজের দেশে অগণিত বেসামরিক লোকজন হত্যা করেছে।

Holy War Inc-এর সর্ব মুসলিম জাতীয় চরিত্র যা পশ্চিমা দেশের প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিকভাবে দক্ষ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দক্ষিণ রাশিয়ার বিধ্বস্ত চেচনিয়ার সর্বাত্মক যুদ্ধ-বিগ্রহে যে সংঘাত ১৯৯৪ থেকে চলে আসছে। চেচনিয়া প্রতিরোধের শীর্ষ-নেতাদের মধ্যে একজন সৌদি আছে যার নাম খাত্তাব। খাত্তাব আফগানিস্তানে বিন লাদেনের অধীনে যুদ্ধ করেছে তারপর গেছে চেচনিয়ায়। চেচনিয়ায় এসে সে ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয় চেচনিয়া যুদ্ধের সূচনা করে। আলবেনিয়া থেকে সুইডেন পর্যন্ত, ইন্টারনেটে চেচনিয়া দল ওয়েব-সাইট সংরক্ষণ করে এক ডজনের অধিক ভাষায়। আল-কায়েদার রিক্রুটমেন্ট ভিডিও টেপ Rel Player ফরম্যাটে খাওাবের এই বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড ইন্টারনেটে প্রশংসিত হয়। চেচেনরা আফগানিস্তানের ট্রেনিং ক্যাম্পে তাদের যুদ্ধ কৌশলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে এবং পাকিস্তানের ধর্মীয় স্কুলের অনেক গ্র্যাজুয়েট তরুণ চেচেনীয় বিদ্রোহীদের সাথে শামিল হয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়। Holy War Inc-এর পদাতিক সেনারা এখন সারা বিশ্বের ডজন খানেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব পদাতিক ধর্মযোদ্ধ যাদের আদর্শগত মূল ও অভিজ্ঞতা একই স্থান থেকে আহরিত, সেটা আফগানিস্তান। এদের মধ্যে বেশিরভাগ যোদ্ধাকে সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় থেকে সংগ্রহ করা হয়। হাজার হাজার অনুসারীদের মত বিন লাদেন তার আরব পরিবারের বিলাসী জীবন ছেড়ে দিয়ে আফগানের ধর্মীয়যুদ্ধে সামান্য পদাতিক সেনার মত বিপজ্জনক যুদ্ধের মোকাবেলা করে এবং সেই সময় থেকে নিজেকে একজন লৌহমানব রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এই গ্রন্থটি Holy War Inc-এর সেই প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার জীবনকাহিনী। আমরা এখন সেই দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করব।

অধ্যায়–দুই

আফগানদের জেহাদ : ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি

(The Afghan Jihad : The Making of a Holy Warrior)

The acme of this religion is jihad.
Osama bin Laden, reflecting on his
experience in the Afghan war.

Death of the martyr for the unification of all the people in the cause of God and His word is the happiest, best, easiest and most virtuous of deaths.

Taqi al Din ibn Taimiya, the medieval
Muslim scholar who is often cited by bin Laden

কাহিনীর প্রথমটি অন্যান্য কাহিনীর মত গোড়া থেকেই শুরু করা উত্তম। বিন লাদেনের পরিবারের উৎস কিন্তু সৌদি আরবের রিয়াদে নয়, যেখানে ১৯৫৭ সালে ওসামা জন্মগ্রহণ করে। লাদেন পরিবারে উৎস হল ইয়েমেন, হাদ্রামাতের কয়েকশো মাইল দক্ষিণে।

হাদ্রামাত বিশাল এলাকা মরুভূমি ও পর্বতশ্রেণী বেষ্টিত, উত্তপ্ত সূর্যরশ্মির নিচে টগবগ করে ফোটে। এর উত্তরে সৌদি আরবের রাব–আলখালি (Empty Quarter) এবং দক্ষিণে আরাবিয়ান সমুদ্র। আফগানিস্তানের মত বিন লাদেন হাদ্রামাতকে দত্তক আবাসভূমিরূপে গ্রহণ করে দু'দশক ধরে আসা–যাওয়া করেছে। মধ্যযুগী হাদ্রামাতে আধুনিক যুগেও কোন পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য সেখানে কাদার তৈরি ইটের কুটিরে ও অনুন্নত গ্রামাঞ্চলে দু'একটি কুটিরে আধুনিক বিশ্বের কিছু চিহ্ন পরিদৃষ্ট হলেও, এখনো পরিবহনের মাধ্যমরূপে জন–সাধারণ গর্দভ ও খচ্চর ব্যবহার করে থাকে।

হাদ্রামাতের এই কর্কশ আবহাওয়ায়, চাষবাসের ব্যবস্থা থাকলেও জীবন–যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগায় না, ফলে হাদ্রামিজরা শতাব্দিকাল ধরে মাত্র দুটি পেশায়

নিযুক্ত একটি ব্যবসা-বাণিজ্য; দ্বিতীয়টি নির্মাণকর্ম। কথিত যে, তিন বিজ্ঞ ব্যক্তি শিশু-যীশুর নিকট উপঢৌকন বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, সে দ্রব্য-সম্ভারগুলো হাদ্রামাতের গাছ-গাছালি থেকে আহরিত। পরবর্তীতে হাদ্রামিজরা ভাগ্যের অন্বেষণে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিল মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যে। তাদের সমুদ্র ভ্রমণে আকুতি ও সাফল্যের নিদর্শনের উৎসরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ওমান ও ব্রুনাই এর সুলতানগণ।

তারপর হাদ্রামাতে দালান-কোঠা গড়ে ওঠে। যেই মাত্র আমি শতাব্দি-পূর্ব সুউচ্চ দালানগুলো শিবামনগরে দেখলাম আমি অবাক না হয়ে পারিনি। এই মরু অঞ্চলে বালুর ওপর ভিত তৈরি করে পনের তলা ভবন নির্মাণ করা চাট্টিখানি কথা নয়। এখানেই, এই কারণে, নির্মাণকর্মে নিয়োজিত হয়ে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলেছেন ওসামার বাবা। হাদ্রামিজরা ভবন নির্মাণকর্মে জিনিয়াস।

হাদ্রামাতের বিশাল উপত্যকা ওয়াদি দোয়ান-এ বিন লাদেনের পূর্বপুরুষদের গ্রাম, আল-রুবাত (Al-Rubat) এখনও দৃশ্যমান। এই একশো মাইল জুড়ে উপত্যকা থেকে এক বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন প্রজন্ম জন্ম দেয়ার জন্য বিংশ শতাব্দির প্রাথমিক অংশে, সৌদি আরবের উত্তর প্রান্তে বসবাস করতে আসেন। সৌদি আরবের ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে কয়েকজন এই বংশের তারা হলেন—বিন মাহফুজ, ইনি সৌদি আরবে বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাংকের নাম ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংক। এরপর হলেন : আল-আমুদিজ। এরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলেন তেল, খনিজ পদার্থ ও রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করে। এদের পরে বারম (Baroum) পরিবার। এরা পুরো ব্যবসাদার, ট্রেডার্স, এবং শেষে বিন লাদেনস্। সম্ভবত সবচেয়ে এই বংশই ধনী বংশ। এরা একচেটিয়াভাবে সৌদি রাজ্যে নির্মাণকর্ম করেন; বৃহত্তম কনস্ট্রাকশান প্রতিষ্ঠান এদের। এইসব পরিবার অর্থাৎ উপরোক্ত চার পরিবার ব্যবসা করেছে, একে অন্যের সাথে, আন্তঃপারিবারিক বিবাহ হয়েছে এবং হাদ্রামাত থেকে একটা আলাদা কৃষ্টি (distinctive culture), যে কৃষ্টি পার্থিব সাফল্য ও ধর্মীয় তাত্ত্বিকতা বজায় রাখে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে হাদ্রামিজরা যেমন মিতব্যয়ী তেমনি এক্ষেত্রে সত্য ও সাধুতার প্রতীক। (অবশ্য তারা তা-ই ধারণা করে)। নাবিল আল-হাবশী (যিনি ঐ এলাকায় পর্যটন-কারবারী ছিলেন); তিনি বলেছেন এরা একটা চুক্তি-কাজে বা ডিল (deal)-এ মিলিয়ন থেকে মিলিয়নস মূল্যের হলেও, একটি রিয়াল পর্যন্ত এদিক-ওদিক হয় না। হাদ্রামিজ রমণীরা গাড়ি চালায় না এবং দোকানপাতি নামাজের সময় বন্ধ থাকে। হাদ্রামাতে ইসলাম ধর্ম রক্ষণশীলতার সাথে পালিত হয়। হাদ্রামাত উপত্যকার মেয়েরা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং তাদের মধ্যে একটা আলাদা কথিত ভাষা (ডায়ালেকট) প্রচলিত আছে। এদের এক পরিবার অন্য পরিবারের সাথে মেলামেশা করে না, এক থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন রাখে—তাদের এই আচরণের কারণে সেখানকার গৃহ নির্মাণের পদ্ধতি (আর্কিটেকচারাল সিসটেম) প্রভাবিত হয়ে বাড়িঘর ও চৌহদ্দি

দেয়ালেও উচ্চতা মিনার-প্রমাণ (টাওয়ার-লাইক)-এইসব বাড়িঘরে বারান্দা বা করিডরগুলো অন্ধগলির মত। ঢুকলে বের হবার রাস্তা নেই।

ওসামার বাবা, মোহাম্মদ বিন আওয়াদ বিন লাদেন ১৯৩০ সালে হাদ্রামাত থেকে ঐ এলাকায় বসবাস করতে এলেন, যা শিগ্রীই সৌদি রাজ্যে পরিণত হয়। ফ্রেয়া স্টার্ক (Freya Stark) একজন নামকরা ভ্রমণকাহিনী লেখক, হাদ্রামাত এবং বিন লাদেনের পূর্বপুরুষদের গ্রাম আল-রুবাত ভিজিট করেন ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে। সেই সময় ইউরোপের নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তির তিনি একজন যিনি ঐ প্রদেশে ভ্রমণ করতে সাহসী হন এবং তিনি মোহাম্মদ বিন লাদেন যৌবনাবস্থায় যে সমাজে বাস করতেন সেই সময়ের একটা সমসাময়িক চিত্র এঁকেছেন। আল-রুবাতে, স্টার্ক স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে ওয়াদি দোয়ানের ব্যাপার অবগত হয়ে বলেন যে ঐ সময়ে হত-দরিদ্র অবস্থা ছিল, যদিও কিছু লোক ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যে রত থাকতো। এই কারণেই অনুমান করা হয় যে মোহাম্মদ উত্তর দিকে শত শত মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে বহু কষ্টে জেদ্দায় পৌছান। স্টার্ক আরো নোট করেন যে হাদ্রামাতের বেশিরভাগ মানুষ গ্রাম ছেড়ে দক্ষিণ দিকে মালয়েশিয়া অথবা উত্তরে মিশরের দিকে কাজের সন্ধানে বের হয়ে পড়ে। তারা এইভাবে নিজের গ্রাম ছেড়ে বিশ বছর ধরে বিদেশে অবস্থান করেছে।

মোহাম্মদ বিন লাদেন আর আল-রুবাতে ফিরে যাননি, এইভাবেই গ্রাম ছেড়ে জেদ্দায় রয়ে গেলেন। মোহাম্মদের ভাই আবদুল্লাহ, তাঁর সাথে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু নিজের ভিটেবাড়ি সম্বন্ধে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে গ্রামে ফিরে যান। পরে আল-রুবাতে বিশাল হারেলী, কাদা ইট দিয়ে গড়ে তোলেন। এই বাড়িটা এখন চারটি পরিবারের (বিন লাদেনের কাজিনসহ) সদস্যদের জন্য যথেষ্ট। তারা এই বাড়িতেই বাস করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ তার ভাইদের এখন বিলিয়ন-বিলিয়ন সম্পদের কোন অংশের ভাগ গ্রহণ করেন কি! এই বাড়িটা এতই বৃহৎ যে, এর একটি অংশ গ্রামের স্কুলের জন্য ব্যবহৃত হয়। লাগাতার ব্যবহারের কারণে এই সুবিশাল গৃহটি মেরামত-অযোগ্য হয়ে যায়। গ্রাফিটি (Graffiti) বলেন যে এই গৃহের কিছু দেয়াল খসে গেছে এবং জানালার কাঠামোতে পচন ধরেছে। লাদেন পরিবারের সঙ্গে শেষ বারের মত আল-রুবাত ভিজিট করেছে ১৯৯৭ সালে। তখন গ্রামের বেশ ক'জন মহিলা, যাদের ঐ পরিবারের সাথে বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল, তারা সকলে মিলে সেই পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়, যা তিন দিন রাষ্ট্রীয় ভিজিটের জন্য প্রয়োজন ছিল। বিন লাদেনরাও তাদের গ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিয়ে গেছে। এই সেচের পানিতে খেজুর ও অন্যান্য ফসলের চাষকে সজীব রাখা হয় এবং পরিকল্পনা আছে যে লাদেন পরিবার কোম্পানি শহরে একটি ছোট অফিসও করবে।

জেদ্দায় পৌছে মোহাম্মদ প্রথমে মুটে বহন করার কাজ পান। হজ যাত্রীদের জন্য জেদ্দা একটা ট্রানজিট কেন্দ্রভূমি, লক্ষ লক্ষ হজ যাত্রী মক্কা নগরীতে গমন করে। তেল

আবিষ্কারের পূর্বে এই হজ্জ যাত্রীরা ছিল সৌদ পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। পরের জীবনে মোহাম্মদের অবস্থা ফিরলে তিনি তার প্রাসাদের অভ্যর্থনা রুমে এক টেবিলে অভ্যাগতদের গর্বের সাথে তার মজদুরি–ব্যাগ প্রদর্শন করতেন।

১৯৩১ সালে মোহাম্মদ ঠিকাদারি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে ফুলে–ফেঁপে ওঠে। অন্য হাদ্রামিজরা উত্তরে চলে যান এবং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। পর্যটন নির্বাহী কর্মকর্তা নাবিল আল–হাবসি বলেন যে তার বাবা ১৯৪৫ সালে ১৫ বছর বয়সে বিন লাদেন পরিবারে কাজ করেন, আল–হাবসি আরো বলেন যে— দশ বছর সৌদি আরবে কাজ করার পর তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করে একটা ছোটখাটো কাপড়ের দোকান খরিদ করেন।

১৯৫০–এর দশকে বাদশা সৌদের রাজত্বকালে, মোহাম্মদ রাজ প্রাসাদ নির্মাণকর্মে অন্যান্য ঠিকাদারের চেয়ে তার দরপত্রে কম রেট দেন, ফলে সেকাজ তিনি করেন। তার নির্মাণকর্মে বাদশা সৌদ খুশি হন এবং ক্রমে রাজ পরিবারের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন—বিশেষ করে বাদশার ভাই ফয়সলের সাথে। পরে ১৯৬৪ সালে, যখন সৌদ ও ফয়সলের সাথে ক্ষমতা নিয়ে রেষারেষি চলছিল, তখন মোহাম্মদ বাদশা সৌদকে ফয়সলের অনুকূলে রাজ্যপাট ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে প্রভাবিত করেন। তার এই ভূমিকার জন্য ফয়সল সৌদি রাজ্যের বাদশা হয়ে মোহাম্মদকে গণপূর্ত বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আর মোহাম্মদের নির্মাণ কোম্পানি বাদশার ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) নির্মাণ কোম্পানি বলে পরিচিতি লাভ করে।

মোহাম্মদ বিন লাদেন তার মন্ত্রিত্বকালে আর এক ব্যক্তিকে সৌদি বিলিয়নিয়ার বানিয়ে দেন। তার নাম আদনান খাশোগি। পশ্চিমে আদনান খাশোগি তার আরাম–আয়াস ও ভোগ বিলাসের জন্য যে অর্থ ব্যয় করত, তাতে অনেকের তাক লেগে যেতো। আদনান খাশোগি ইরানে একটা চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) নিয়ে কেলেঙ্কারি করে এবং তার ভাইপো দোদি ফায়েদ ইংল্যান্ডের প্রিন্সেস ডায়ানার সাথে একই গাড়িতে দুর্ঘটনায় মারা যায়। ১৯৫০–এর দশকে মোহাম্মদের তার নির্মাণ ব্যবসা–কর্মের জন্য জরুরিভিত্তিতে বেশ কয়েকটি ট্রাকের প্রয়োজন পড়ে। খাশোগি এই কাজটি হাতে নিয়ে আমেরিকা থেকে ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যে প্রয়োজনীয় ট্রাক জোগাড় করে দেয়, যে কারণে মোহাম্মদ খাশোগিকে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার কমিশন দেন। খাশোগির এটাই প্রথম দালালিকর্ম (ফাস্ট ডিল)।

'ওসামা' অর্থ আরবি ভাষায় সিংহ–শাবক। বিন লাদেন ১৯৫৭ সালের ১০ মার্চ রিয়াদে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পরিবার মদিনায় উঠে যায়, তখন তার বয়স ৬৬ মাস। তাদের জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় সময় ভাগ করে কারবার শুরু হয়। ওসামা ছিল মোহাম্মদের ১৭তম সন্তান। মোহাম্মদ তার বিভিন্ন স্ত্রী হতে পঞ্চাশ–এর মত পুত্র–কন্যা লাভ করেন।

মোহাম্মদ নিজেই গোলমাল করে ফেলতেন কোন পুত্র–কন্যা তার কোন স্ত্রীর। ওসামার মা ছিলেন সিরিয়ান রমণী। ওসামার মা আরো কয়েকটি কন্যা

সন্তান তার স্বামীকে উপহার দেন, অন্য কোন পুত্রের জন্ম দেননি। ওসামা-ই একমাত্র পুত্র। পরিবারের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, বিন লাদেনস্ ওসামার মা'কে তাদের পরিবারের অংশ হিসেবে গণ্য করে না, কেননা বহু বছর পূর্বে ওসামার বাবা তার মাকে তালাক দিয়েছিলেন। বিন লাদেনের এক ইয়েমেনি কাজিন, খালেদ আল-ওমেরি বলেন ওসামার মা পরে পুনর্বিবাহ করেন। তিনি এখনোও তার সন্তান ওসামার সাথে সম্পর্ক রেখেছেন। ১৯৯০-এর দশকে তার মা ওসামার সাথে সুদানে দেখা করতে যান এবং পরে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে যান তার এক পৌত্রের বিবাহে।

বিন লাদেনের পরিবার ধর্মীয়ভাবে বেশ গোঁড়া। এই জন্য ১৯৬০-র দশকের শেষপাদে জেরুজালেমের আল-আক্সা মসজিদ পুনর্নিমাণের জন্য লাদেন পরিবার চুক্তি পায়; এই মসজিদ পুনর্নিমাণের কাজ পরিবারের জন্য বড়ই গর্বের বস্তু ছিল। কেননা এই মসজিদ থেকেই প্রফেট মোহাম্মদ মক্কা থেকে এসে মিরাজে গমন করেছিলেন। পুনর্নিমাণের কারণ এই যে এক ধ্যান-পাগল অস্ট্রেলিয়ান টুরিস্ট এই মসজিদে (আল-আক্সা) আগুন লাগিয়ে দেয়। এই পারিবারিক কোম্পানি মক্কা-মদিনার দু'টি পবিত্র স্থানেরও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে। সুতরাং বিন লাদেনস্ ইসলামের তিনটি পবিত্র স্থানের পুনর্নিমাতা প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করতে পারে। ১৯৯৯-এ এক ইন্টারভিউতে ওসামা বিন লাদেন বলেছিল যে, তার বাবা (মোহাম্মদ) মহান ঈশ্বরের করুণায় এক দিনেই তিন পবিত্র শহরের মসজিদে (মক্কা-মদিনা-জেরুজালেম) সময় সময় প্রার্থনা করেন। এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, মোহাম্মদ একনিষ্ঠ কর্মঠ ব্যক্তি হিসেবে তার সন্তানদের অতি কঠোরভাবে ধর্মীয় নীতি পালন ও পারিবারিক বাণিজ্যের সততা বজায় রাখা-উভয় দিকে দৃষ্টি রেখে চলেন। বাল্যাবস্থা থেকেই, ওসামা পরিবার কোম্পানির রাস্তা তৈরি করার কাজ তদারক করতো। শিশুকাল থেকে, অন্যদিকে, ইসলামী আকিদার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তা পালন করতে থাকে। হজের সময় মোহাম্মদ অনেক হজযাত্রীকে মেজবান (হোস্ট) হিসেবে আপ্যায়িত করতেন। এসব হজ যাত্রীর মধ্যে কেউ থাকতেন মুসলিম আন্দোলনের নেতা অথবা প্রবীণ উলেমা ব্যক্তি।

১৯৬৭ সালে, যখন ওসামার বয়স দশ, তার বাবা (মোহাম্মদ) বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। মোহাম্মদের এস্টেটের মালিকানা তার সন্তানদের কাছে চলে যায় কোম্পানির অংশ (শেয়ার) রূপে। ওসামার বড় ভাই সালেম, দশ বছরের বড়, তাই তিনিই কোম্পানির দেখাশোনা করতে থাকেন। সালেম ইংল্যান্ডে স্কুল-পূর্ব শিক্ষাগ্রহণ করে এক ইংরেজ মহিলা ক্যারোলিন কেরীকে বিবাহ করেন। ক্যারোলিন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের মেয়ে এবং তার সৎ-পিতা ছিলেন মার্কুইস অব কুইন্সবেরী। সালেম গিটার বাজাতে ভালোবাসতেন এবং তার অনেকগুলো জেট বিমান ছিল-যার পাইলট তিনি নিজেই। সময় সময় প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের অবাক করে বিমানে 'স্টান্ট' করতেন। সালেম বাদশা ফাহদের

রাজ বয়স্য (কোর্টজেস্টার) রূপে কৌতুক করতে পারতেন অন্যদের মত। এর জন্য বাদশা ফাহদ তার কোম্পানিকে বহু লাভজনক চুক্তি দিয়ে দিতেন।

১৯৬৯ সালে সৌদি আরবে ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাট ভিক্টর হেনডারসন চাকরি নিয়ে আসেন। তিনি বলেন সত্তর দশকের শুরুতে বিন লাদেনস্ সৌদি প্রশাসনের অংশরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই বড় বড় রাজপথের নির্মাণ চুক্তি লাদেন কোম্পানির হাতে আসে। জেদ্দা থেকে তায়েফে যাওয়ার প্রধান সড়ক (হাইওয়ে) নির্মাণ লাদেনরাই করে। সালেমের প্রচেষ্টায় লাদেন কোম্পানি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয় এবং নির্মাণ কাজের বাইরে, শিল্প-কারখানা, তেল প্রকল্প, খনি (মাইনিং) এবং টেলিযোগাযোগে কোম্পানির কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

ছোট ভাই ওসামার বিপরীতে সালেম আমেরিকা-প্রিয় ছিলেন। ১৯৭৬ সালে সালেম এক নামকরা হিউস্ট্যান ব্যবসায়ী জেমস বাথকে (James Bath) বলেন লাদেন পরিবারকে হিউস্ট্যান ব্যবসায়ী মহলে পরিচিত করার জন্য সেখানকার প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে।

পরের বছর বাথ সালেমের জন্য হিউস্ট্যানে একটি প্লেন লিজিং কোম্পানি ক্রয় করে। বাথ-এর আমেরিকায় উচ্চ মহলে ভালো জানাশোনা ও যোগাযোগ ছিল। জর্জ ডবলিউ বুশ বাথের বন্ধু, সেই সময় তেল ব্যবসায়ে আগ্রহী হন। বুশের বাবা ছিলেন সিআইএ পরিচালক এবং ১৯৮০ সালে রোনাল্ড রেগানের সাথে ভাইস-প্রসিডেন্টাল রানিংমেট রূপে দাঁড়ানোর কথা ছিল। (১৯৭৯-১৯৮০-র মধ্যে বাথ জর্জের সাথে টেক্সাস এয়ার ন্যাশনাল গার্ড-এ কাজ করেছে, সেই সুবাদে, তার বন্ধু বুশকে আরবাসতো (Arbusto) নামের একটি তেল কোম্পানিতে ৫০ হাজার ডলার দিয়ে সাহায্য করে এনার্জি ব্যবসাতে প্রথম লগ্নি করেছিল)।

সালেম যখন আমেরিকা সফর করতেন, প্রায়ই সময় কাটাতন অরল্যান্ডোতে, তাই তিনি অরল্যান্ডোতে একটা বাড়ি কিনে ফেলেন। সালেম তার বাবার মত প্লেন ক্র্যাশে ১৯৮৮ সালে মারা যান। একটি মাইক্রোলাইট চালনার সময় তিনি তার বিমান নিয়ে টেক্সাসের সান-এন্টোনিও-র কোন একটি পাওয়ার লাইনে দুর্ঘটনা ঘটান। ফল মৃত্যু।

অসময়ে সালেমের মৃত্যু সত্ত্বেও লাদেনের পরিবার আমেরিকার সাথে অসংখ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরিবারের কয়েকজন স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস শুরু করে (যদিও তারা ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর নিরাপত্তার কারণে, ঘটনার কয়েক দিনের পরেই দেশে ফিরে যায়); এই পরিবারের নিউজার্সি এবং টেক্সাসে বেশ কিছু সম্পত্তি আছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিবারের নামে ফেলোশিপ আছে ইসলামিক স্থাপনা বিদ্যায় এবং ওসামার ভাইদের মধ্যে একজন আমেরিকান কমিউনিকেশনস্ জায়ান্ট মটোরোলা (Motorola) কোম্পানির একটি সাবসিডিয়ারির পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। উপরন্তু, এই পরিবার কোম্পানি ১৯৯০-র দশকে মেরিল্যান্ডে একটি স্যাটেলাইট অফিস স্থাপন করে, ম্যানহাটনে

জনসংযোগ এজেন্সি নিয়োগ করে এবং হোয়াইট-সু ল' কোম্পানি সুলিভান এন্ড ক্রমওয়েল থেকে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করত।

এই পরিবার কোম্পানি এখন ওসামার ভাইদের মধ্যে একজন, বাকর, পরিচালনা করেন। বাকর সৌদি বিলান্দি গ্রুপের (এসবিজি) চেয়ারম্যান। কোম্পানির অন্যান্য উচ্চপদে তার অন্য ভাইরা নিয়োজিত। ইয়াহিয়া হল ভাইস-চেয়ারম্যান, ওমর হল প্রেসিডেন্ট এবং হাসান ভাইস-প্রেসিডেন্ট। অন্য একভাই এস্‌লেম (Yeslam) জেনেভায় থেকে পরিবার কোম্পানির অর্থনৈতিক লেনদেন দেখাশোনা করে।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি বিন লাদেন গ্রুপ কোম্পানি এমনভাবে ফেঁপে উঠলো যে তখন তার প্রাক্কলিত মূল্য (estimated value) গিয়ে দাঁড়ালো পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। প্রধান পরিবার কোম্পানি সৌদি বিলান্দিন গ্রুপ-এর (SBG) ১৯৯৯ সালে ৩৭ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী ছিল। কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট-এর মধ্যে, অধুনা বছরে, এসবিজি যেসব কাজ হাতে নিয়েছিল তার মধ্যে একটি হল কায়রো বিমানবন্দরের রান-ওয়েজ ঢেলে সাজানো। তাছাড়া ইয়েমেনের আদেন এয়ারপোর্টের পুনর্নিমাণ, কায়রোতে একটি নতুন উপ-শহর নির্মাণ; জর্ডনের আম্মানে একটি হায়াত (Hyatt),সিরিয়ার লাতাকিয়াতে সি-সাইড রেসর্ট; কুয়ালালামপুরে একটি মসজিদ, রিয়াদে তিরিশ-তলা-বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন এবং সৌদি আরবে চার হাজারোর্ধ্ব আমেরিকান সৈন্য সঙ্কুলানের জন্য একটি সেনানিবাস, যা তৈরি করতে ব্যয় হবে ১৫০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার।

১৯৯০-র দশকের মধ্যভাগে রিয়াদে ও দাহরানে আমেরিকান সেনানিবাসের ওপর দু'দুবার বোম্বিং হবার কারণে সেই 'বেস' শেষে তৈরি হয় সৌদি মরুভূমির মধ্যভাগে। ঐ আক্রমণদ্বয়ের মধ্যে একটি ওসামা বিন লাদেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে অনেকে মনে করে। (আরো মজার ব্যাপার হলো ২০০১ সালে সেপ্টেম্বর-এ ইউএস সামরিক পরিকল্পনাকারী বলেছিল, ঐ 'বেস' থেকে লাদেনের আফগান গুপ্তস্থানে বিমান হামলা করা হবে। কিন্তু হল বিপরীত)।

বিন লাদেন পরিবার তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যদিকে প্রসারিত করে ফেলে—যেমন মোটর গাড়ির স্পেয়ার পার্টস থেকে সৌদি আরবের রেসর্টস্ (ভ্রমণ-আশ্রয়) পর্যন্ত। লাদেন পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, বিন লাদেন পরিবারের দুবাই-এ অঢেল সম্পত্তি আছে; বিন লাদেন-এর কারবারের সাথে সম্পৃক্ত-এক মহল বলেছে যে, পরিবারর অধিকাংশ সম্পদ জড়িত আছে সৌদি আরবে ল্যান্ডহোল্ডিংস-এ।

এসবিজি (SBG) মধ্যপ্রাচ্যে স্ন্যাপল ড্রিঙ্কস্ (Snapple drinks) ও পরশে (Porsche) এবং ভক্সওয়াগন কার বিতরণেরও জড়িত অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ করে। এছাড়া ব্যাপকভাবে প্রাণীদের নিয়ে কথিত ফিচার আরবি পুস্তক প্রকাশনা করার জন্য ডিজনীর (Disney) দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত। মধ্যাপ্রাচ্যে হার্ডরক কাফেতে যখন হ্যামবার্গারের জন্য বলা হয়, তখনও বিন লাদেন পরিবার সেই লভ্যাংশের

ওপর ভাগ বসায় এবং ১৯৯০-র দশকের শেষভাগে, SBG মটোরোলার মোবাইল ফোন-এর বিশ্বব্যাপী নেট-ওয়ার্কে অর্থ যোগান দেয়। পরিশেষে, SBG (Saudi Bilandi Group) মক্কা ও মদিনার পবিত্র মসজিদ দুটির সংরক্ষণ ও মেরামত কর্ম লাগাতারভাবে চালিয়ে যায় এবং এই দুই পবিত্র ঘরের ধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দশ লক্ষ মুসল্লিদের উপাসনার জন্য উপযুক্ত করে দেয়।

সালেম যখন পরিবারের ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, ওসামার মধ্যে তখন ধর্মীয় ভাবধারা চাড়া দিয়ে ওঠে, যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সতের বছর বয়সে, সে এক সিরিয়ান আত্মীয়াকে বিবাহ করে যে তার চার পত্নীর প্রথমা। এর পরই সে জেদ্দায় বাদশা আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে অর্থনীতি ও গণ-প্রশাসন বিষয়ে ডিগ্রিলাভ করে।

এই জেদ্দাতেই বিন লাদেন প্রথম উগ্রবাদী মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং সর্বপ্রথম দু'জন ইসলামিক স্টাডিজ-এর শিক্ষক আবদুল্লাহ আজম ও মোহাম্মদ কুতুব-এর মন্ত্র-শিষ্য হয়। এই দু'জন শিক্ষকের, তার ওপর যে প্রভাব পড়ে, তাকে হিসেবে আনা যায় না—এ যেন রোনাল্ড রেগান ও মিল্টন ফ্রাইডম্যানের ভ্রাতা তাকে ধনবাদ (ক্যাপিট্যালিজম) সম্বন্ধে ছবক দিয়ে গেল। আজম তাকে আধুনিক বিশ্বের জন্য আন্তর্জাতিক জিহাদিদের নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে হাতে খড়ি দিল আর মোহাম্মদ কুতুব নিজেই ছিলেন মৌলবাদী আলেম ব্যক্তি, তার ভাই ছিলেন সৈয়দ কুতুব জিহাদিস্ট আন্দোলনের মূল গ্রন্থ 'Signposts'-এর রচয়িতা। সুতরাং উগ্র মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এই দুই 'বাদ'-এর ককটেল তৈরি করে মোহাম্মদ কুতুক বিন লাদেনকে খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে দিলেন। ১৯৬৬ সালে মিশরে সৈয়দ কুতুবের মৃত্যুদণ্ডের পর, মোহাম্মদ কুতুব তখন নিজ ভ্রাতা সৈয়দ কুতুব কর্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতে কাঠখড়ি যোগান দিতে থাকলেন আর সৈয়দ কুতুব রচিত কেতাবের প্রধান তফসিরকার (ব্যাখ্যাকার) হলেন।

এইসব বিপ্লবাত্মক পুস্তকাদির ব্যাখ্যা বিন লাদেন ও তার সঙ্গীদের গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে। মোহাম্মদ কুতুব ব্যাখ্যা করলেন যে বর্তমান আধুনিক সমাজ—মুসলিম সমাজসহ হল সেই 'জাহেলিয়া' সমাজ, যা ইসলাম-পূর্ব আরবে অর্থাৎ কোরান নাজেলের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। তাই যারা সত্যিকারের মুসলিম তাদের এই জাহেলী সমাজের বন্ধন হতে মুক্ত করতে হবে মুসলিম বিশ্বকে এবং তার একমাত্র পত্র হল জেহাদ, ধর্মযুন্ধ। কোরানের কয়েকটি আয়াতে জেহাদ যে কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক যুন্ধ বলে ধারণা দেয়া হয়েছে সে ধারণা নাকচ করে বলেন : যারা এই ধারণা নিয়ে তর্ক করে তারা ইসলামী জীবনধারার মহিমাকে খাটো করে, ক্ষুণ্ন করে। কুতুব বোঝালেন যে এর গুরুত্ব হল যে ইসলামী জীবনধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে, আক্রমণাত্মক জেহাদ করতে হবে ইসলামের শত্রুদের বিরুন্ধে তারা বিধর্মী অমুসলিম সমাজই হোক আর মুসলিম, কেননা তারা কোরানের বাণী (প্রিসেপ্ট) অনুসরণ করে না। এই-ই হল বিন লাদেন ও তার অনুসারীদের আদর্শগত

মূলমন্ত্র। এরা শুধু পশ্চিমাদের টারগেট (লক্ষ্যবস্তু) করে না, মুসলিম সৌদি রাজ্য ও অন্যান্য মুসলিম রাজ্যকেও টারগেট করে কারণ তারা 'ধর্মদ্রোহী (এপস্টেট)।

১৯৭৯ সাল থেকেই বিন লাদেন এই সব ধারণায় ডুবে গেল। কারণ এই বছরেই মুসলিম বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে দেখল নতুন 'ইসলামী' জাগরণ। মুসলিম ক্যালেন্ডারে নতুন শতাব্দির প্রত্যূষ দেখা দিল—উদিত হল নতুন সূর্য। প্রথাগতভাবে সময় পরিবর্তিত হল। সে পরিবর্তন কেমন ? জানুয়ারি মাসে দেখা গেল ইরানে শাহের উৎখাত, পতন; আয়াতুল্লাহ খোমেনি তেহরানে ফিরে এলেন। তারপর মার্চ মাসে, অনেক মুসলিমকে ক্ষুব্ধ করে, মিশর ও ইসরাইল শান্তিচুক্তি সই করে। নভেম্বর মাসে বিশ্ববাসীকে স্তব্ধ করে দিল এই সংবাদে যে শত শত উগ্রবাদী ইসলামী জঙ্গি ইসলামের পবিত্রতম স্থান মক্কা গ্রাভ মসজিদ অবরোধ করেছে এবং সৌদি আরবের নিরাপত্তা প্রহরীর সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দিনভর রক্তাক্ত যুদ্ধে শত শত ইসলামী জঙ্গিও নিরপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছে। সৌদি শাসক পরিবারে এ বিস্ময়কর পরিস্থিতি তাদের সম্মানে গুরুতর আঘাত স্বরূপ। সর্বশেষে, ডিসেম্বরের শেষের দিকে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করেছে আক্রমণ করে। এই সংবাদ বিশ্ব কাঁপানো সংবাদ, কেননা নাস্তিক কমিউনিস্টরা জবর দখল করেছে আফগানিস্তানের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র।

সোভিয়েতের এই আগ্রাসন পশ্চিমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে হল। প্রেসিডেন্ট কার্টার সোভিয়েতের এই আচরণের প্রতি প্রথমে অনুমোদনের ভাব দেখালেও পরে স্ট্রাটেজিক কারণে মত বদলিয়ে শক্তভাবে অন্যদিকে অবস্থান নিলেন। কিন্তু সোভিয়েতের এই আগ্রাসনে সারা মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল। যেমন, ১৯৩০-র দশকে লিবারেল ও সোস্যালিস্টরা যেভাবে জর্জ অরওয়েল, আনেস্ট হেমিংওয়ে ও জন দম পাস্‌সো—স্পেনের ফ্যাঙ্কোর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের যুদ্ধের কারণে সোচ্চার ছিলেন, তেমনি বিশ্বের মুসলিমরাও ১৯৮০-র দশকে সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধে জড়িয়ে গেল।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত যুদ্ধ আমাদের ব্রুটাল যুগের ব্রুটালতম (নৃশংসতম যুদ্ধ। রাশিয়ানরা দশ লক্ষের বেশি আফগানকে হত্যা করে এবং প্রায় পাঁচ মিলিয়ন আফগানক যা দেশের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, জব্বরদস্তি করে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করে অর্থাৎ দেশত্যাগ করিয়ে ছাড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই যুদ্ধই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যেখানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে নাকাল হতে হয়েছে। আর সম্ভবত গত কয়েক দশকের মধ্যে যেসব আন্তঃদেশীয় যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, সবচেয়ে এই যুদ্ধই ছিল খুব সীমিতভাবে প্রচারিত—অর্থাৎ রিপোর্টিং-এর কাজটা মিডিয়াযোগ্য হয়নি। ঐতিহাসিক রবার্ট ডি কাপলান বলেন ১৯৭৫ সালে লেবাননে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছে তাতে যে পরিমাণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, আফগানিস্তানে তার চেয়ে দশগুণ লোক মারা গেছে; কিন্তু রিপোর্টাররা এদিকটাকে উপেক্ষা করেছে বলে মনে হয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যে সব সাংবাদিক

আফগানিস্তানে গিয়েছিলো, তাদের পৃথিবীর, সবচেয়ে দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করতে হয়েছে; সব সময়ের জন্য হেলিকপ্টার গানশিপের গুলি খাওয়ার আশংকায় ভুগেছে; ভাগ্য ভাল হলে খাবার পেয়েছে। তাছাড়া নানা রকম রোগ-বালাই-এর আতঙ্কতো ছিলই। এর বিপরীতে বলা যায়, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, রিপোর্টাররা ইউএস হেলিকপ্টারের সম্মুখ লাইনে গিয়েও ফিরে এসেছে অক্ষতভাবে, হোটেলে ফিরে সুইমিংপুলে ডুবে থেকে দেহ ঠাণ্ডা করেছে। এটা বলা হচ্ছে ভিয়েতনামে কর্মরত রিপোর্টারদের প্রশস্তি গাওয়ার জন্য নয়, শুধু তুলনা করে দেখানো যে আফগান যুদ্ধে রিপোর্টারদের যে রিস্ক বা জীবনের ঝুঁকি ছিল, ভিয়েতনামে ছিল না।

সাংবাদিক রব শুলথেইস (Rob Sehultheis) একজন বিরল সাংবাদিক যিনি আফগানিস্তানের গভীরে বারেবারে প্রবেশ করেছেন। তিনি এই যুদ্ধকে পবিত্রতম যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছন এবং মনে রাখার মতো। তিনি লিখেছেন ঐ সব সাহসী যোদ্ধা ও তাদের পরিবার, যাদের সাথে আমি হেঁটেছি—তারা তাদের বিশ্বাস ও স্বাধীনতার জন্য নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়েও স্বাধীনতা পায়নি, তারা সত্যিকারের ঈশ্বরের মানুষ। সত্যি বলতে কি, যদি কোন যুদ্ধকে সত্যিকারের জেহাদ বলা যায়, তাহলে আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, নিশ্চয়ই জেহাদ। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একটা বৃহৎ শক্তি, একটি বিশাল কৃষক জাতিকে আক্রমণ করে বসলো এবং সে জাতের ওপর সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে গেল। সে দেশের জনতা ইসলামী ঝাণ্ডার নিচে বুখে দাঁড়ালো বিধর্মীদের বিতাড়িত করতে। ১৯৮৫ সালের একটি রিপোর্টে, একটি স্বাধীন মানবতাবাদী সংস্থা রাশিয়ার এই অযোগ্য আক্রমণকে এইভাবে গুছিয়ে বলেছে সোভিয়েত গ্রাউন্ড ফোর্স বিশেষ কমান্ডো ইউনিট দ্বারা বলীয়ান হয়ে ব্যাপকভাবে গণহত্যা চালায়—নারী-শিশু নির্বিশেষে; সোভিয়েতরা ঘনবসতি এলাকায় এন্টি-পার্সোনেল মাইন ছড়িয়ে দেয়। আফগানিস্তান এইভাবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মাইন অধ্যুষিত দেশ বলে চিহ্নিত হয়।

এই কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও, সোভিয়েত স্পষ্টত আফগান ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দির প্রথম দিক পর্যন্ত ঐ সময়কার পৃথিবীর সুপার পাওয়ার ব্রিটিশ রাজ্য তিনটি যুদ্ধে এই দুরন্ত আফগানদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছিল। পরিশেষে ব্রিটিশরা বুঝতে পার যে, আফগানিস্তান দখল করার অর্থ হল ধ্বংস ডেকে আনা। পরবর্তীতে তারা সে দেশের ওপর তাদের প্রভাব ফেলাতে পরোক্ষ পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে প্রথম আফগান যুদ্ধের এক ব্রিটিশ বিবরণে বলা হয়—তোমাদের জানা দরকার, উপলব্ধি করা প্রয়োজন আফগানদের যুদ্ধতেজ, ফাইটিং স্পিরিট। এই দেশের সামরিক ইতিহাসে কোন কলঙ্কিত পাতা নেই, ১৮৪২-এ কাবুল ও জালালাবাদের মধ্যে প্রমাণ সাইজের ব্রিটিশ ফোর্সের মারাত্মক ধ্বংসচিহ্ন ছাড়া।...ডা. ব্রাইডন (ব্রিটিশ চিকিৎসক) কোন প্রকারে প্রাণ নিয়ে জালালাবাদে পৌছান। চার হাজার পাঁচশো সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ও বারো হাজার ক্যাম্প

ফলোয়ার্স–এর মধ্যে একমাত্র ডা. ব্রাইডন জীবিত ব্যক্তি। এইতো সেদিন পর্যন্ত পেশওয়ারে আমেরিকান ক্লাবে ডা. ব্রাইডনের বিখ্যাত ভিক্টোরিয়ান তৈলচিত্র ঝুলছিল। পরে, ব্রাইডন মৃত্যুর দূত বলে পরিচিতি পান। তার আহত ও বিধ্বস্ত ঘোড়াটি, পুরো ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ধ্বংসের পর, একমাত্র সাক্ষীরূপে তার সওয়ারসহ জালালবাদ ক্যাম্পে হাজির হয়। ক্রেমলিনের জেরনটোক্র্যাসি (শাসকগোষ্ঠী) যদি এই পেইন্টিং দেখতো আফগানিস্তান আক্রমণের পূর্বে, তারা অন্তত আফগানিস্তানকে রক্ষা করতে পারতো এবং ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিজেদের ভাগ্যকে নিক্ষিপ্ত করার সময়কে দীর্ঘায়িত করতে পারতো।

সোভিয়েত আক্রমণের সপ্তাহকালের মধ্যেই, বাইশ বছরের বিন লাদেন তার পা'দুটি ও মানিব্যাগ সম্বল করে পাকিস্তানে আফগান নেতা বুরহানুদ্দিন রব্বানী ও আবদুল রসুল সায়াফ–এর সাথে দেখা করে। এই দুই নেতার সাথে বিন লাদেন পূর্বে হজের মৌসুমে সাক্ষাৎ পেয়েছিল। পরে সে তার পরিবারে সৌদি আরবে ফিরে আসে এবং পরিবার সদস্য ও বন্ধু–বান্ধবদের সাথে আলোচনা করে আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের অর্থ ও সমর্থন যোগানোর জন্য এবং তার পাকিস্তান যাত্রা অব্যাহত রাখে অর্থ সংগ্রহের কাজে।

১৯৮০–র দশকের প্রথম দিকে বিন লাদেন পরিবারের নির্মাণকর্মে পুরোনো ঘরবাড়ি ভাঙার কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলো পরিবর্তে নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য। এই সময়ে সে প্রথম আফগানিস্তানে পাড়ি জমালো, সাথে নিয়ে গেল শত শত টনের বিল্ডিং মেসিনারি, বুলডজার, লোডার, ডাম্প স্ট্র্যাকস্ এবং বিল্ডিং ট্রেঞ্চ খোঁড়ার জন্য যন্ত্রপাতি। এই সমস্ত মেসিনারি ও যন্ত্রপাতি সে মুজাহিদিনদের দিল কাজে লাগাবার জন্য। এই মেসিনারিগুলো রাস্তা তৈরি, পাহাড়ে আশ্রয় নেবার জন্য টানেল খোঁড়া, প্রাথমিক হাসপাতাল তৈরি করার কাজে ব্যবহার করার জন্য উপযোগী। বিন লাদেনের অনুসারীরা আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলে মাইন–সুইপিং অপারেশন করারও বন্দোবস্ত করলো।

মুজাহিদিনদের আমেরিকা সাহায্য করার জন্য অর্থ ও সমর্থন যোগান দেয়া সত্ত্বেও, বিন লাদেন ১৯৮০–র দশকে প্রথমদিকে আমেরিকা–বিরোধী প্রচারকার্য শুরু করে দিল। বিন লাদেনের লন্ডনের সহযোগী খালেদ আল ফওয়াজ তার এক বন্ধুকে বলেছিল, ১৯৮২ তে বিন লাদেন আমেরিকার তৈরি জিনিসপত্র বয়কট করার জন্য আহ্বান জানায়। ১৯৯৯ সালে এক ইন্টারভিউতে, বিন লাদেন নিজেই বলেছিল যে ১৯৮০ সালের মধ্যভাগে সে সৌদি আরবে ইউএস ফোর্সকে আক্রমণ করা ও তাদের তৈরি জিনিসপত্র বয়কট করার জন্য লেকচার দিয়েছিল।

১৯৮৪ সালে বিন লাদেন পেশওয়ারে গেস্ট হাউস তৈরি করে বিভিন্ন দেশের জেহাদি মুসলিমদের স্থান দেয়ার জন্য। এই গেস্ট হাউসকে বলা হত বায়েত আল আনসার, সাহায্যকারীদের আবাসস্থল, মদিনার আনসারদের অনুকরণে—যখন প্রফেট মোহাম্মদ মদিনায় হিজরত করেন। প্রথমে এই গেস্ট হাউস সেই সব

সাহায্যকারীদের জায়গা দিত যাদের কোন আফগান ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেনিং দেয়ার জন্য পাঠানো হত। পরে বিন লাদেন নিজে সামরিক অপারেশন গড়ে তোলে। যে সময় বিন লাদেন বায়েত আল আনসার তৈরি করে, সেই সময় তার সাবেক প্রফেসর আবদুল্লাহ আজম পেশওয়ারে একটি মক্তব আল–খেদমত বা সেবা অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। এই সার্ভিস অফিস আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করতে শুরু করে এবং জেহাদের জন্য সারা বিশ্বে ডাক দেয়। বিন লাদেন এই জেহাদের প্রধান অর্থযোগানদাতা ছিল। শেষে এই সার্ভিস হাউসের তত্ত্বাবধানে পেশওয়ারে প্রায় ডজন খানেক গেস্ট হাউস তৈরি করা হয়।

আদর্শগতভাবে আজম ছিলেন গডফাদার এবং আফগান জেহাদে নতুন লোক ভর্তি করে ট্রেনিং দেয়ার ব্যাপারেও সমভাবে উদ্যোগী ছিলেন। বিন লাদেনের ইসলামী জোশ ও বিশ্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকার কারণে তার ওপর আজম উস্তাদি প্রভাব সব সময়েই খাটিয়েছেন। প্যালেস্টাইনি সাংবাদিক জামাল ইসমাইল ১৯৮০–র দশকে পেশওয়ারে ছাত্র ছিলেন এবং ১৯৮৪–র পর বিন লাদেনের সাথে বারবার দেখা হয়। তিনি বলেন আজমই একমাত্র ব্যক্তি যে ওসামাকে প্রভাবিত করেন আরব যোদ্ধাদের আফগানিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য অর্থ যোগান দিতে। এক আরবি ভাষার টেলিভিশন স্টেশনে, বিন লাদেন নিজেই আজম সম্বন্ধে বলে যে আজম জাতির যোগ্য ব্যক্তি। এই সময়ে যারা বিন লাদেন ও আজমকে জানতো তারা মনে করতে পারে যে আজম ছিলেন বাগ্মী ও কারিশমা–যুক্ত ব্যক্তি, আর পঁচিশ বছরের বিন লাদেন ছিল একজন সৎ ও বিশ্বস্ত যুবক, কিন্তু উপযুক্ত নেতা ছিল না।

বাল্যবয়সে তার ধার্মিক পিতাকে হারিয়ে বিন লাদেন সারা জীবন ধরে ধার্মিক উগ্রবাদী প্রবীণ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমে, আজম তারপর আফগান কমান্ডার আবদুল রসুল সায়াফ। এরপর তার জেহাদি প্রতিষ্ঠানের সেকেন্ড–ইন–কমান্ড আইমান আল–জাওহারি। এইসব মানুষের একটা নির্দিষ্ট ভিশন বা লক্ষ্য ছিল ধর্মযুদ্ধে কেমন করে জীবনকে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু বিন লাদেন তার জেহাদি কর্মকাণ্ডে প্রকৃতভাবে অনুপ্রাণিত হয় তার পিতার প্রতিকৃতি থেকে—যা সে মনে ধরে রাখতো। বিন লাদেন এক পাকিস্তানি সাংবাদিককে বলেছিল : আমার বাবার অত্যন্ত আগ্রহ ও ইচ্ছা ছিল যে তার পুত্রদের মধ্যে একটি যেন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাই আমি সেই পুত্র যে তার বাবার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছি।

বিন লাদেনের ওপর আজমের প্রভাবকে অনুভব করার জন্য ও পরবর্তী পুরো জেহাদি আন্দোলনের গোড়ার কথা জানার জন্য, আমি এখানে আজমের পূর্বকথা সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। আবদুল্লাহ আজম ১৯৪১ সালে জেনিনের নিকটবর্তী প্যানেস্টাইনের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে দামস্কের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থিওলজিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। জেহাদে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং ইসরাইলি বিদ্বেষী ছিলেন, কারণ ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন অধিকার

করে নিজের রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য ইসরাইলিদের নিন্দাবাদ করেন এবং ১৯৬৭ সালে ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরবর্তীতে তিনি কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এখানে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করে পরে, ১৯৭৩ সালে ইসলামিক জুরিস প্রুডেন্সে ডক্টরেট করেন। কায়রোতে লেখাপড়া করার সময়, আজমের জেহাদি পরিবারের সৈয়দ কুতুবের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে— যেখানে তিনি জেহাদের আদর্শিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। আল-আজহারে অধ্যয়নকালে আজমের পরিচয় হয় মিশরের শেখ ওমর আবদেল রহমানের সাথে। শেখ ওমর পরে জেহাদি আন্দোলনের আধ্যাত্মিক নেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজমের অন্তরঙ্গ সহযোগী হয়ে ১৯৮০-র দশকে ধর্মযোদ্ধাদের বিশ্বব্যাপী নেট-ওয়ার্কে জেহাদি তৎপরতা ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টায় একাত্ম হন।

১৯৭০-র দশকের শেষের দিকে, আজম আম্মানে জর্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফেকাল্টিতে যোগ দেন ইসলামী আইন শিক্ষা দেয়ার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আচরণের জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে ঝগড়া হওয়ায় তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং পরে তিনি সৌদি আরবে যান শিক্ষকতা করতে। ১৯৮০ সালে তার আফগান মুজাহিদিন নেতাদের সাথে সৌদি আরবে সাক্ষাৎ হয়, ফলে তিনি তার বাকি জীবন আফগানিস্তানে নিজেকে জেহাদের কারণে উৎসর্গ করেন। তারপর তিনি পাকিস্তানে যান এবং ইসলামাবাদের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে নিযুক্তি পান, পরে পেশওয়ারে বাস শুরু করেন।

আজমের বিশাল বক্ষে তার ধূসর বর্ণের দাড়ি ছড়িয়ে থাকতো। তার অগ্নিঝরা দৃষ্টি দিয়ে তিনি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারতেন। এতে সকলে তাকে নেতারূপে গ্রহণ করত। আজম বিশ্বাস করতেন যে 'খলিফা'কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে একমাত্র জেহাদই প্রকৃষ্ট পন্থা। তিনি আরো স্বপ্ন দেখতেন এই খলিফার একক এক-নায়কত্বে বিশ্বের সব মুসলিম একত্রিত হবে। তার মূলমন্ত্র হল 'জেহাদ ও রাইফেল। কোন আলোচনা, কনফারেন্স এবং ডায়ালগ নয়' এবং তিনি তার বিশ্বাসকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করতেন, প্রায়ই মুজাহিদিনদের সাথে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়ে।

আজমের মতে আফগানিস্তানের জেহাদে যোগ দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য এবং এই মর্মে তিনি এক ব্যাপক প্রচারপত্রে বলেছিলেন 'মুসলিম রাজ্যের সীমানা রক্ষা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।' আজম লিখেছিলেন, 'শুধু আফগানিস্তান থেকে বিধর্মীদের বিতাড়িত করা নয়, এই কর্তব্য শেষ হবে না শুধু আফগানিস্তান পুনরুদ্ধার করে; জেহাদ প্রত্যেক মুসলিমের পালিত কর্তব্য হয়ে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না অন্য সব বিজিত মুসলিম ভূমি আমাদের কাছে ফিরে আসবে এবং ইসলাম আবার সে সব দেশে রাজত্ব করবে। আমাদের সামনে আছে প্যালেস্টাইন, বোখারা, লেবানন, চাদ (Chad), ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, ফিনিপিনস্, বার্মা, দক্ষিণ ইয়েমেন, তাসখন্দ এবং আন্দালুসিয়া (দক্ষিণ স্পেন)।'

আজম সারা পৃথিবী ঘুরেছেন আফগানি জেহাদের জন্য জেহাদি মুসলিম ও অর্থ সংগ্রহ করার জন্য আর প্রচার করেছেন যে–'আল্লাহর কারণে একঘণ্টা জেহাদের সারিতে দাঁড়ানো ষাট বছরের রাতের এবাদতের চেয়ে ভালো।' খালেদ আল-ফাওয়াজ স্মরণ করে যে—আজম একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'তার-বার্তা'রূপে জেহাদি আন্দোলনের কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়িয়েছেন—যেমন কুয়েত, ইয়েমেন, বাহরাইন, সৌদি আরাবিয়া এবং আমেরিকায় খবর প্রচার করতে, জেহাদি লোক জোগাড় করতে, মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে।

আজমের বাণী এতোই শক্তিশালী ছিল যে ভিডিওটেপের মাধ্যমে তার বাণী শুনে মানুষজন জেহাদে যোগ দেবার জন্য উত্তেজিত হত। মোহাম্মদ ওদেহ ছিল জর্ডানের নাগরিক। ১৯৯৮ সালে কেনিয়ায় আমেরিকান এম্বেসিতে বোম্বিং-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮০-র দশকের দিকে ফিলিপিন্‌সে সে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র ছিল। ভিডিও-তে আজমের জেহাদের ডাক শুনে সে উদ্বুদ্ধ হয়। এর পরেই সে আফগানিস্তানে পৌঁছে। যেখানে প্রশিক্ষণ পায় বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রে যেমন—একে-৪৭ মেসিনগান, এন্টি-ট্যাঙ্ক ও এন্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট মিসাইল এবং নানারকমের এক্সপ্লোসিভ-এর ব্যবহার, যথা সিও, সিও ও টি এন্ড টি। পরবর্তীতে শপথ করে বিন লাদেনের আনুগত্য প্রকাশ করে।

আজমকে প্রায়ই দেখা যেতো পেশওয়ারে মিশরীয় জঙ্গিপুরুষ শেখ রহমানের সাথে। রহমানও পেশওয়ারে একটি গেস্ট হাউস প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৮০-র দশকে। এ সময়ে তিনি দুইবার পেশওয়ারে আসেন। ১৯৮৫-তে, শেখ রহমান প্রথম আফগানিস্তানে যান উগ্র মৌলবাদী গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায়। বাল্যকালে এই শেখ অন্ধ হয়ে যায় বহুমূত্রের কারণে। দূরে আর্টিলারি শেল ফায়ারিং-এর শব্দ শুনে শেখ কাঁদতে শুরু করেন এই দুঃখে যে তার অন্ধত্বের জন্য তিনি জেহাদি কারবার দেখতে পাচ্ছেন না।

আর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন আরবের মোহাম্মদ আবদুর রহমান খলিফা। ইনি জর্ডনের মানুষ ছিলেন, কিন্তু আফগান যুদ্ধে যথেষ্ট অর্থ যোগান দেন। আবদুর রহমান খলিফা পরে বিন লাদেনের এক বোনকে বিয়ে করেন। মুসলিম ব্রাদারহুডের জর্ডন শাখার তিনি প্রধান ব্যক্তি এবং আফগান জেহাদের জন্য অনেক জেহাদি মানুষ জোগাড় করে সেখানে পাঠান। খলিফা পেশওয়ারেও কাজ করেছেন সৌদি মুসলিম লীগ অফিসের প্রধানরূপে যখন আফগান জেহাদের সময় ঐ অফিস খোলা হয়।

ইত্যবসরে, বিন লাদেন সৌদি আরব থেকে আফগানিস্তানে আসা-যাওয়া করতে থাকে আর বিভিন্ন আফগান পার্টির জন্য ডোনেশান নিয়ে আসে। বিন লাদেন মডারেট ইসলামিস্ট মিলিটারি কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদকে অর্থ সাহায্য দিয়েছে। কিন্তু বিন লাদেন সখ্য গড়ে তুলেছিল উগ্র-ইসলামিস্ট হেকমতিয়ার এবং সায়াফ-এর সাথে। সায়াফ অনর্গল আরবি বলতে পারতো এবং সৌদি আরবে

পড়াশোনা করেছে। তাছাড়া সায়াফ খাঁটি ওহাবি ইসলাম-এর পাঁড় সমর্থক ছিল, যার জন্য সে বিন লাদেনের আরও প্রিয়। আরবের সাথে নিবিড় সম্পর্কের কারণে সায়াফ শত শত মিলিয়ন ডলার সৌদি সাহায্য পেয়েছে।

আফগান কমান্ডাররা আরবি সাহায্যের গুরুত্ব বুঝতে পারে। কারণ এদের অঢেল অর্থ ভাণ্ডার। ব্রিটিশ ক্যামেরাম্যান পিটার জুভেনাল সোভিয়েত-এর বিরুদ্ধে আফগানদের ধর্মযুদ্ধের সময় আফগানিস্তানে ডজন খানেক বার সফর করেন। তিনি ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে জালালুদ্দিন হাক্কানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের একটি 'বেস' (base) ভিজিট করে বর্ণনা দেন হাক্কানী এই বেসটি তৈরি করতে সিদ্ধান্ত নেন এইজন্য যে তিনি আরব ডোনারদের দেখাতে পারবেন। জুভেনাল স্মরণ করে বলেন 'আমি যখন ভিজিট করতে গেলাম, দেখলাম, আন্ডার গ্রাউন্ড বাঙ্কার। ভেতরে মনে হল যেন কোন খানদানি বাসা। দেয়ালে ওয়াল পেপার, কার্পেট, টয়লেট। বিদ্যুৎ বাতির জন্য জেনারেটর সবই আছে। যে বাঙ্কার-এ আমি গেলাম, সেখানে চারজন লোক ঘুমাচ্ছিল। এটা তৈরি করা হয়েছিল খাঁড়া উঁচু পাহাড়ের ভেতরে (ক্লিফ)। পাঁচ কিলোমিটারব্যাপী এই কমপ্লেক্সটি তৈরি। ১৯৮২ সালে আমি এই বেসের ওপর রাশিয়ানদের আক্রমণ দেখেছিলাম। মাত্র দশ মিনিটের আক্রমণ। চার কি পাঁচটা প্লেন উচ্চমান-সম্পন্ন এক্সপ্লোসিড ফেলে গেল, কিন্তু কেউ মারা যায়নি। এই বেসে-র নিজস্ব গান সংযোগ বিভাগ আছে। তারা রাশিয়ান আক্রমণের ভিডিও ছবি তুলে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দেয় চাঁদা আদায়ের জন্য। ১৯৯০-র দশকে বেসটি আল-কায়েদার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৯৮৪ সালে আজম ও বিন লাদেন দ্বারা সার্ভিস অফিস তৈরি হওয়ার পর, মুজাহিদিনদের জন্য আরব সমর্থন চাঙ্গা হয়ে উঠল। আফগান জেহাদের জন্য যেসব আরব রিক্রুট করা হত তাদের বলা হত আফগানি-আরব। তাদের মধ্যে কেউ আফগানি ছিল না, যদিও বেশিরভাগ রিক্রুট আরব, কিন্তু অন্য বিশ্ব-মুসলিম দেশ থেকে যারা আসতো তাদেরও বলা হত আফগানি-আরব। অনেকেই স্কুল ছাত্র—তারা আফগান পাকিস্তান বর্ডার ক্যাম্প পর্যন্ত থেমে থাকত, ট্রেনিং নিত। এই পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোও জেহাদি ক্যাম্প ছিল-গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প। অনেকে হাসপাতালে কাজ করতো, আবার অনেকে সাহায্যকারী হিসেবে অপারেশনে কাজ করত। অন্যরা বছর ধরে কমুনিস্টদের সাথে মরণপণ যুদ্ধ করত।

জামাল ইসমাইলের মতে তিনটি দেশ বেশিরভাগ আফগান-আরব সাপ্লাই করেছে : সৌদি আরব, ইয়েমেন ও আলজিরিয়া। সৌদি আরবের জাতীয় বিমান ৭৫% ডিসকাউন্ট দিয়েছে আফগানিস্তানে ধর্মযুদ্ধে যাওয়ার জন্য। ইসমাইলের হিসেবে, ৫০ হাজার আরব পেশওয়ারে এসেছিল যুদ্ধ করতে। বিন লাদেনের বন্ধু খালেদ আল-ফাওয়াজ আমাকে বলেছিল ২৫ হাজার হবে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯-এর মধ্যে আফগান অপারেশনে সাহায্য করতে যে সিআইএ প্রতিনিধি ছিলেন তার নাম মিল্‌ট বিয়ার্ডেন। তার মতেও আরব-আফগান সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার।

অবশ্য কত সংখ্যা ছিল ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। তবে বুদ্ধিমানের মত বলতে গেলে বলতে হয়—'Tens of thousands.'

উল্লেখযোগ্য যে, কোন একটা বছরে মোট আফগান মুজাহিদিনের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার-এর মধ্যে হবে। এই সংখ্যার অনুপাতে আফগান-আরবের সংখ্যা নগণ্য বলা যায় সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে। সত্যি বলতে কি, যুদ্ধ জয় হয়েছে প্রধানত আফগান রক্তের দ্বারা, দ্বিতীয়ত আমেরিকা ও সৌদি আরবের অর্থ ভাণ্ডার দ্বারা। যার মিলিত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ হবে মোটামুটি ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অবশ্য বিন লাদেন ও অন্য বিভিন্ন আফগান-আরব এই অর্থের সাথে কিছু যোগান দিয়েছে। মিল্‌ট বিয়ার্ডেনের হিসেবে প্রায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সৌদি উৎস থেকে এসেছে ১৯৮৬-এর পর। যুবরাজ তুর্কি আল ফয়সল সৌদ, সৌদি জেনারেল ইন্টেলিজেন্ট প্রধান সৌদি অনুদানের ব্যবস্থা করেন রিয়াদের গর্ভনর প্রিন্স সলমনের সাহায্যে। বিন লাদেন এই সময়ে প্রিন্স তুর্কির সাথে লেগে থেকে সৌদি ইন্টিলিজেন্সের ডান হাতের কাজ করেছে। উপরন্তু, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ প্রধান, মোল্লা শেখ আব্‌দ আল-আজিজ বিন বাজ ও অর্থ যোগান দিয়েছেন। (এটা বিড়ম্বনাকর যে, সৌদি সরকারের বিলিয়ন ডলার সাহায্য শেষে এক জঙ্গি ক্যাডার সৃষ্টি করে, যা ঘুরে দাঁড়ায় সৌদি রাজ পরিবারের বিরুদ্ধেই। এটা অবশ্য সৌদি সাহায্যের ধারা—যাকে বলা হয় 'রয়েলপলিটিক'-যা সৌদি পরিবারের বৈধ্যতাকে পোক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এ-সাহায্য গোড়া কেটে উপরে পানি ঢালে, কারণ এই অর্থ সাহায্য সেই উগ্রবাদীদের করা হয় যারা শেষে সৌদি রাজের বিরুদ্ধে বুমেরাং হয়)।

তবুও আফগান ধর্মযুদ্ধে আফগান-আরবরা অনেক কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তাদের অবদান যা-ই থাক, ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের যে শিক্ষা লাভ হয়েছে এই শিক্ষা তাদের নতুন পাওয়া, যে-সম্বন্ধে তাদের পূর্ব ধারণা ছিল না। প্রায় ডজন খানেক বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে জেহাদ সম্বন্ধে চূড়ান্ত ধারণা জন্মেছে তাদের। আর যাই হোক, অন্তত তাদের সামরিক শিক্ষা লাভ হয়েছে এবং সমরক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে। আফগানযুদ্ধের জন্য যারা টিকিট কিনেছিল, দেশে ফিরে, আর যাইহোক, ধর্মযোদ্ধা খেতাবটুকু পেয়েছে এবং তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, একটা সুপারশক্তিকে তারা হারাতে পেরেছে। 'ইসলামিস্ট আন্দোলনে এই আফগান জেহাদ একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে দুনিয়া জুড়ে।'—বলেছেন জঙ্গি ইসলাম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ গাইলস কেপেল (Gilles kepel)। তিনি আরও বলেছেন এই আফগান যুদ্ধ প্যালেস্টাইন সংঘাত সম্বন্ধে আরব চিন্তাধারা সরিয়ে প্রতীকরূপে দাঁড় করিয়েছে আরব জাতীয়বাদের স্থানে ইসলামীকরণ বা ইসলামীবাদ।

জাওয়াল ইসলাম বলেছেন ১৯৮৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বিন লাদেন আফগান জেহাদের জন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল। এই সময়ে আজম ঘোষণা

দেন যে বিন লাদেন ঐসব জেহাদিদের পরিবারের জন্য খায়–খরচ যোগাবে যারা আফগানযুদ্ধে যোগাদান করেছে। পাকিস্তানি–জেহাদিদের জন্য খরচ বেশি ছিল না, তাই মাসে এই খাতে প্রায় ৩০০ মার্কিন ডলার খরচ হত। তবুও এই অঙ্ক বাড়তে থাকলো। এশাম দেরাজ, চিত্র পরিচালক রূপে ১৯৮০–র দশকে বিন লাদেনকে নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেন। তার মতে, আফগান–আরবদের জন্য সৌদিদের মাসে ভর্তুকি ছিল ২৫ হাজার মার্কিন ডলার। বিন লাদেনের বন্ধু আল–ফাওয়াজ বলেন, বিন লাদেন এই সময় একটা মোবাইল ফোর্স তৈরি করার কথা চিন্তা করে। আল–ফাওয়াজ বলেন; বিন লাদেন চার–চাকা চালিত কয়েকটা পিক–আপ কিনে প্রত্যেক পিক–আপে এন্টি–ট্যাঙ্ক মিসাইল ও মাইন–ডিটেকশন যন্ত্র দ্বারা সজ্জিত করে, যাতে করে যে কোন অবস্থাকে মোকাবেলা করা যায়।

১৯৮৬ তে বিন লাদেন স্থায়ীভাবে পেশওয়ারে বসবাস শুরু করে। পেশওয়ারে এক উপ–শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এমন একটি স্থানে, দো–তলা ভিলা ভাড়া করে সেখানেই বিন লাদেন বাস করতে শুরু করে। ঠিক এই সময়ে বিন লাদেন আফগানিস্তানে 'আল–আনসার' নামে প্রথম ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। এই ক্যাম্প আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে তৈরি করা হয়। পাকতিয়া প্রদেশে জাজি নামক গ্রামের কাছে—পাকিস্তানের উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত থেকে কয়েক মাইল দূরে। জাজিতে বিন লাদেন ও তার দলবলদের আগুনের শিখার তাপ দিয়ে ব্যাপ্টাইজ করা হয়। এখানে বিন লাদেন সোভিয়েত বাহিনীর দ্বারা এক সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ থাকলেও তাকে ধরা সম্ভব হয়নি, যে ঘটনা বিন লাদেনকে ঘিরে কিংবদন্তি সৃষ্টি করেছে।

এসাম ডেরাজের বক্তব্য অনুযায়ী—১৯৮৭–এর ১৭ এপ্রিল সোভিয়েত আক্রমণ ও অবরোধ শুরু হয়। জাজিতে যে যুদ্ধ হয় ডেরাজ দু'মাইল দূর থেকে সে যুদ্ধ–দৃশ্য দেখেছিলেন। আরবরা জাজিতে যে 'বেস' (base) তৈরি করে তা সোভিয়েত ফ্রন্ট–লাইনের কাছাকাছি। এখানে ঐ গ্রামের পাহাড়ি এলাকা ঘিরে বিন লাদেনের লোকেরা যন্ত্রপাতি দিয়ে গুহাগর্ত খুঁড়ে গোপন স্থান তৈরি করেছিল। দু'শোর মত রাশিয়ান প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে সে স্থানে বোমা ফেলে তছনছ করেছিল। সেই রাশিয়ান সেনাদের মধ্যে স্পেটনাজ (Spetsnaz) ইউনিফরম পরা রাশিয়ার বিশেষ ফোর্সের সদস্য ছিল। সেই গোপন গুহায় প্রায় ৫০ জনের মত আরব ছিল। আক্রমণের কোন আলামত তারা পূর্বে না পাওয়ার কারণে সেই গোপন স্থান থেকে সরে যাবার সময় ছিল না, এই কারণে ডজন খানেকের বেশি আরব এই আক্রমণে প্রাণ হারায়। পরে বাকি আরবরা সে স্থান ত্যাগ করে।

জাজি 'বেসে'র এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরব বিশ্বে বিজয় উৎসব পালন করা হয়। এই প্রথম রাশিয়ার মত শক্তিশালী সেনাদলের মোকাবেলা করে তাদের 'বেস' রক্ষার চেষ্টা করে। আরব সাংবাদিকরা ফলাও করে এই প্রতিরোধের কাহিনী প্রকাশ করে, বিশেষ করে বিন লাদেনের ভূমিকাকে এই সংবাদে হাইলাইট করা হয়, ফলে আফগানযুদ্ধে আরব থেকে দলে দলে জেহাদি মানুষ

যোগ দিতে আসে। পুরুষ সিংহ ওসামার ভাবমূর্তি বেড়ে আকাশ ছোঁয়া হয়ে যায়; কেননা, একজন আরব মাল্টি-মিলিয়নিয়ার তার জেদ্দার প্রাসাদ ও লন্ডন এবং মন্টি কার্লোর হোটেল-সুইট ছেড়ে আফগানিস্তানে পার্বত্য গুহায় জীবনযাপন করেছে আফগান ধর্মযুদ্ধে। সৌদি রাজ পরিবারের হাজার হাজার সদস্যের জীবন ধারার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অথচ এই রাজ পরিবার ১৯৮৬ সালে ইসলামের দুটি মহা পবিত্র স্থানের 'হেফাজতকারী' বলে দাবি করেছিল।

এই 'জাজি'-র ঘটনায় আরও একজন বিখ্যাত হয়ে যান, তিনি ছিলেন মিশরীয় আবু ওবাইদা। তিনি পরে কেনিয়াতে এক ফেরি দুর্ঘটনায় ডুবে মারা যান। ১৯৯৬ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত বিন লাদেনের সামরিক নেতাদের মধ্যে আবু ওবাইদার নাম পুরোভাগেই রেখে আমেরিকান সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে।

জাজির যুদ্ধ বিপজ্জনক ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে বিন লাদেনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুখকর ছিল না। ১৯৯১ সালে বিন লাদেনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ডেরাজ লিখেছিলেন যে এই যুদ্ধের সময় বিন লাদেনের কিছু শারীরিক সমস্যা ছিল, যে কারণে তাকে মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টা ধরে বিছানায় আশ্রয় নিতে হত। তার ছিল নিম্ন রক্তচাপ যার জন্য পেশওয়ার থেকে এক মিশরীয় ডাক্তার এসে তার চিকিৎসা করতেন। তাছাড়া বিন লাদেন ছিল ডায়াবেটিক রোগী। এর জন্য প্রত্যেক দিন ইনসুলিন নিতে হত। একটি প্রকাশিত পুস্তকে এক ছবিতে তাকে ইনসুলিন ইনজেকশন দিতে দেখানো হয়েছে; অন্য একটি ছবিতে তার পায়ের একটি ক্ষতের পরিচর্যা করতে দেখা যাচ্ছে।

২০০০ সালে ডিসেম্বর মাসে আমি কায়রোতে ডেরাজের সাথে দেখা করি। তখন ডেরাজের বয়স পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগে। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি আফগান যুদ্ধাঞ্চলে গিয়েছিলেন সাংবাদিক ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার হিসেবে। নাদুস নুদুস, গোলগাল টাকমাথা মানুষ; গায়ে কালো রঙের কোট দিয়ে নীল নদের পাশে একটি হোটেলে বসে ডেরাজ কমলালেবুর রস পান করছিলেন আর তার জীবনী সম্বন্ধে এবং বিন লাদেনের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। কাহিনী শুরু করার পূর্বেই তিনি নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন যে, তিনি বিন লাদেনের পন্থা অনুমোদন করেন না এবং বিন লাদেনের সাথে তার পূর্ব ঘনিষ্ঠতার কারণে মিশরীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নাকাল হতেও হয়েছে। ডেরাজ বলেন যে বিন লাদেনের সাথে তার দেখা হয় ১৯৮৭ সালে যখন সাংবাদিক সম্বন্ধে তার এড়িয়ে যাওয়া ভাবটা কেটে যায়। এর পূর্বে বিন লাদেনের সাথে তার দেখা হয়নি। পেশওয়ারে, বিন লাদেনের সাথে ডেরাজের প্রথম সাক্ষাতে ডেরাজ বিন লাদেনকে বলেছিলেন 'একদিন' তোমরা (আফগান-আরব) সবাই জেলের ভাত খাবে। কিন্তু বিন লাদেনের কোন নড়ন-চড়ন ছিল না। সে ভেবেছিল, বিজয়ীর বেশে সে নায়কের মত দেশে ফিরে যাবে। তার ধারণায় ছিল না যে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের সব সরকারই জনপ্রিয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে, এবং এর নেতাদের ঘৃণা করে।

বিন লাদেনের রাজনীতির প্রতি ঝোঁক ছিল না। তার কাছে আফগানযুদ্ধ ছিল একটা অসাধারণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। সিএনএন-এর সাথে সাক্ষাৎকালে সে আমাদের বলেছিল 'আমি এই জেহাদ থেকে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করেছি, সে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আমি অন্য কোন অবস্থা বা ঘটনা থেকে পেতাম না...কিংবদন্তি-সম একটা বিশ্ব-শক্তিকে ধ্বংস করার যে আনন্দ তা শুধু আমার হৃদয় ও মনকে আন্দোলিত করেনি। আন্দোলিত করেছে বিশ্ব-মুসলিমের হৃদয় ও মনকে।' বিন লাদেন এই সংঘাতের মাধ্যমে যে মহান আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সন্ধান পেয়ে আবেগে আপ্লুত হল, সে আবেগের প্রভাবেই তার বারো বছরের পুত্রকে আফগানিস্তানে যুদ্ধের সময়েই ডেকে পাঠায় দেখা করার জন্য।

বিন লাদেনের মত হাজার হাজার আফগান-আরব অনুরূপভাবেই মুগ্ধ হয়েছিল। তার একটি দৃষ্টান্ত হল মক্কার এক সৌদি, মনসুর আল-বারাকাতি। বারাকাতের কাহিনী ইসলামিস্ট ওয়েব-সাইট-এ প্রচারিত হয়। আল বারাকাতি ১৯৮৭ সালে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তার জেহাদি ছোট ভাইকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তিনি যখন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বর্ডার পার হন, তখন তার 'হৃদয় ধাক্কা দেয়' এই অনুভূমিতে যে, তিনি একটি স্বর্গীয় ভুবনে প্রবেশ করলেন। ছোট ভাই-এর সন্ধান না করেই, তিনি জালালাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন, তারপর বিন লাদেনের ট্রেনিং ক্যাম্পে দুই মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি কান্দাহারে মরু প্রান্তরে হাজির হন। এখানেই দুইপক্ষের চরম সংঘর্ষ সাধিত হয়। আল-বারাকাতি এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করে সেখান আরব মুজাহিদিনদের নেতা বনে যান। ১৯৯০ সালে গ্রীষ্মের সময়, ১২০ মি. মি. রকেট একটি বাড়ির ছাদে আঘাত হানে, যেখানে আল-বারাকাত বসেছিলেন। ভীষণ রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাকে পাকিস্তানে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়। রাস্তায় যেতে যেতে আল-বারাকাত মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করে বলেন 'আমি দুনিয়াদারির জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে, আল্লাহর আশ্রয় চাই।' শেষে তিনি মারা যান। আরবে ধর্মযুদ্ধে 'শহীদ' ব্যক্তিদের কাহিনী কেচ্ছার মত এখানকার একজন সাক্ষী বলেছেন যে—আল-বারাকাতের শবদেহ থেকে এমন এক সুগন্ধি বের হতে থাকে, সে অভিজ্ঞতা তার জীবনেও কখনও ঘটেনি।'

আফগানযুদ্ধ আধ্যাত্মিকভাবে শুধু বিন লাদেনকে মন্ত্রমুগ্ধ করেনি, আরব বিশ্বের অনেক মুখ্য-সন্ত্রাসীকেও সংঘাতে লিপ্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৮৭ সালে বিন লাদেনকে মিশরীয় জেহাদি দলের সাথে পরিচিত করে। এই মিশরীয় দল প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের হত্যাকাণ্ডের পেছনে কলকাঠি নেড়েছে ১৯৮১ সালে। এই দলের এক নেতা আইমান আল-জাওহারি পেশওয়ারের বাসিন্দা হন এবং আফগান রিফিউজি হাসপাতালে তার ডাক্তারি বিদ্যা কাজে লাগান। ১৯৮৯ সালে বিন লাদেন আল-কায়েদা দল প্রতিষ্ঠা করলে, পরবর্তীতে আল-জওহারির জেহাদি দলের সাথে মিশে যান।

জামাল ইসমাইল বলেন যে, আল-কায়েদার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল গতানুগতিক। বেশিরভাগ আরব সার্ভিস অফিসের ছাত্রছায়ায় পেশওয়ার পৌঁছে, বিন লাদেনের গেস্ট হাউসের অতিথি হয়। এই বায়েত আল আনসার সকল অভ্যাগতের জন্য উন্মুক্ত থাকতো। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সব সরকারই তাদের দেশের অভ্যন্তরে এই সব ইসলামিস্ট আন্দোলনের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতো। তাই সে সব দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা-পাতিনেতারা এ ধরনের আন্দোলনে শামিল হওয়ার সুযোগ খুঁজতো। সেই সুবাদে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিস্ট আন্দোলনের মানুষরা আল-কায়েদায় স্থান করে নিয়ে আল-কায়েদাকে সুসংহত করে তোলে। ইসমাইল বলেন 'এটাই তাদের নির্দিষ্ট অতিথি ভবন ছিল। এই ভবনে ঢুকতে গেলে অন্দর মহলের অংশ হতে হবে, নইলে প্রবেশ করা যাবে না।'

সৌদি সরকার-বিরুদ্ধ সা'দ আল-ফাগিহ্ আল-কায়েদা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার আরও একটি কারণ বলে। ১৯৮৮ সালে বিন লাদেন অনুভব করেন যে, তার সংগঠনের যেসব সদস্য হারিয়ে যাচ্ছে তাদের পরিবারের কাছে সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা অতি নগণ্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিন-লাদেন আল-কায়েদা সংগঠিত করে মুজাহিদিনদের খবরা-খবর করার জন্য এবং পেশওয়ারে যারা শুধু চ্যারিটির কাজে নিযুক্ত আছে এবং যারা ভিজিটর তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য। গেস্ট হাউস এবং মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্পের মধ্যে যাতায়াতকারীদের জন্যও রেকর্ড রাখার প্রয়োজন হল। আল ফাওয়াজ বলেন এই ডকুমেন্টসগুলো পরবর্তীতে মধ্য প্রাচ্যের সরকার ব্যবহার করতে লাগলো কারা আসলে ইসলামিস্ট জঙ্গি, আর কারা নয়।

আল-কায়েদা গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে জামাল আল-ফজলের কাছ থেকে। বিন লাদেনের চারজন সহযোগীর একজন এই আল-ফজল। ২০০১ সালে এই চারজনের বিচারের সময় নিউইয়র্কে আমেরিকান সরকারের প্রথম সাক্ষ্যরূপে আল-ফজল আল-কায়েদা গঠনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে। বিশ-বাইশ বছরের সুদানিজ তরুণ আল-ফজল ১৯৮৯ সালে আফগান ফ্রন্ট লাইনে বিন লাদেনের দলে শামিল হয়ে যুদ্ধ করেছে। হেলিকপ্টার শুট করা ও বিস্ফোরক দ্রব্য বা বোমা ফাটানোর ব্যাপারে সে প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছে। ১৯৮৯ সালে তাকে আল-কায়েদার অংশ নিতে বলা হয় এবং আফগান যুদ্ধের বাইরেও তাকে পরিকল্পিত কোন আক্রমণে অংশগ্রহণের জন্য তৈরি করা হয়। যে আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ গ্রহণও করে দলের পরিকল্পিত জেহাদে অংশ নিতে এবং এই মর্মে 'আমির' বিন লাদেন-এর প্রতি আনুগত্যের ফরমে সই করে। আল-ফজল আল-কায়েদার তৃতীয় সদস্যব্যক্তি।

আল-ফজল সংগঠনের তহবিল থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার মার্কিন ডলার তসরুফ করে ধরা পড়ে এবং আল-কায়েদা ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে সে আমেরিকান সরকারের অনুচর হয়ে খবর পাচার করতে থাকে। ম্যানহাটনে বিচারের সময়, আল-ফজল আল-কায়েদার অপারেশন কাঠামো সংগঠনের বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেয় তার মধ্যে আবু রয়টার ছদ্মনামে যে লোকটি মিডিয়া অপারেশনে নিযুক্ত ছিল সে কথাও উল্লেখ করে।

১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহার করা হয় এবং বিন লাদেন তখন তার দৃষ্টি অন্য দিকে নিক্ষেপ করে।

সে জাজিতে ফিরে আসে এবং এখানেই তার 'বেস' স্থাপন করে। কারণ জাজি তার জন্য ছিল পয়মন্ত স্থান। পিটার জুভেনাল সেই সময় এই এলাকার ধারে কাছেই ছিলেন। তিনি বলেন : আমি দেখলাম এখানে বিশাল গুহা তৈরি করা হচ্ছে ক্যাটারপিলার যন্ত্রদানবের সাহায্যে এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। আমাকে বলা হল সে স্থান নিরাপদ হবে না।

বিন লাদেনের প্রথম টারগেট একটি মুসলিম দেশের নারী প্রধানের ওপর; তিনি বেনজির ভুট্টো, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। বেনজির অক্সফোর্ড পড়ুয়া উন্নত মনের মহিলা। তিনি আমেরিকার হার্ভার্ডেও পড়াশোনা করেছেন। তার পূর্বসূরি সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল জিয়া বেনজিরের নির্বাচনের এক বছর পূর্বে রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। জেনারেল জিয়া ছিলেন কট্টর মৌলবাদী গ্রুপের সাপোর্টার, তাই এই গ্রুপটার জন্য বেনজির ভুট্টো ছিলেন হুমকি স্বরূপ।

২০০০ সালে মার্চ মাসে এক কড়া শীতের দিনে ম্যানহাটনের জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজের ধারে কাছে তার নিউজার্সি বাসায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর সাথে দেখা করি। সুন্দর ক্যারিশমাটিক বয়স্ক মহিলা চল্লিশ দশকের শেষ প্রান্তে। সলমন রুশদি তার উপন্যাস 'শেম'-এ বেনজিরকে নাম দিয়েছেন 'মনিকের ভার্জিন আইরনপ্যান্টস্'। বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের মস্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাকিস্তানে সিন্ধু প্রদেশে তার দাদার বিরাট জমিদারি এলাকা। ব্রিটিশ সরকার তার দাদাকে 'স্যার' উপাধি দিয়েছিল।

বেনজির ভুট্টোর শেক্সপিয়ার সাহিত্যে ভালো পড়াশোনা ছিল। তার বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭০-র দশকে দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, যতদিন পর্যন্ত তিনি জেনারেল জিয়া কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত না হন। বেনজির ভুট্টো তার পরবর্তী জীবনে গৃহবন্দি ছিলেন কিংবা নির্বাসনে জীবনযাপন করেন, তারপর ১৯৮৮ সালে দেশে ফিরেন জনপ্রিয় নেতারূপে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তার একভাই করাচির বাইরে ভবনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। অন্য এক ভাইকে রহস্যজনকভাবে ফ্রান্সে বিষ প্রয়োগে হয়। তার স্বামীকে ১৯৯৬-এ দুর্নীতির দায়ে পাকিস্তানের জেলে আটকে রাখা হয়।

যখন আমি বেনজির ভুট্টোর সাথে দেখা করি তখন এইসব ইতিহাস আমার মাথায় কিলবিল করছিল। বেনজির দেখা দিলেন পিঙ্ক সালোয়ার কামিজ পরে, মুখের চারপাশে দোপাট্টার তুলে দেয়া ঘোমটা উড়ে উড়ে বেড়াছিল। যেহেতু বর্তমান পাকিস্তানের সামরিক সরকার তার বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ এনেছে, তাই বেনজির এখন লন্ডন-দুর্বাই-এ নির্বাসন জীবনযাপন করছেন। আর মাঝে মাঝে আমেরিকায় তার অনুসারী ও ভক্তদের সাথে দেখা করতে আসেন।

আমি যখন বেনজির ভুট্টোর সাথে কথা বলছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল তিনি তার স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় আমার সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করে বললেন,

বর্তমানে পাকিস্তানের সামরিক সরকার তার বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ জোরদার করায় তাকে এই বিদেশে বাস করতে হচ্ছে। তিনি আরো বললেন যে, তার স্বামী ও তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সাবেক সরকার রাজনৈতিক কারণে এইসব অভিযোগ এনেছে—এই বলে তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন।

আমি বিষয়টি ঘুরিয়ে বিন লাদেনের বিষয় আলোচনায় টেনে আনলাম। তিনি বললেন : ওসামার সম্বন্ধে আমি প্রথমে শুনি ১৯৮৯ সালে যখন আমার সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। চারজন পার্লামেন্টারিয়ান ব্রিফকেস ভর্তি টাকা নিয়ে আমার কাছে এলেন—সাড়ে বারো লাখ রুপি ছিল, প্রায় আশি থেকে একশো হাজার আমেরিকান ডলারের মতো। আমার বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার জন্য তাদের উৎকোচ দেয়া হয়েছিল। তারা বললেন—এই টাকা সৌদি আরব থেকে এসেছে। আমি হতবাক হলাম এই জেনে যে বাদশা ফাহদ আমাদের সমর্থক ছিলেন এবং আমার দেশকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। আমি একটি ডেলিগেশন সৌদি আরবে পাঠালাম এই জানার উদ্দেশ্যে কেন এই অর্থ দেয়া হয়েছে। তার উত্তরে জবাব পেলাম যে, একজন ধনী সৌদি ব্যক্তি এসব করছে—যার নাম ওসামা বিন লাদেন। এর পূর্বে আমি তার নাম শুনিনি।

বেনজির ভুট্টো পাকিস্তান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের প্রধান জেনারেল হামিদ গুলকে দোষারোপ করে বললেন যে তিনি একজন কট্টর মৌলবাদী ইসলামিস্ট। এই হামিদ গুলকে বিন লাদেনের সাথে এই ঘুস দেয়ার অভিযোগে বরখাস্ত করেন। তিনি আরও বললেন যে আন্তর্জাতিক ইসলামিক আন্দোলন, আফগানযুদ্ধ থেকেই উদ্ভূত এবং এরা পাকিস্তানকে মৌলবাদের ঘাঁটি তৈরি করেছে। তারা আমার পার্টিকে লিবারেল দল ভাবে এবং মৌলবাদী বিরুদ্ধ বলে বিশ্বাস করে। বেনজির ভুট্টোর সরকার ১ নভেম্বর ১৯৮৯-এ অতি অল্পের জন্য অনাস্থা প্রস্তাব এড়িয়ে যায়।

এর কয়েক সপ্তাহ পর বিন লাদেনের ডানহাত আবদুল্লাহ আজম আততায়ী দ্বারা নিহত হন, যে রহস্য এখনও ভেদ হয়নি। শুক্রবারে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য আজম পেশওয়ারে সাবা-ই-লাইল মসজিদে গেটে ঢোকার মুখে এক গাড়িতে লাগানো বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার সাথে তার দুই তরুণ পুত্র মোহাম্মদ (২৩) এবং ইব্রাহিম (১৪)-এরাও মারা পড়ে।

১৯৮৯-এর শেষের দিকে বিন লাদেনের পাকিস্তানে অবস্থান করার কোন কারণ ছিল না। পাকিস্তান সরকারের কাছে সে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ছিল। সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে গেছে এবং তার অতি ঘনিষ্ঠ জিহাদি সহযোগীও ইহজগত ছেড়ে গেছে। সুতরাং সে এই প্রথমবারের মত তার নিজের দেশে ফিরে গিয়ে অন্যভাবে জেহাদি যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

তখন বিন লাদেনের বয়স বত্রিশ বছর।

অধ্যায়—তিন

প্রত্যাঘাত : সিআইএ এবং আফগান যুদ্ধ

(Blowback : The CIA and the Afghan War)

'Never think that those who were slain in the cause of God are dead. They are alive and well provided for by the Lord.'

The Koran, 3:169

বিন লাদেন ও আফগান-আরবদের কি ইউএস সরকার তৈরি করেছে ? বিভিন্ন পুস্তকে এবং অসংখ্য সংবাদপত্রে এ ধরনের অভিযোগ করা হয়েছে যে সিআইএ অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে আফগান-আরবদের—এমন কি বিন লাদেনও অনুরূপ সাহায্য পেয়েছে ১৯৮০-র দশকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এইজন্য তারা যুক্তি দেখায় যে আমেরিকা এই সব জেহাদি-যুদ্ধে ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মদদ জুগিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ঐ সমস্ত অভিযোগ বানোয়াট এবং তথ্য-নির্ভর নয়। যাই হোক, সিআইএ নিশ্চয়ই কিছু কৌশলগত ভুল-ভ্রান্তি আফগান যুদ্ধের সময় করে থাকবে। যার জন্য পশ্চিমা-বিরোধী কিছু আরব-জঙ্গি এর কারণে উৎসাহিত হয়ে ফলাও করে প্রচারে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে, সোভিয়েতের আফগানিস্তান আগ্রাসন ও আক্রমণ আমেরিকার জন্য একটু ঢিল মারার সুযোগ করে দিল। উত্তর ভিয়েতনামে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যেমন সোভিয়েত অর্থ সাহায্য করেছিল, তেমনি আমেরিকাও আফগানদের টাকা-পয়সা সাহায্য করে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তাতিয়ে দিল। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, জিগনিউ ব্রেজজিনস্কি (Zbigniew Brzezinski) সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন : এই সুযোগে, ব্যাটাদের পেছনে গাঁজার চারা বুনে দেওয়া ভালো (it was time to finally sow shit in their backward)। তাই, সিআইএ এগিয়ে গেল আফগানদের অস্ত্র সাহায্য করতে এবং কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভালো

ফল পাওয়া গেল না। সোভিয়েতের শেষ বাহিনী আফগানিস্তান পরিত্যাগ করলো ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।

ভার্জিনিয়ায় সিআইএ হেড কোয়ার্টার ল্যাংলিতে একটা ছোটখাটো পার্টি জমিয়ে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা ফোটানো হল।

কিন্তু সিআইএ ও আফগান–আরবরা কি এক জোট বেঁধে (in cahoots) সোভিয়েতদের খেদিয়েছিল, যেমন অধুনা আলেচিত হয় ? একজন গ্রন্থকার অভিযোগ করেন সিআইএ এই আফগান যুদ্ধে আফগান–আরবদের অর্থ জুগিয়েছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আর একজন বলেন সিআইএ মুসলিম ভাড়াটে জেহাদি যোগান দিয়েছিল এই আফগানিস্তানে যুদ্ধে যার মধ্যে ২ হাজার আলজিরিয়ান ছিল। উভয় গ্রন্থকার এই দাবি করেছিলেন কথার কথা হিসেবে, কিন্তু কোন সত্য বা বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস বা প্রমাণ দেননি।

অন্য ভাষ্যকাররা বলেছেন বিন লাদেন নিজেই সিআইএ'র দ্বারা সাহায্যপুষ্ট। একটি নামিদামি ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান'–এর এক রিপোর্টে বলা হয় ১৯৮৬ সালে সিআইএ বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে খোশ্‌তে (Khost) ভূগর্ভাস্ত ক্যাম্প তৈরি করতে সাহায্য করে। এই ভূগর্ভস্থিত ক্যাম্পে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিপ্লবী কর্মীদের জেহাদি যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই বক্তব্য সাধারণ জ্ঞান বিবর্জিত, কারণ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে যুদ্ধের সময় কোন আমেরিকান কর্মকর্তা যেতে সাহসী হয়নি পাছে রাশিয়ান সেনাদের হাতে ধরা পড়ে কম্যুনিস্ট প্রপাগান্ডার বিজয় প্রচারে সাহায্যের সামগ্রী হতে। ইত্যবসরে বিন লাদেন ১৯৮২ সালের পর থেকেই আমেরিকা–বিরোধী হয়ে ওঠে কারণ তার অর্থের অভাব ছিল না, তার পরিবারের বিশাল নির্মাণ কোম্পানি সিআইএ'র অর্থ সাহায্যের থোড়াই পরোয়া করত। আসল কথা হল, খোশ্‌তের ভূগর্ভস্থিত ক্যাম্প তৈরি হয়েছিল ১৯৮২ সালে এক আফগান কমান্ডারের দ্বারা, অর্থ জুগিয়েছিল আরব দেশ।

বিন লাদেনের সাথে এক ঘনিষ্ঠ মহলের বরাত দিয়ে বলা হয় যে, বিন লাদেনের কোন কালে আমেরিকা বা আমেরিকান কর্মকর্তার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না...১৯৮০–এর দশকের প্রথম দিকে তিনি বলেছিলেন যে বিন লাদেনের পরবর্তী যুদ্ধ হবে আমেরিকার সাথে...। আমেরিকা থেকে বিন লাদেনের কাছে কোন ধরনের সাহায্য বা প্রশিক্ষণের সম্পদ ছিল না। একজন সিনিয়র ইউএস কর্মকর্তা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন যে বিন লাদেন কখনও সিআইএ'র সাথে দেখা করেনি।

আফগান–আরবদের উথানের জন্য সিআইএ'র বিরুদ্ধে অভিযোগ ও দায়িত্ববোধের ভার চাপানো হয়েছে তা ভালো কাহিনী হতে পারে, তবে ভালো ইতিহাস নয়। সত্য ঘটনা বেশ ঘোরালো ও পেঁচালো। আমেরিকা অস্বীকার করতে চেয়েছিল যে সিআইএ আফগান যুদ্ধে অর্থ যোগান দিয়েছে পাকিস্তানের ইন্টার

সার্ভিসেস্‌ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (আইএসআই)। পাকিস্তানের আইএসআই সবকিছুই করেছে—সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে আফগানিপন্থীদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেয়া–সবকিছুই। আর এ ব্যাপারে বেশি উৎসাহী ছিল কট্টর মৌলবাদী ও পাকিস্তান–পন্থীরা। আফগান–আরবরা সাধারণত ঐসব পাকিস্তান ও আফগান–পন্থীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে। আমেরিকা এই সূত্রে পাকিস্তান সরকারকে সবদিক দিয়ে মদদ যোগানোর কারণে দোষটা চেপে ছিল সিআইএ'র ঘাড়েই; এই কারণেই অভিযোগ উঠেছে যে বিন লাদেন ও তার অনুসারী এবং আফগান–আরব ও জেহাদিরা সিআইএ'র সৃষ্ট জীব। ব্যাপারটা ঘোরালো ও প্যাঁচালো এই কারণে যে আমেরিকা বা সিআইএ তাদের অবস্থানটা ভালো করে বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার করতে পারে নি, মাঝখান থেকে সিআইএ'র ঘাড়ে বন্দুক রেখে আইএসআই কারবারটি সুসম্পন্ন করেছে।

১৯৮০–এর দশকে সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা, যিনি আফগান অপারেশন দেখাশোনা করতেন, বলেন 'সিআইএ আরবদের রিক্রুট করেনি'। তার দরকারও ছিল না। কারণ হাজার হাজার আফগান যুদ্ধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং যে সব আরব জেহাদ করার জন্য এসেছিল তারা গোলযোগ করেছে এবং আফগানরা মনে করেছে এই আরবরা মাথাব্যথার কারণ (They were pain in the ass)। আমি নিজেই এ ধরনের উক্তি আফগানদের কাছ থেকে শুনেছি, তারা গাল্‌ফ থেকে পাঠানো অর্থকে স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু আরবদের অতিমাত্রার ইসলামীভাব দেখানো এবং ধর্ম সম্বন্ধে সবক শেখানোর মুরুব্বিয়ানাকে পছন্দ করত না। পিটার জুভেনাল বলেন : আফগান ও আরবদের মধ্যে বেশ একটা সদ্ভাব ছিল না। একজন আফগান আমাকে বলেছিল 'যখনই তাদের মধ্যে একজনের সাথে আমাদের সমস্যা হত আমরা গুলি করে দিতাম। তারা তাদেরকে বাদশা ভাবতো।'

তাছাড়া আফগান–আরবরা পশ্চিমাদের অচ্ছুত মনে করতো; নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতো। জুভেনাল বলেন 'আমি সব সময়েই আফগানিস্তানে আরবদের ছায়া এড়িয়ে দূরে দূরে থাকতাম। তারা অতিমাত্রায় উগ্র ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করতো—'তোমরা এই ইসলামী দেশে কী করতে এসেছো ?' বিবিসি–র রিপোর্টার জন সিম্পসন ১৯৮৯–এ জালালাবাদের বাইরে বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। আফগান মুজাহিদিনের একটি দলের সাথে যাত্রাকালে, সিম্পসন ও তার টেলিভিশন ক্রুম্যানদের নিখুঁত সাদা জোব্বা পরিহিত এক সুসজ্জিত আরবের সাথে আচমকা ধাক্কা লেগে যায়। ক্ষিপ্ত হয়ে সেই আরব চিৎকার করে সিম্পসনের আফগান গাইডকে বলে—'এই বিধর্মীদের মেরে ফেলো' এবং তারপর ট্রাক চালককে পাঁচশো আমেরিকান ডলার দিয়ে কাজ শেষ করতে আদেশ দেয়। সিম্পসনের আফগান গাইড সে অনুরোধ উপেক্ষা করে, পরে বিন লাদেনকে হতাশ অবস্থায় তার বিছানায় কাঁদতে দেখা যায়। প্রায় দশ বছর পর

বিন লাদেন যখন জনসম্মুখে পরিচিতি লাভ করলো, তখনই সিম্পসন বুঝতে পারেন সেই রহস্যজনক আরব ব্যক্তিটি কে ছিলেন, যে তার (সিম্পসন) মৃত্যু চেয়েছিলেন।

১৯৯৮ সালে মিল্ট বিয়ারডেন 'ব্যাক তিউলিপ' নামে একটি রোমাঞ্চকর গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে সিআইএ'র একজন শীর্ষ কর্মকর্তা আফগানিস্তানে একটি 'বেস' তৈর করেন যেখানে মাত্র কয়েকজন আমেরিকান কর্মকর্তা বাস করতেন। অবশ্য এটা সর্বৈব ফ্যান্টাসী কল্পনা-বিলাস মাত্র। সিআইএ'র কোন কর্মকর্তা আফগানিস্তানে ভ্রমণ করেনি। এটা সত্য যে, সিআইএ'র কিছু আফগানের সাথে সম্পর্ক ছিল। ভিন্স ক্যানিসট্র্যারো (Vince Cannistraro) ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ইন্টার-এজেন্সি গ্রুপের স্টাফ-পরিচালক ছিলেন তিনিই ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে আফগান-নীতি সমন্বয় করতেন। ক্যানিসট্র্যারো বলেন যে পাকিস্তানে মাত্র ছয়জন সিআইএ কর্মকর্তা থাকতেন এবং তারা শুধুমাত্র 'প্রশাসক' ছিলেন—যারা এজিন্সি অপারেশনের কারবার দেখাশোনা করতেন।

এছাড়া, আর একজন সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে, সিআইএ'র কর্মকর্তারা ইসলামাবাদের (পাকিস্তান) আমেরিকান এম্বেসি ছেড়ে কদাচিত বাইরে নিয়ে আফগান যুদ্ধের নেতা বা কোন আরব জঙ্গির সাথে দেখা করত। তিনি আরো বলেন যে ১৯৮০-এর মধ্যভাগে যখন ইউএস কর্মকর্তাদের আফগান নেতাদের সাথে পেশওয়ারে কোন মিটিং হলে সে মিটিং-এ সিআইএ কর্মকর্তার হাজির হওয়া নিয়ে রীতিমত প্রার্থনা করতে হত। এমনি যোগ দেয়া যেত না।

১৯৮৩ ও '৮৭-এর মধ্যে আইএসআই-এর ব্রিগেডিয়ার আফগান অপারেশনের কাজ দেখাশোনা করতেন। তিনি পরিষ্কার করে আফগান মুজাহিদিন ও সিআইএ'র সম্পর্ক ব্যখ্যা করেন। তিনি বলেন সিআইএ'র প্রধান কাজ ছিল অর্থ ব্যয় করা আফগান যুদ্ধের ব্যাপারে। তার ভাষায় আমেরিকানরা বাঁশিতে ফুঁ দিলেও কোন তান বা সুর উঠতো না। শুধু পোঁ-পোঁ করতো। সিআইএ মুজাহিদিনদের জন্য বছরের পর বছর বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে যুদ্ধ সরঞ্জাম খরিদ করার জন্য। তারা শুধু গোপনভাবে অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিতে ব্যস্ত থাকতো। পাকিস্তান সরকারের নীতি ছিল যে, সিআইএ অর্থ ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে আসবে, যোগান দেবে, কিন্তু বিতরণের দায়িত্বে তাদের কোন হাত থাকবে না। কোন আমেরিকান মুজাহিদিনদের প্রশিক্ষণ দেয়া বা সরাসরি সংযোগ করার সুযোগ পাবে না এবং কোন আমেরিকান আফগানিস্তানের মধ্যে প্রবেশও করবে না। সবকিছুই হবে পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে। [তাহলে অনুমান করুন, সিআইএ'র সংগৃহীত অর্থ ও যুদ্ধ সম্ভারের কতটুকু পরিমাণ আফগানিস্তানে বিতরণ হত। আর কতটুকু পাকিস্তানের গুদামে ও ট্রেজারিতে রয়ে যেত, তার

হিসাব কেউ জানে না। এক সাবেক সিআইএ আমাকে বলেছিল—'As quartermasters we were okay'–আমরা কোয়ার্টার-মাস্টারের দায়িত্বটুকু পালন করেছি মাত্র।

সংক্ষেপে বলতে হয়, সিআইএ'র সম্পর্কটা আফগানদের সাথে ছিল খুবই সীমিত, আফগান–আরবদের সাথে তো কথা–ই নেই এবং তার কারণও স্পষ্ট। আফগান–আরবদের সাথে কোন সম্পর্ক থাকার কথাই ওঠে না। সিআইএ কাজ করেছে পাকিস্তানের আইএসআই–এর মাধ্যমে অর্থাৎ সিআইএ ও আফগানদের মাঝে দালালি করেছে পাকিস্তানের আইএসআই। আর আফগান–আরবরা স্বাধীনভাবে কাজ করেছে তাদের নিজের অর্থের উৎস থেকে। সিআইএ ও আফগান–আরবদের একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল ছিল না এবং সম্পর্কও রাখতো না। সুতরাং সিআইএ আফগান–আরবদের অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করেছে—এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক ও ভিত্তিহীন। সুতরাং 'যা কিছু হারায়...কেষ্টা বেটাই চোর—এ ধরনের অপবাদ সিআইএ'র ওপর, যেমন একদিকে শুভ, অন্য দিকে অশুভও।

যাই হোক, এক অদ্ভুত বা কাকতালীয় যোগাযোগে সিআইএ আফগান–আরবদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিয়োগে সাহায্য করেছিল—তিনি হলেন মিশরীয় মোল্লা শেখ ওমর আবদেল রহমান। এই মোল্লা ওমরকে পরবর্তীতে 'কনভিক্ট' করা হয়েছিল নিউইয়র্ক সিটি বিল্ডিং–এ ও হল্যান্ড টানেলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনায় মুখ্য ভূমিকা রাখার জন্য। তা সত্ত্বেও মোল্লা ওমরকে মিশরের মৌলবাদী সন্ত্রাসী দলের আধ্যাত্মিক নেতারূপে আমেরিকা ভ্রমণের ভিসা দেয়া হয়েছিল ১৯৮৭ এবং ১৯৯০ সালে। দেয়া হয়েছিল মাল্টিপ্‌ল–এন্ট্রি ভিসা। ইউএস সরকার সাফাই গেয়েছিল এই বলে যে ঐসব ভিসা দেয়া হয়েছিল কম্পিউটারের ভুলের জন্য অথবা মোল্লা শেখ ওমরের নামের নানা ধরনের বানান সমস্যা নিয়েও ভিসা ইস্যু হতে পারে। কিন্তু অন্তত একটি ভিসা ইস্যু করেছিল একজন সিআইএ অফিসার যে সুদানের আমেরিকান এম্বেসির কনসুলার সেকশনে নাম ভাড়িয়ে কাজ করেছে। এই ভিসা ইস্যু ব্যাপারটা দাপ্তরিক ভুল না অন্য কিছু সে সম্বন্ধে এখনো প্রশ্ন রয়ে গেছে।

সিআইএ ও আফগান–আরবের মধ্যে আরো একটি যোগসূত্র হল, একজন মিশরীয় আমেরিকান, আলী মোহাম্মদ। এই আলী মোহাম্মদ কিছুদিন সিআইএ'র সংবাদ সরবরাহকারী ছিল ১৯৮০–এর গোড়া দিকে এবং পরে আল–কায়েদার খয়ের খাঁ হয়ে যায়। যাইহোক, এইসব যোগাযোগ পাঠাকদের জন্য বেশ মনোরঞ্জক এবং ঐ পর্যন্তই। এছাড়া, আফগান–আরবদের সিআইএ কর্তৃক প্রশিক্ষণ দেয়া বা অর্থ যোগান দেয়ার সত্যতাকে পোক্ত করার মত আর কোন তথ্য নেই বলে ধরা হয়।

এটা অবশ্য বলা ঠিক হবে না যে সিআইএ আফগান যুদ্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ভুল করেনি পাকিস্তানিদের আফগানদের ব্যাপারে লাগাম ছাড়া সিদ্ধান্ত

নেয়া ও অর্থ ব্যয় করার অনুমতি প্রদান করতে। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় পাকিস্তানিদের এ দায়িত্ব পালন করতে দেয়ার পক্ষে একটা যুক্তি ছিল—প্রথম কারণ, সে ক্ষেত্রে আমেরিকা এই যুদ্ধে তাদের সম্পৃক্ত হওয়ার ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারতো, তাছাড়া এ ব্যাপারে পাকিস্তানিরা অন্ধি–সন্ধি যা জানতো অন্যের পক্ষে জানার সম্ভবনা ছিল না। ১৯৮৫ সালের মধ্যে, যাইহোক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান খোলাখুলিভাবে আফগান সামরিক নেতাদের ও কমান্ডারদের সাথে মিটিং শুরু করলেন, তখন আর 'অস্বীকার' করার রাস্তা থাকলো না। এছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে আমেরিকানদের হাতে যে সমস্ত সংবাদ–সম্পদ হাতে এসেছিল তাতে তাদের সম্যক ধারণা জন্মে যায়, কোন নেতা বা কমান্ডার কাজের মানুষ আর কে আমেরিকা–বিরোধী। এই অবস্থাতে ইউএস সরকার ও সিআইএ'র উচিত ছিল পাকিস্তানিদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা এবং খবরদারি করা বিশেষ করে ঐ সমস্ত বিষয়ে কিভাবে আমেরিকার অর্থ ও যুদ্ধ–সম্ভার বিতরিত হচ্ছে আফগান যুদ্ধে এবং এই বিতরণ পদ্ধতি আমেরিকার স্বার্থের বাইরে বা বিরুদ্ধে কিনা। এটা না করাতে পাকিস্তানের আইএসআই লাগাম ছাড়া কাজ করে গেছে এবং আমেরিকা বুঝতে পারেনি সে কাজ তাদের স্বার্থে না বিরুদ্ধে হয়েছে কিনা!

এটা কখনো মনিটর করা হয়নি। তাই পাকিস্তানিরা ঐসব অর্থ ও অস্ত্র–শস্ত্র অসমভাবে বিতরণ করেছে এবং বেশিরভাগ অর্থাৎ সিংহভাগ গিয়ে পড়েছে মৌলবাদী গ্রুপের হাতে। ফলে রাশিয়ানদের খেদানোর পর আফগানিস্তানে ক্ষমতা নিয়ে শুরু হয়েছে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। পাকিস্তানিরা এছাড়া মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার যোগান দিয়েছে ঐসব আফগানদের যারা পশ্চিমা–বিরোধী ছিল। এই অর্থ সাহায্য করেছে ইসলামী জঙ্গিদের প্রশিক্ষিত করতে—যারা পরবর্তীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সারা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী ও ধর্মযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে, এতে আমেরিকাও বাদ পড়েনি। আমেরিকার দেয়া প্রভূত অর্থ ও অস্ত্র–সাহায্য তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে সন্ত্রাসীদের দ্বারা। আমেরিকার এই অনিচ্ছাকৃত কর্মের ফলাফল বুমেরাং হয়ে তাদেরকেই আঘাত করেছে—যাকে 'Blowback' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

এই 'Blowback' কেমন করে হল তাকে বুঝবার আগে বুঝতে হবে ইউএস সরকার কেমন করে আফগান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত আক্রমণের ছয় মাস পূর্বে, আমেরিকা সীমিত পরিমাণে সমর্থন ও অর্থ সাহায্য যোগাতো সোভিয়েত তাঁবেদার প্রেসিডেন্ট নূর মোহাম্মদ তারাকির বিরুদ্ধে আফগানদের যুদ্ধ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ১৯৭৯–এর ৩ জুলাই–এ প্রেসিডেন্ট কার্টার একটি 'প্রেসিডেন্টশিয়াল ফাইডিং'–এ সই করেন এন্টি কম্যুনিস্ট গেরিলাদের অর্থ সাহায্য করার জন্য। ১৯৭৯ সালে ক্রিস্টমাসের পর রাশিয়া আফগানিস্তান আক্রমণ করে হাফিজুল্লাহ আমিনকে যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বসিয়ে এক পুতুল–সরকার প্রতিষ্ঠা করে, তখন কার্টার প্রশাসনের 'জলছবি' (Water shed) প্রতিফলিত হয় সোভিয়েতের প্রতি। এ ভাষ্যের অধিকারী ছিলেন রবার্ট গেট্স,

যিনি পরবর্তীতে সিআইএ প্রধানের পদে জাঁকিয়ে বসেন। কার্টারের মতে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি স্বরূপ। 'এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সম্প্রসারণ।'

কার্টার প্রশাসন তড়িঘড়ি করে মুজাহিদিনদের সমর্থনে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে শুরু করে। সবচেয়ে বড় প্ল্যান ছিল—'সবই করবো, কিন্তু স্বীকার যাবো না।' সিআইএ তখন সৌদি ও আমেরিকান তহবিল দিয়ে চায়না ও মিশর থেকে যুদ্ধ-সম্ভার ক্রয় করতে শুরু করে, যাতে আমেরিকা 'ধোয়া তুলসি পাতা' হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পবিত্র রয়ে যায়। আর সোভিয়েত যে আমেরিকার সম্পৃক্ততার কথা প্রচার করতে শুরু করে, সেদিকে কেউ গা করল না।

আফগানিস্তানের চারপাশে যেসব দেশ আছে সে দেশের সরকার ক্বচিৎ আমেরিকার স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল। যেমন, খোমেনির ইরান, ইউএসএস-আর ও চায়না। একমাত্র সম্ভাব্য রাস্তা ছিল পাকিস্তান, এই আফগানি বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য। সুতরাং সিআইএ'র অপারেশন সম্ভব একমাত্র পাকিস্তানের আইএসআই-এর মাধ্যমে-যাকে বিজলিবাতির 'কাট আউট' হিসেবে আমেরিকা ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকার অর্থ সাহায্য শুরু হল ১৯৮০ সাল থেকে এবং মোটামুটি বিশ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩০ মিলিয়ন পর্যন্ত; পরে এই অঙ্ক বেড়ে ১৯৮৭ সালের ভেতরে হয়েছে বাৎসরিক ৬৩০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলারে। ১৯৮০-র দশকের মধ্যে আফগান প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পাকস্তানে আইএসআই-এর হাতে তিন বিলিয়ন অর্থ শুধু তুলে দিল না, সিআইএ, এই বিশাল অঙ্কের বিতরণের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও তুলে দিল পাকিস্তানের আইএসআই-এর হাতে। পরবর্তীতে এই মারাত্মক ভুলটা বিষধর সর্পরূপে আমেরিকার বিরুদ্ধে কুলোপনা চক্র তুলে দাঁড়িয়ে গেল। একটা খসড়া হিসেবে প্রমাণ পেল যে ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কট্টর মৌলবাদী দল হিজব পার্টির হাতে চলে গেছে, যার ধর্মান্ধ নেতা গুলবুদ্দিন হিকমতিরার। হিজব পার্টি সাতটি দল নিয়ে গঠিত যাদের বেশিভাগ নেতা ধর্মান্ধ ইসলামিস্ট। এদের মধ্যে কিছু মডারেট পার্টিও ছিল, যারা আফগান রাজ পরিবারের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে। হিকমতিয়ারের পার্টি আফগানিস্তানে কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ জয় করেনি, তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিম জঙ্গিদের নাশকতামূলক কাজে প্রশিক্ষণ দিত, অন্যান্য মুজাহিদিন দলের কমান্ডার ও নেতাদের গুপ্তহত্যা করত, পশ্চিমা দেশের অমুসলিম জনসাধারণের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উৎসাহী করে তুলতো ধর্মের নামে। আমেরিকার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সাহায্য ছাড়া হিকমতিয়ার সৌদি অর্থ সাহায্যের সিংহভাগও লাভ করত।

আমেরিকা কেন হিকমতিয়ারকে এই অপরিমিত অর্থ সাহায্য করেছিল তার কারণ অন্বেষণ করার জন্য আমি গ্রাহাম ফুলারের কাছে উপস্থিত হই। গ্রাহাম

ফুলার ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত কাবুলে সিআইএ প্রধান ছিলেন এবং পরে সিআইএ'র সুদূরবিস্তৃত পূর্বাভাস প্রদানের উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত হন। ফুলার অন্যান্য ভাষা ছাড়া চাইনিজ, তার্কিশ, রাশিয়ান ও আরবি ভাষা বলতে পারতেন। তার বাসা লতা–পাতা–গুল্ম দ্বারা বেষ্টিত, সিআইএ'র প্রধান কার্যালয়ের কাছাকাছি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে তার মাপা ও পরিমিত ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন কয়েক বছর ধরে আফগানিস্তানে পশ্চিমা দেশের বিরুদ্ধে জেহাদি আন্দোলনের কোন আভাস ছিল না, ছিল শুধু স্পষ্ট সোভিয়েতের বিরুদ্ধে মুজাহিদিনদের আক্রোশ। টাকা–পয়সা সবই পাকিস্তানি পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে চালান হতো। মুজাহিদিন রাজনীতিতে তারা ছিল ওস্তাদ। ওয়াশিংটন পাগল হয়ে যেত যদি তারা মুজাহিদিনদের সাথে সলুক করতে চেষ্টা করতো। ১৯৮৪ সালের মধ্যে এটা পরিষ্কার হল যে মুজাহিদিনদের কয়েকটা দল আদর্শগতভাবে ধর্মান্ধ। হিকমতিয়ার ছিল সর্ব সেরা। অনেকে প্রশ্ন তুললো ব্যাটা বোধ হয় সোভিয়েত এজেন্ট। সে সোভিয়েত সেনা ছেড়ে বেশি সময় কাটাতো নিজের দলের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের হত্যা করে। একটা রাম–পাঁঠা বলতে গেলে। ষাট দশকের শেষের দিকে সে ছিল পাকিস্তানি এজেন্ট এবং পাকিস্তান তাকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো। পাকিস্তান মনে করতো সে বড় কাজের লোক এবং তাদেরই লোক।

আফগানিস্তান যুদ্ধের নির্ভরযোগ্য বিবরণ থেকে জানা যায় যে হিকমতিয়ার ক্ষমতা পাগল মানুষ এবং পাকিস্তানের সৃষ্ট জীব। জীব অর্থে জানোয়ার বলা যায়। সে ঐ আফগানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল যারা আফগান পাকিস্তান বর্ডারে পাঠান গোত্র বলে পরিচিত। ঐতিহাসিক হেনরি ব্র্যাডশের অভিযোগ করেছেন তার (হিকমতিয়ার) পার্টি ছিল লেনিনবাদী যেমন স্বৈরাচারী প্রকৃতির তেমনি ছিল ক্ষমতা লাভ করার জন্য নৃশংস। ব্র্যাডশের পাকিস্তানের স্বৈরাচারী জেনারেল জিয়ার সাথে হিকমতিয়ারের তুলনা করে বলেছেন : পাকিস্তানই তাকে আফগান নেতা তৈরি করেছে এবং পাকিস্তানই তাকে ধ্বংস করতে পারে যদি সে দুর্ব্যবহার করে। যুদ্ধ সম্বন্ধে আর এক পণ্ডিত ব্যক্তি লিখেছেন যে, হিকমতিয়ার কাবুল সরকার ও সোভিয়েত প্রতিরোধের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ইসলামিক বিপ্লবকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তার জঙ্গিরা অন্য পার্টির সাথে সম্মুখযুদ্ধ করেছে কারণ তার গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত গন্তব্য স্থান ছিল অন্যান্য ইসলামী বা জিহাদি দলের শীর্ষে নিজের হিজব দলকে তুলে ধরা।

কার্ট লোহবেক (Kurt Lohbeck) যিনি সিবিএস সংবাদের জন্য যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহে লিপ্ত ছিলেন এবং পেশওয়ারে (বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে একজন) স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন—তিনি হিকমতিয়ার সম্বন্ধে আমেরিকান ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ইউএস এম্বেসি আফগান বাহিনীর ওপর 'স্পিন' চাপিয়েছিল। ভেবেছিল

গুলবুদ্ধিন–'স্পিন' দিয়ে 'রানের' গতি ঠেকাবে। কিন্তু তা হয়নি। গুলবুদ্দিনের কোন কার্যকরী সংগ্রামী দল ছিল না। তার প্রতি 'স্পিনে' ছক্কা হয়ে গেল। কমান্ডার হিসেবে তার কোন সামরিক সুনাম ছিল না। ফলে, মুজাহিদিদের 'ইনিংস্ ডিফিট' হল ১৯৮৯ সালে জালালাবাদ–এর অবরোধের সাথে।

হিকমতিয়ার যত না রাশিয়ান মেরেছে, তারচেয়ে বেশি মেরেছে আফগান, নিজেদের দেশের লোক। অস্ট্রেলিয়ান–আমেরিকান সাংবাদিক রিচার্ড মেকেঞ্জি মাস খানেক আফগানিস্তানের মধ্যে কাটিয়েছেন। তিনিই প্রথম রিপোর্ট করেন যে হিকমতিয়ার উত্তর–পূর্ব আফগানিস্তানে আহমদ শাহ মাসুদের ৩৬ জন যোদ্ধাকে হত্যা করেছে ১৯৮৯ সালে জুলাই মাসে। এই গণহত্যা মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক ফলাও করে প্রচার করা হয়। ১৯৯০ সালের মধ্যে স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি রিপোর্টে হিকমতিয়ারকে একক ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করা হয় তার দেশীয় মানুষ আফগানদের হত্যা করার জন্য। ১৯৯২ থেকে আজ পর্যন্ত হিকমতিয়ার কাবুলে হাজার হাজার সিভিলিয়ান হত্যা করেছে প্রতিদিন রকেট আক্রমণ করে, মুজাহিদিন কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ পাওয়া সত্ত্বেও।

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হিকমতিয়ারের পাশবিক স্বভাবের দুর্নাম ও আমেরিকা–বিরুদ্ধ স্বভাব চাপা থাকেনি। ঐতিহাসিক ডেভিড ইস্‌বি (David Isby) বলেন ১৯৮১–এর প্রথম দিকে অন্য দলীয় আফগান নেতারা ওয়াশিংটনে এসে গুলবুদ্ধিনের স্বদেশবাসী হত্যা করার কাহিনী ব্যক্তি করেছে। এই কাহিনী তারা সরকারি কর্মকর্তাদের, কংগ্রেস সদস্যদের এবং অন্যান্যদের কাছে বলেছিল। ১৯৮৫ সালে আফগানিস্তানের জন্য গঠিত কংগ্রেসানাল টাস্ক ফোর্স শুনেছিল যে আফগান পার্টিদের মধ্যে হিকমতিয়ারের দল ছিল অত্যন্ত দূর্নীতিবাজ পার্টি। ঐ সালে (১৯৮৫) হিকমতিয়ার আমেরিকা ভিজিট করে এবং প্রেসিডেন্ট রেগানের সাথে সাক্ষাৎ করতে সরাসরি অস্বীকার করে দেয়। সাদ্দাম হোসেন ও মুয়াম্মর গাদ্দাফি উভয়েই হিকমতিয়ারকে অর্থ সাহায্য করে এবং হিকমতিয়ার গাল্‌ফ যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন যোগায়।

হিকমতিয়ার বিন লাদেনের একপ্রকার বন্ধুরূপে কাজ করেছে। ইসলামী বিশ্ব থেকে আগত জঙ্গি মৌলবাদীদের বিন লাদেনের সহযোগে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষিত প্যালেস্টাইনি মুজাহিদ আবু মাহাজ ১৯৯৩ সালে সিএনএন–কে বলেছিল আমরা সন্ত্রাসী, হ্যাঁ আমরা সন্ত্রাসী কারণ এই–ই আমাদের বিশ্বাস। কোরানের আয়াত শোন 'তোমাদের হাতের কাছে যে অস্ত্র ও ঘোড়া পাও তা নিয়ে তৈরি থাকবে এবং আল্লাহর শত্রুকে হুমকি দিয়ে, আতঙ্কিত করে তুলবে।' আবু মাহাজ দাবি করে যে মুসলিম হৃত ভূমি, স্পেনসহ, মুসলিমদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

বিন লাদেন ও হিকমতিয়ার একযোগে কাজ করেছে। ১৯৯০–এর প্রথম দিকে পূর্বাঞ্চলীয় খোস্তে আল–কায়েদার ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোর এলাকা

হিকমতিয়ারের পার্টির নিয়ন্ত্রণে ছিল। হিকমতিয়ার যে সব টিপিক্যাল আরব রিক্রুট করেছিল তার মধ্যে তিনজন ১৯৯৩ সালে কাবুল টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছিল। তারা বলেছিল যে, তারা ১৯৯১-এর প্রথম দিকে পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে এবং পূর্ব আফগানিস্তানে হিকমতিয়ারের 'বেস'-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

১৯৯৩ সালে কাবুলের দক্ষিণে তার প্রধান কার্যালয়ে আহূত এক প্রেস কনফারেন্সে আমি উপস্থিত ছিলাম। (একজন আফগান সাংবাদিক এই কনফারেন্সের বিবরণ বিবিসিতে অসম্পূর্ণভাবে বিবৃত করায় হিকমতিয়ারের মানুষ তাকে পরে হত্যা করেছিল)।

প্রেস কনফারেন্সে হিকমতিয়ার কালো পাগড়ি এবং সাদা সালোয়ার কামিজে নিখুঁতভাবে সজ্জিত হয়ে হাজির হয়। সাদা সালোয়ার-কামিজের সাথে তার মিশ কালো দাড়ির রং বিসদৃশ্য ঠেকছিল। তার গ্রুপে কোন আরব ভলেন্টিয়ার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে সে ডাহা মিথ্যা বলে গেল : কোন বিদেশীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আমাদের ট্রেনিং সেন্টার নেই এবং আমরা অন্যের কারণে কোন সমস্যা তৈরি করতে আগ্রহী নই।

হিকমতিয়ারের বিকল্প কি কেউ ছিল, যাকে আমেরিকা সমর্থন দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতো ? এ প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বলা যায়। আফগান কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদ একজন মডারেট ইসলামিস্ট এবং একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাধর সামরিক জেনারেল। আহমদ শাহ মাসুদ তার যুদ্ধ পরিচালনায় কখনও আমেরিকান সাহায্য গ্রহণ করে নি—হয়তো কোন 'অফার' আসেনি। রিচার্ড মেকেঞ্জি অন্যান্য সাংবাদিকদের চেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছে মাসুদের সাথে। তিনি বলেন মাসুদ ইসলামী বিপ্লব পরিচালনা করছিলেন। তিনি কোন 'ম্যাগনা কার্টা' আনতে চান নি, কিন্তু চেয়েছিলেন আফগানিস্তান গণতান্ত্রিক স্টেট হোক, লোকে সুবিচার পাক। (মাসুদকে দুজন আরব গুপ্তহন্তারক ২০০১ সালে ৯ সেপ্টেম্বর হত্যা করে। আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়ার মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বিন লাদেনের যেমন আঙুলের ছাপ দেখা যায়, তেমনি মাসুদ হত্যার ব্যাপারেও বিন লাদেনের কালো হাতের দাগ পাওয়া যায়।)

যুদ্ধক্ষেত্রে মাসুদের যে বিক্রম ছিল তা তুলনাহীন। পনিশির উপত্যকার উত্তরে সুরক্ষিত দুর্গতে সোভিয়েত সেনারা নয়বার আক্রমণ চালায় তাকে হটিয়ে দুর্গ দখল করতে, কিন্তু প্রতিবারই সোভিয়েত সেনারা হটে গেছে। এই আক্রমণগুলোর মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ আক্রমণ ছিল সর্বসেরা আক্রমণ। সোভিয়েত সেনারা বাধ্য হয়ে সরে যায়। ফরাসি পণ্ডিত অলভিয়ের রয় (Olivier Roy) ব্যাখ্যা করেন যে মাসুদ আফগানদের প্রথাগত যুদ্ধ পদ্ধতি বদলে দিয়ে আধুনিক সচল গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। আফগানদের প্রথাগত যুদ্ধ পদ্ধতি হল মর্যাদার লড়াই ও মালে গনিমাতের ভাগিদার হওয়া। এর বদলে মাসুদ

আধুনিক কার্যকর যুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুদ্ধ কৌশলে সমস্ত উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান তার দখলে আসে, পাকিস্তানিদের এই যুদ্ধ পদ্ধতির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। মাসুদ মাও এবং চে-র কৌশল পড়াশোনা করে তার দক্ষতাকে পুষ্ট করেন আর এটাই ছিল গেরিলা যুদ্ধের আসল পদ্ধতি : সংঘবদ্ধ, হঠাৎ আক্রমণ লক্ষ্যমাত্রায় তীব্র গতিময়তা এবং দক্ষ সৈন্য পরিচালনার জন্য মাসুদ তার আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে সাফল্য লাভ করেন। দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ১৯৯২ সালে এক সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করেছিল যে মাসুদ 'ঠাণ্ডা লড়াই বিজয়ী' আফগান ছিলেন। হিকমতিয়ার নয়, মাসুদই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি ১৯৯২-এর এপ্রিলে আফগান কম্যুনিস্ট সরকারের কাছ থেকে কাবুল অধিকার করেন। এটা ঘটেছিল ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতদের আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার পর। মাসুদের বাহিনী ধর্মান্ধ তালিবানদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন যখন হিকমতিয়ার দেশ ছেড়ে ইরানে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিল।

১৯৯৩ সালে আমি মাসুদের সাথে দেখা করি। শক্ত তারে পাকানো কঠিন শরীর, আত্ম-প্রত্যয়ী তাজিক। তার অন্তরে যে দৃঢ় কঠিন মন তা সহজে অনুমেয়, কারণ তিনি সারা জীবনটাই যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িত। অথচ এই মানুষের মধ্যে বালকের স্বভাব আছে, সেন্স অব হিউমার আছে কারণ তার জীবনে ইসলামী সুফিভাবের প্রভাব রয়েছে—তাই শত্রুর প্রতি যেমন নিষ্ঠুর, বন্ধুর প্রতি তেমনি কোমল। মৌলবাদী কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি মজার একটা জবাব দিলেন। বললেন ইসলামে কোন ধর্মন্ধতা বা মৌলবাদিত্ব নেই। আমি বিশ্বাস করি ইসলাম একটি সহনশীল ধর্ম, আমিও মধ্যপন্থী, নরমপন্থী (মডারেট) মুসলিম।

মাসুদ দৃঢ়ভাবে চায় যে আফগান-আরবরা তাদের দেশে ফিরে যাক। জেহাদের যে বাস্তবতা, তা আফগানদের ওপর বর্তাক। আমাদের দেশের চারদিকে অস্ত্রধারী আরব ঘুরে বেড়াবে, এটা আমাদের কাম্য নয়। তারা ভালোয় ভালোয় আমাদের দেশ পরিত্যাগ করুক। এই সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, মাসুদ এটা সহ্য করতে পারেন না যে জেহাদের জন্য আরবরা এসে আফগানদের ট্রেনিং দিক—যেমন হিকমতিয়ার এবং পরে তালিবানরা চেয়েছিল।

তারপরের দশকে দেখা গেল আফগান-আরবরা কমার্শিয়াল এয়ারলাইন ছিনতাই করে সেগুলো ব্যবহার করলো ম্যানহাটনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগন ধ্বংস করতে, তারা ইয়েমেনে পশ্চিমা টুরিস্টদের কিডন্যাপ করলো, মিশরে টুরিস্টদের হত্যা করলো, ফিলিপিন্সে সন্ত্রাসবাদ জাগিয়ে তুলল; আফ্রিকাতে দুটো আমেরিকান এম্বেসিতে বোমা ফাটালো, সৌদি আরবে আমেরিকান মিলিটারি পোস্ট উড়িয়ে দিল, সোমালিদের প্রশিক্ষিত করলো মোগাদিসুতে আমেরিকান সেনাবাহিনী হত্যা করতে, নির্মম গৃহযুদ্ধে আলজিরিয়াকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। এই হিসাব তাদের আংশিক কর্মের হিসাব। এখন এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আমেরিকার উচিত ছিল আফগানিস্তানে আহমদ শাহ মাসুদকে অর্থ ও যুদ্ধ-

সম্ভার দিয়ে সাহায্য করা, যে শুধু একজন উৎকৃষ্ট সমর নেতা ছিলেন না, এমন একজন মানুষ ছিলেন যার মধ্যপন্থী স্বভাব ও নীতি আমেরিকার নীতি ও স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে পারতো। আমেরিকা পুষেছিল দুষ্ট ঘোড়া, টাকা খেয়ে যেমন মোটা হয়েছে, তেমনি মেরেছে জোড়া পায়ের লাথি।

আমেরিকা যখন দেখল হিকমতিয়ার তাদের নীতি বিরুদ্ধ এবং মাসুদ হতে পারতো বন্ধুসুলভ, তাহলে কেন সিআইএ পাকিস্তানি আইএসআই-এর কর্মধারায় বাধা দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন করেনি ? এর উত্তরে বলা যায় এটা ছিল সিআইএ'র ইচ্ছাকৃত নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা এবং আফগানিস্তান সম্বন্ধে পাকিস্তানের মূল্যায়নের বাহ্যিক ব্যবহারিক আচরণকে মেনে নেয়া। পাকিস্তানিদের অন্তর্নিহিত মনোভাবকে সিআইএ ভাসাভাসা দেখেছে, গূঢ়ভাবে বিচার করেনি। ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছিল যে হিকমতিয়ারই মুজাহিদিনদের উপযুক্ত ও সময়োচিত কমান্ডার, কিন্তু আমরা দেখেছি তার এই অভিমতের পক্ষে বিন্দুমাত্র যুক্তি ছিল না। সম্ভবত পাকিস্তানিরা হিকমতিয়ার সম্বন্ধে নিজেদের প্রপাগান্ডার ওপর বেশি আস্থা স্থাপন করেছে, তলিয়ে দেখেনি। প্রশ্ন হল : সিআইএ কেন এ ধরনের একতরফা প্রপাগান্ডায় বিশ্বাস করলো ?

১৯৯৩ সালের এক সাক্ষাৎকারে, রবার্ট গেট্‌সের সিআইএ'র আফগান পলিসি জোর গলায় সমর্থন হাইস্কুল ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নের মত। তিনি বলেছেন তাদের (পাকিস্তানিদের) লক্ষ্য ছিল ঐসব দলকে আফগানিস্তানে সাহায্য করা যারা সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে যুদ্ধ করছে। তাদের মধ্যে সবাইকে (মুজাহিদিন) ডিনারে নিমন্ত্রণ করা যায় না। বাস্তব কথা হল, যে কৌশলগত দিক দিয়ে আফগানিস্তানের অবস্থা বিচার করা উচিত। মিল্ট টিয়ারডেন তিন বছর ধরে সিআইএ'র অপারেশন দেখাশোনা করেছেন আফগানিরা যখন সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। তিনি আমাকে বলেন তুমি চাও না তাদের মধ্যে কেউ এসে তোমার কন্যাকে বিয়ে করুক...। আমাদের মতে মাসুদ অন্যান্যদের চেয়ে স্বাধীনচেতা মানুষ, সে তাই সুবিধা ও ইচ্ছামত কাজ করতো। হিকমতিয়ার নিজে একজন কালো ঘোড়া ও গোলমেলে মানুষ হলেও তার অধীনে যে সব কমান্ডার কাজ করতো তারা ছিল কাজের মানুষ—হিকমতিয়ারকে সমর্থন দেয়া যদি মারাত্মক ভুল হয়ে থাকে তাহলে ১৯৮৬ সালে যে সিদ্ধান্ত হয়, সোভিয়েতের সাথে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য, আমেরিকান স্টিনজার মিসাইল মুজাহিদিনদের দেয়ার জন্য, তার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলে দেখা গেল তা আমেরিকার স্বার্থে কোন কাজে আসেনি। এন্টি-এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট মিসাইল রূপে স্টিনজার খুবই কার্যকর, যা হাতে ধরে ব্যবহার করা যায়। এই স্টিনজার ব্যবহার করার কারণে সোভিয়েতদের আকাশ-যুদ্ধ থেমে গেল, যা দিয়ে তারা পূর্বে ভালো ফল পেয়েছিল। স্টিনজার সম্বন্ধে মাসুদ-এর মন্তব্য হল আফগানদের কেবলমাত্র দুটো জিনিস অবশ্যই দরকার : কোরান আর স্টিনজার।

গ্রাহাম ফুলার বলেন যে আফগানদের স্টিনজার দেয়ার সিদ্ধান্ত, প্রথমে ওয়াশিংটন নিতে দোনা-মোনা করেছে এই মিসাইল টেকনোলজি রাশিয়ানদের হাতে পড়ে যায়। এবং সোভিয়েত-আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ না বেধে যায়। তাই স্টিনজার দেয়ার সিদ্ধান্তটা ছিল বিতর্কমূলক, কেননা এতে যুদ্ধের সম্প্রসারণতা বেড়ে যেতে পারতো আফগানিস্তানের বাইরে। সিআইএ'র ডেপুটি ডাইরেক্টর জন ম্যাকমোহন এর বিরোধিতা করেন। তার কাছে ভৌগোলিক রাজনীতিটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সোভিয়েতরা পাকিস্তানও আক্রমণ করে বসতে পারতো। তাই তিনি আফগানদের প্রযুক্তিবিদ্যায় বেশি বলীয়ান করতে চাননি। ভিন্‌স ক্যানিস্‌ট্রেরো বলেন সিআইএ'র মধ্যে অনেক কর্মকর্তা সন্দেহ করত যে আফগানরা এই উন্নত ধরনের অস্ত্র (স্টিনজার) ব্যবহার করতে পারবে কিনা। এ দুশ্চিন্তা অবশ্য অমূলক ছিল। ১৯৮৬ ও ৮৭ সালে, প্রায় ৯ শো স্টিনজার আফগানদের সরবরাহ করা হয়, এই মিসাইল সোভিয়েতদের ২৬৯টি প্লেন ও হেলিকপ্টার ধ্বংস করে দেয় যুদ্ধের শেষ প্রান্তে।

যাইহোক, এখন প্রায় শ' দুয়েকের মত স্টিনজার যা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবহার কম হয়নি এখন সেইসব অস্ত্র গিয়ে পড়েছে ইরানি, তালেবান ও আল-কায়েদার হাতে। কান্দাহার বিমানবন্দরে, ১৯৯৯-র ডিসেম্বরে, আমি এক তালিবান সৈন্যের হাতে দুটো স্টিনজার দেখেছি। আল-কায়েদার কাছে যে এ মিসাইল আছে তার প্রমাণ মেলে নিউনিয়র্কে ১৯৯৫ সালে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ট্রায়ালে এক সাক্ষীর জবানবন্দিতে। সে পূর্বে আফগানিস্তানে ১৯৯০ সালে আল-কায়েদা ক্যাম্পে এই স্টিনজার দেখতে পেয়েছিল। আল-কায়েদা পাকিস্তান থেকে কিছু স্টিনজার ১৯৯৩ সালে সুদানে জাহাজ মারফত পাঠাতে গিয়ে কৃতকার্য হয়নি এবং ১৯৯৮ সালে বিন লাদেন আফগানিস্তানে এক প্রেস কনফারেন্সে বলেছিল যে তার কয়েকজন অনুসারীকে সৌদি আরবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাথে স্টিনজার রাখার কারণে। ১১ সেপ্টেম্বর-এর পূর্বে, ইউএস কর্মকর্তারা সৌদি আরবে প্লেনে সৈন্য পাঠাবার সময় ভয় করছিল। প্লেনের ওপর স্টিনজার হামলা হয় কিনা। এখন অবশ্য আফগানিস্তানে ভবিষ্যতে কোন মিলিটারি অপারেশনে স্টিনজার ব্যবহৃত হয় কিনা, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এটা অবশ্য স্পষ্ট নয়, আল-কায়েদার হাতে এখন ক'টা স্টিনজার আছে, তবে অনুমান করা যায় তাদের হাতে বেশ কয়েকটি স্টিনজার মওজুদ আছে।

এখন কি ঐসব স্টিনজার ব্যবহারযোগ্য ? নিয়ম মতে, এসব অস্ত্রের একটা সীমিত ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা থাকে। যাই হোক, সিআইএ অপারেশনে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা ১৯৯০-এর দশকে এইসব মিসাইল ক্রয় করে ফিরিয়ে নেয়াকালে মন্তব্য করেন যে এই সীমিত ক্ষমতা ধারণের কথা অসত্যভাবে প্রচার করা হচ্ছে, বাজারে এর দাম কমিয়ে দেবার জন্য। এই পর্যন্ত যা দেখা গেছে, তাতে প্রকাশ পায় যে কেবলমাত্র আফগান যুদ্ধের সময় এই স্টিনজার মিসাইল

ব্যবহার করা হয়েছে, কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নয়। (১৯৯৯ সালে মাসুদ বাহিনী মাত্র একটি ব্যবহার করেছিল তালিবানদের একটি জেট ফাইটার নামিয়ে ফেলার জন্য)। একজন সিনিয়র, ইউএস কর্মকর্তা বলেন আফগানিস্তানে স্টিনজার রাখা এককথা, আর এর বাইরে স্টিনজার ব্যবহার করা অন্য কথা। লজিসটিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে বলা যেতে পারে যে-কোন স্টিনজার লুকিয়ে রাখা বেশ কষ্টসাধ্য, আরো কষ্টসাধ্য কাস্টম ফাঁকি দিয়ে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর তোমার টারগেট সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা থাকা দরকার কোন প্লেন বা বিমানকে 'হিট' করতে হবে এবং সে-প্লেনের আরোহী বা কে ? আফগানিস্তানের মধ্যে এর ভালো বাজার থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে নেয়া মুস্কিল। ১৯৯৫ সালে, একজন ক্যামেরাম্যান, আমি জানি যে কাবুলের বাজারে বিক্রির জন্য আনা তিনটি স্টিনজারের ছবি ধারণ করেছিল তার ক্যামেরায়।

স্টিনজারের সাহায্যে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর ওপর বিজয় এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসে গৌরবময় কাহিনী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে, কারণ সোভিয়েতের মত একটা সুপার শক্তিকে পরাভূত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা আফগান তথা ইসলামিস্ট জঙ্গিদের ইসলামী জোশ বাড়িয়েছে, যার জন্য সারা বিশ্বে সন্ত্রাস ও গেরিলা আন্দোলন পরিচালনায় মৌলবাদীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৭৯৮-এ নেপোলিয়নের মিশর বিজয়ের পর, পশ্চিমা শক্তির সাথে মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং মুসলিম সামরিক শক্তি ও পশ্চিমা-সামরিক শক্তি উত্থানের সাথে অবক্ষয়ের সূচনা হয়। অটোমেন তুর্কিদের ওপর ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের বিজয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের কলোনিকরণ ইসলামী সাম্রাজ্যে কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকা হয়।

তাই রাশিয়া কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের এই বিজয় মুসলিমদের জন্য নৈতিক বিজয়, যা এ জাতিকে উদ্দীপিত করেছে। আল্লাহর নামে একটি সুপার শক্তির পরাজয় ঘটেছে। আফগান-আরবদের জন্য এ বিজয় গুরুত্বপূর্ণ সবক এবং বিন লাদেনের জন্যও যে এখন তার পরবর্তী ধর্মযুদ্ধের পাঁয়তারা করছে খোদ আমেরিকার বিরুদ্ধে।

অধ্যায়–চার

কোরান ও কালাশনিকভ :
বিন লাদেন কয়েক বছর সুদানে

(The Koran and the Kalashnikov : Bin Laden's Years in Sudan)

'They began issuing statements amongst themselves in the Sudan, calling the Americans infidels... But, ladies and gentlemen, it was not just words. You will bear that bin Laden and his group began taking actions to prepare to do battle with his enemies, particularly the United States.'

Opening statement of federal prosecutor
in the Manhattan trial of four bin Laden
associates, 5 February 2001

১৯৯৭ সালে লন্ডনে আমি মধ্যপ্রাচ্যের একজন বিচ্ছিন্নতাবাদীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন ওপরে এসো, আমি তোমাকে কিছু দেখাতে চাই। তার স্টাডি রুমে গিয়ে তিনি ভিডিও টেপ বের করে ভিসিআর–এ জুড়ে দিলেন। জানালার মধ্য দিয়ে যে দৃশ্য দেখানো হল, তাতে দেখলাম হাজার হাজার আমেরিকান সৌদি আরবে বাস করছে। ক্যামেরার লেন্সে যে দৃশ্য স্থির হল, দেখা গেল আরাম কো–র কর্মচারীদের হাউসিং কমপ্লেক্স। তারপর ক্যামেরা ঘুরে গেল, স্থির হল ঐ চিত্রে যেখানে একজন আমেরিকান রমণী তার শিশুকে দোলনায় দোলাচ্ছেন। পরবর্তী দৃশ্যে, ক্যামেরায় দেখা গেল একজন মহিলা সৈন্য একটি ইউএস আর্মি ট্রাক ড্রাইভ করছে। যখন মহিলা সৈন্য দেখলো একটি ক্যামেরা তাকে ভিডিও টেপে ধরে রাখছে, সে তখন বিচলিত হল। টেপটির ছবিগুলো তুলেছে বোধ হয় আনাড়ি কিংবা এমেচার ক্যামেরাম্যান, তবে ছবিগুলো চিত্তাকর্ষক। এতে কোন ধারা বিবরণী ছিল না, তবে এর বাণী বা মেসেজ খুব সরল, বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'দেখ, দেখ, বিধর্মীরা কেমন করে আমাদের পবিত্র ভূমিতে 'ট্রেসপাস' করেছে অর্থাৎ অনধিকার প্রবেশ।'

১৯৯০-এর ৭ আগস্টে সৌদি আরবে 'ডেজার্ট শিল্ড' রূপে নাটকীয়ভাবে আরব পেনিনসুলায় আমেরিকার সেনাবাহিনীর প্রবেশ এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থান। এতে মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে, প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। প্রফেট মোহাম্মদ-এর মৃত্যুকালীন বাণী—'আরবে দুটি ধর্মের স্থান নেই'-এর বিপরীতে 'বিধর্মী' খ্রিস্টানদের নারী-পুরুষের অনধিকার প্রবেশ আরব মুসলিম সইবে কেন ? বিন লাদেনের জন্য,আমেরিকানদের আরবে অবস্থান দশ বছর পূর্বে বিধর্মী রাশিয়ানদের আফগানিস্তান আক্রমণের শামিল। এটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে ঠিক আট বছর পর ১৯৯৮-এর ৭ আগস্ট, বিন লাদেনের অনুসারীরা আফ্রিকাতে আমেরিকার দুটো এম্বেসি বোমা মেরে একই সময়ে উড়িয়ে দেয়—এটা চাট্টিখানি কথা নয়।

অবশ্য বিন লাদেন অনেকদিন আগে থেকেই আমেরিকাকে অভিশাপ করছিল। ১৯৮৯ আফগান যুদ্ধ থেকে ফিরে, মসজিদে ও ঘরোয়া মিটিং-এ ওয়াজকার (বক্তৃতাকারী) হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এই সুযোগে বিন লাদেন ইসরাইলকে সমর্থন যোগানোর কারণে আরবে আমেরিকান দ্রবাদি বয়কট করার আহ্বান জানায়। তার এইসব ভাষণের ধারণকৃত ক্যাসেট হাজার হাজার কপি সৌদি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আলগলিতে বাজতে শুরু হল।

বিস্ময় বোধ হলেও সত্য যে, সাদ্দাম হোসেনের সাথে যুদ্ধাবস্থায় কারণে বিন লাদেন সৌদি আরবে ইউএস সেনাবাহিনীর অবস্থানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল। উল্লেখ্য যে, সাদ্দাম হোসেনের যুদ্ধ লিপ্সার কথা সে বহু পূর্বে সৌদি সরকারকে অবহিত করে সাবধান করেছিল। কুয়েতের ওপর হামলা করার এক বছর পূর্বে বিন লাদেন এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মসজিদে প্রচার করেছিল এ কথা স্মরণ করে বিন লাদেন যুদ্ধের সময় বলল : আমি আগেই বলেছিলাম যে সাদ্দাম হোসেন গাল্‌ফ আক্রমণ করে দখল করে নেবে। তখন আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। আমি সৌদি আরবে এ সম্বন্ধে অনেক 'টেপ' বিতরণও করেছিলাম। এখন আমার সেই কথায় মানুষের বিশ্বাস জন্মেছে।'

১৯৯০ সালে ১লা আগস্ট ইরাক তেলসমৃদ্ধ ছোট দেশ কুয়েত দখল করে বসে এবং সৌদি আরবের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় বিন লাদেন ও তার সহকর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে দেশের নিরাপত্তার জন্য স্বেচ্ছা-সেবকরূপে সৌদি রাজ্যের পাশে দাঁড়ায়। সৌদি সৈন্যবল এবং বিন লাদেন বাহিনী দেশ রক্ষার জন্য যথেষ্ট বলে সে মনে করে। কারণ তার প্রশিক্ষিত যোদ্ধারা আফগানিস্তানে যুদ্ধ করে রাশিয়ানদের তাড়াতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু সৌদিরা বিন লাদেনের এই শুভেচ্ছাকে খুব গুরুত্বপূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি। নিজেদের সেনাবাহিনীর জন্য কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা সত্ত্বেও, সৌদি সরকার আমেরিকা সরকার ও প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। আমেরিকা সৌদি সরকারের সাথে তেলের কারবার করে ভাগ্য ফিরিয়ে

নিলেও, এ সুযোগ হাতছাড়া করলো না। প্রথমে 'ডেজার্ট অপারেশন শিল্ড' নামে সেনা পাঠাতে শুরু করলো আমেরিকা। পরে 'ডেজার্ট অপারেশন শিল্ড'-এর নামের পরিবর্তে নাম হল 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম।' মোটমাট পাঁচ লক্ষের ওপর আমেরিকান সৈন্য গাল্‌ফ-এ এসে জাঁকিয়ে বসে গেল (এদের মধ্যে একজন ছিল টিমোথি ম্যাকভেগ—যে ১৯৯৫ সালে ওকলাহামা সিটিতে ফেডারেল ভবনে বোমা ফেলে ১৬৮ জন আমেরিকান হত্যা করে। ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণের পূর্বে আমেরিকাতে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা)।

বিন লাদেনের প্রতিবাদ, আমেরিকান সৈন্য আগমনের বিরুদ্ধে, যখন উচ্চারিত হল এতে সমর্থন দিলেন দু'জন ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তি-সফর আল-হাওয়ালি এবং সলমন আল-অওদা। এদের পরে জেলবন্দি করা হয়। ১৯৯১ সালে আল-হাওয়ালি তার খোতবায় বলেছিলেন—'গাল্‌ফ-এ যা যখন ঘটছে, এটা সারা আরব ও মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার পূর্বাভাস।' তখনও পর্যন্ত বিন লাদেনের ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তিরূপে ভাবমূর্তি প্রকাশ পায়নি। তাই বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে তার বক্তৃতায় আল-হাওয়ালি এবং আল-অওদার মন্তব্য তুলে ধরতেন জনসম্মুখে।

১৯৯১ সালের শুরুতে, বিন লাদেন সৌদি আরব ছেড়ে সুদানে চলে যাবার কথা বলতো। এ সংবাদ প্রচার করেন মিশরীয় সাংবাদিক এশাম দেরাজ। এশাম দেরাজ আফগানিস্তানে তিন বছর ছিলেন এবং বিন লাদেনের সাথে প্রায়ই যোগাযোগ রাখতেন। দেরাজ বলেন আমি বলেছিলাম এটা করো না, সুদানে গিয়ে লাভ নেই। কিন্তু সে সুদূরপ্রসারী চিন্তা করতো না। কূটনৈতিক বুদ্ধি কম ছিল, আবেগের বশেই চলতো। অতি উৎসাহী মানুষ। দেরাজ শেষবার যখন সৌদি আরবে লাদেনের সাথে দেখা করেন তখন এই মিলিয়নিয়ার সৌদিকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানির মত অতি সরল জীবনযাপন করতে দেখেন। সে বাড়িতে সে বাস করতো, তা ছিল অতি সাধারণ বাড়ি। লোকজন সবাই মাটিতে শুতো এমন কি তার পরিবারের সদস্যরাও অন্য ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে শুতো। আমি সেখানে যে তিনদিন ছিলাম, মেঝেতেই শুয়ে কাটিয়েছি।

বিন লাদেনের সুদান যাত্রার যোগাড়-যন্ত্র একবছর ধরে চলেছিল। এর ব্যবস্থা করেছিল আল-কায়েদার জামাল আল-ফজল। সে জাল কাগজপত্র নিয়ে পাকিস্তান থেকে মিশর তারপর সুদানে যায়। ধরা পড়ার বিপদকে এড়ানোর জন্য সে তার দাড়ি কেটে পরিষ্কার হয় এবং সাথে কোলন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য প্যাক করে দেখায় যে সে নারীদের পছন্দ করে। সুদানে পৌছে, ফজল খার্তুমের উত্তরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার দিয়ে এক খামার বাড়ি ক্রয় করে। সুদানিজ ইনটেলিজেন্সের সাথে আল-কায়েদার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। খামার বাড়ি ছাড়া, ১ লক্ষ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার দিয়ে আল-ফজল সুদান বন্দরের ধারে একটা লবণের খামারও খরিদ করে নেয়। এই দুটো খামারই আল-কায়েদা গ্রুপ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছিল।

বিন লাদেনের লাগাতার সরকার-বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণে সৌদি কর্তৃপক্ষ তাকে বলতে গেলে, গৃহবন্দি করে এবং তার জেদ্দা ভ্রমণও সীমিত হয়ে যায়। এরপর বিন লাদেন দেশ ত্যাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে সে তার পারিবারিক সম্পর্ক ব্যবহার করে বাদশা ফাহদের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় মিটমাটের জন্য অনুমোদন গ্রহণ করে। ১৯৯১-এর এপ্রিলে পাকিস্তানে পৌঁছে সে তার পরিবারকে পত্রে জানায় যে দেশে সে আর ফিরতে পারবে না। কয়েক মাস আফগানিস্তানে কাটিয়ে সে সুদানে পৌঁছায় এবং ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্টের (এনআইএফ) নেতা হাসান আল-তুরাবি তাকে উষ্ণ অর্ভ্যথনা জ্ঞাপন করেন।

১৯৮৯ সালে নামেমাত্র দেশ-প্রধান ব্রিগেডিয়ার ওমর হাসান আহমদ আল-বশির এক সামরিক ক্যু-র দ্বারা সাবেক বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে; কিন্তু আসলে আল-তুরাবি দেশে 'ডি-ফ্যাক্টো' প্রশাসক। আল-তুরাবি সরবোন (Sorbonne) থেকে ভালোভাবে স্নাতক লাভ করেন এবং দেশে একটি নিঘাত মৌলবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তাই বিন লাদেনের সাথে জমজমাট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিন লাদেনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হল সুদানে তার আরব্ধকাজ করার জন্য। পরে বিন লাদেন এই দরিদ্র দেশে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যবসায় লগ্নি করলো। আল-কায়েদা যোগাযোগ প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি, রেডিও এবং রাইফেল এনআইএফ-এর জন্য খরিদ করে দিল। পরিবর্তে সুদানি সরকার দু'শো নতুন পাসপোর্ট তৈরি করে দিল বিন লাদেনের মানুষদের জন্য, যাতে তারা নতুন পরিচিতি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে।

সুদানে বিন লাদেন দ্বৈত জীবন শুরু করলো। একদিকে সে তার ব্যবসার সাম্রাজ্য গড়ে তুললো; ব্যাংকে, কৃষি প্রকল্পে ও ভবন ও হাইওয়ে নির্মাণকাজে টাকা খাটিয়ে। অন্য দিকে সে তার সংস্থার জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প খুলে বসলো যেখানে তার অনুসারীদের প্যারা-মিলিটারি দক্ষতা লাভে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলো।

বিন লাদেন কিছু সৌদি ব্যবসাদারকে ও তার কয়েকজন ভাইকে সুদানে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে অর্থ যোগান দিতে উৎসাহ দেয়। এদের মধ্যে তার এক বন্ধু খালেদ আল-ফাওয়াজ অন্যতম। আল-ফাওয়াজ এই সূত্রে কয়েকবার সুদানে ঘুরে গেল। আল-ফাওয়াজ বলে—আমি বিন লাদেন যে হাইওয়ে তৈরি করছে, দেখে এলাম। সে আমাকে একটা বড় ফার্মে নিয়ে গেল, দেখলাম বেশ কয়েক শো নতুন অস্বাভাবিক ধরনের গাছের চাষ হচ্ছে। সে আমাকে সুদানে ব্যবসা করতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু আমি এর ভবিষ্যৎ দেখি না। সুদানে আইন ও নিয়ম-কানুন আমাদের ব্যবসার জন্য অনুকূল হবে না। আমি ঐ সময় খাদ্যবস্তু আমদানি-রপ্তানি করতাম। ওসামা বলেছে তুমি সুদানে খাদ্য ফলাও এবং পরে তা সৌদি আরবে রপ্তানি করো।

আল–ফাওয়াজ–এর ভাষায় : বিন লাদেন মাল্টি–মিলিয়নিয়ার হয়েও সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করে যেতে থাকলেন; যখন আমি তার বাসা ও জীবনযাপনের ধারা অবলোকন করি, আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। তার বাসায় কোন ফ্রিজ নেই, নেই এয়ারকন্ডিশনার, নেই বিলাসবহুল গাড়ি কিছুই না।

বিন লাদেন সুদানে তার গ্রুপ অব কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ফেললো এবং বলতে গেলে আল–কায়েদার 'হলি ওয়ার ইনকর্পোরেটেড' এখান থেকেই শুরু হল। তার প্রথম ট্রেডিং ব্যবসা, ওয়াদি আল–আকিক, মূলত একটা শিপিং এজেন্সি—যে কোন মাল বিদেশে 'শিপ' করা যেতো। অন্যান্য কোম্পানিগুলো হল আল–হিজরা কনস্ট্রাকশন (বিন লাদেন ও সুদানিজ সরকার–এর জয়েন্ট–ভেঞ্চার কো:) দেশের ব্রিজ ও রাস্তা তৈরি করার জন্য। এই কোম্পানির প্রায় ৬ শো কর্মচারী ছিল। তারপর আল–থেমার কৃষি বিষয়ক কোম্পানি, যার আল–দামাজিন খামার বাড়ির এলাকা এক মিলিয়ন একর এবং কর্মচারী ছিল চার হাজার। এই খামার বাড়িতে (ফার্ম) সিসেম তেল উৎপাদন করা হত, আর বাদাম ও শস্যের চাষ হত। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতে বিন লাদেনের কোম্পানির মধ্যে তাবা (Taba) ইনভেস্টমেন্ট লি: গাম, কর্ন, সানফ্লাওয়ার ও গিসেম প্রোডাক্ট–এর রপ্তানি ছিল একচেটিয়া কারবার। তাবা কো:, এছাড়া, চিনি, কলা, টিনজাত মাল এবং সাবানের কারবারও করতো। 'দ ব্লেসেড ফ্রুটস্ কো: ফলমূল ও সব্জির চাষ করতো, আর আল–ইখলাস কো: তৈরি করতো মিষ্টি, ক্যান্ডি, লজেন্স ও মধু। বিন লাদেন আল–কুদুরাত নামে একটি ট্রাক কোম্পানিও প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়া, 'খার্তুম ট্যানারি' নামে চামড়ার কারখানা; বেকারি; এবং আসবাবপত্র তৈরির কারখানাও চালু করে। এসব কারবারের মালিকানা ছাড়া বিন লাদেন খার্তুমের আল–শামাল ইসলামিক ব্যাংক–এ ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নিজের পকেট থেকে জমা রাখে।

আল–কায়েদা অন্যান্য আন্তর্জাতিক কোম্পানির মত বিশ্বজোড়া কারবারি মন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসার কারণে এই গ্রুপ বিভিন্ন দেশে ব্যাংক–এ একাউন্ট খোলে। যেমন সাইপ্রাস, মালয়েশিয়া, হংকং, দুবাই, ভিয়েনা এবং লন্ডন। আল–কায়েদা সদ্যরা রাশিয়া থেকে ট্রাক, স্লোভাকিয়া থেকে ট্রাকটর তাদের গ্রুপের কোম্পানির ব্যবহারের জন্য এবং বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য–দল নিয়ে গেল যেমন—হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া, চায়না, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপিন্স ব্যবসার সম্পর্ক গড়তে।

বিন লাদেন তার নয়–কামরা বিশিষ্ট বিজনেস অফিস প্রতিষ্ঠা করলো খার্তুমের ম্যাকনিমৃর স্ট্রিটে; পরে অফিস–কাম–বাসা করলো শহরের রিয়াদ অঞ্চলে। নীল নদের তীরে আল–কায়েদা গ্রুপ চারটি ফার্ম (খামারবাড়ি) কিনে ফেললো। সেখানে বিন লাদেন অশ্ব–চালনা করতো (বিন লাদেন উৎকৃষ্ট ঘোড়া সওয়ার) এবং সপ্তাহ–পালন তার এখানেই হতো। তার অন্য অনুসারীরা এখানে

এসে সাঁতার কাটতো, ফুটবল খেলতো এবং বনভোজনে মেতে উঠতো। (ঘোড়ায় চড়া ছাড়া বিন লাদেনের অবসর সময় কাটতো বই পড়ে। সে ইসলামী চিন্তাধারা ও অধুনা-বিশ্ব সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করত)।

বিন লাদেনের হাজার হাজার কর্মচারীর মধ্যে বেশিরভাগ কর্মচারীর আল-কায়েদা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। এই সংস্থার কাজ-কর্ম গোপনে হত। এই গ্রুপ সম্বন্ধে ধারণা পেতে হলে সদস্য হতে হয়। আল-কায়েদার সদস্যদের মাসিক বেতন ছিল ৫০০ থেকে ১২০০ মার্কিন ডলার।

১৯৯৩ সালের শেষের দিকে, বিন লাদেন তার প্রথম সাক্ষাৎকার দিল পশ্চিমা প্রেসকে ব্রিটেনে ইনডিপেন্ডেন্ট-এর রবার্ট ফিস্ক-এর কাছে। ফিস্ক বর্ণনা করেছেন যে সারি সারি গ্রামবাসী বিন লাদেনকে দেখা ও ধন্যবাদ দেবার জন্য ভিড় জমিয়েছিল, কারণ বিন লাদেন খার্তুম থেকে লোহিত সাগরের ধারে পোর্ট সুদান পর্যন্ত হাইওয়ে তৈরি করেছিল। এরপূর্বে পুরানো রাস্তা ছিল ১২০০ কি. মি. তার ওপরে যে হাইওয়ে তৈরি হয় তা দূরত্ব কমিয়ে ৮০০ কিলোমিটারে আনা হয়। লাদেন সোনার জরিতে কাজ করা মূল্যবান জোব্বা পরে দেখা দিয়েছিল।

টাইম মেগাজিনের সাংবাদিক স্কট ম্যাকলিওড্‌ও ১৯৯৬-এর শুরুর দিকে বিন লাদেনের সুদানের কারবার দেখতে আসেন। তিনি বলেন ঐ সময় সে পোর্ট সুদান-এর রাস্তা তৈরি করছিল এবং সানফ্লাওয়ার প্যান্টেশন ও ট্যানারি কারখানার মালিক ছিল। তার ফ্যাক্টরি ও কারবার দেখাবার জন্য সে যথেষ্ট কষ্ট করে... কারখানায় এখন ভেড়া ও ছাগলের চামড়ার জ্যাকেট তৈরি হচ্ছিল ইতালিতে রপ্তানির জন্য এবং সে আমাকে স্পষ্টভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছিল— 'দেখো, আমি কেমন ব্যবসা ফেদেছি।'

সেটা অবশ্য আংশিক সত্যি। তবে আসলে, বিন লাদেনের সুদানে যে পাঁচ বছর জোরেশোরে কারবার চলেছে তা বেশিরভাগই কেটেছে রাজনৈতিক কেরিয়ার গড়ে তুলতে এবং আমেরিকাকে লক্ষ্য করে তার প্যারামিলিটারি অপারেশনের প্ল্যান-প্রোগ্রামের নিখুঁত নক্‌সা তৈরি করতে। তার বাণিজ্যিক ব্যবসা নামকা ওয়াস্তে লোক-দেখানো—সন্ত্রাসী কারবারের আবরণ মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯90 দশকের শুরুতে একটি প্লেনে চিনির বস্তা আফগান নিয়ে যায়, কিন্তু ফিরে আসে রাইফেল, বন্দুক ও রকেট বোঝাই হয়ে।

১৯৯৭ সালে বিন লাদেন সিএনএন-কে বলেছিল যে সুদানে থাকাকালীন সময়ে তার বড় ধরনের সাফল্য ছিল আফগান-আরবদের দিয়ে সোমালিয়ায় ৬ জনের অধিক আমেরিকান সৈন্য হত্যা করা। যেহেতু সে বারবার তার যোগসূত্র অস্বীকার করেছিল ১৯৯৫ সালে সৌদি আরবে এবং ১৯৯৮ সালে আফ্রিকার আমেরিকান দুই এম্বেজিতে আক্রমণের ব্যাপারে, তাই ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ার ঘটনায় তার যোগসাজশ ছিল কিনা, লোকে সন্দেহ করে। ১৯৯৭ সালে ফিলিপ উইলফক্স সিএনএনকে বলেছিলেন : আমরা বিন লাদেনের কথা বিশ্বাস করি।

ইউএন মিশনের অংশ হিসেবে ১৯৯২ সালে ডিসেম্বরে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ক্ষুধার্ত সোমালিদের খাদ্য বিতরণের জন্য ২৮ হাজার আমেরিকান সৈন্য পাঠান। এই গ্রুপের প্রথম দল 'নেভি সিল্‌স' ও 'মেরিনস্‌' সোমালিয়ার সি-বিচে অবতরণ করে ৯ ডিসেম্বর ভোর রাতে। তাদের স্বাগত জানায় বিশ্ব-প্রেসের মাত্র কয়েকজন ফটোগ্রাফার ও ভিডিও ক্রু। এটা ছিল পেন্টাগনের অশুভ যাত্রার প্রথম পর্যায়—যা শুরু হয়েছিল হাস্যকররূপে, কিন্তু শেষ হয় বেদনা-বিধুরভাবে।

আমেরিকা সৌদি আরবে হাজার হাজার সৈন্য সমাবেশের দু'বছর পর, আল-কায়েদা ঐসব সেনাদলের সোমালিয়ায় পৌঁছানোর সংবাদ পেলো এবং দেখলো যে মুসলিম বিশ্বের একটা বিরাট অংশ আমেরিকার কব্‌জায় চলে যাচ্ছে। সুতরাং আল-কায়েদার ফতোয়া কমিটি সোমালিয়ায় আমেরিকা সৈন্যের ওপর হামলা করার জন্য নির্দেশ জারি করে এবং বলে যে এবার তারা সাপের মাথা কেটে ফেলবে। ডিসেম্বরের শেষে ইয়েমেনের আল-কায়েদার সহযোগীরা সোমালিয়াতে আমেরিকান ট্রুপের ট্র্যানজিট ক্যাম্পে বোমা ফাটায় (সে বোমায় একজন অস্ট্রেলিয়ান পর্যটক মারা যায়, কিন্তু আমেরিকার কোন লোক মারা যায়নি।)

শান্তি রক্ষার জন্য যে মিশন ছিল তা শিগ্রী যুদ্ধের আকার ধারণ করে যখন আমেরিকার ট্রুপ্‌স গোত্র-যুদ্ধে জড়িয়ে যায় যারা রাজধানী মোগাদিসু দখল করার চেষ্টা করে। এতে দুর্ভিক্ষের আকার মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। ইউএন এবং আমেরিকান কমান্ডাররা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা গোত্র নেতা মোহাম্মদ আইদিদকে আক্রমণ করে দমন করলে শান্তি ফিরে আসবে। কারণ মোহাম্মদ আইদিদ ছিল নাটের গুরু। তারা এই মর্মে হন্যে হয়ে আইদিদকে খোঁজা শুরু করে, আর এইখানেই তাদের ভুল হয়।

১৯৯৩ সালে বিন লাদেনের সামরিক কমান্ডারদের মধ্যে একজন, আবু হাফ্‌জ দু'বার সোমালিয়া ভ্রমণ করে আমেরিকা সৈন্য আক্রমণের সম্ভাব্যতা নিরীক্ষণ করে সুদানে বিন লাদেনকে অবহিত করে। একজন আল-কায়েদা মর্টার বিশেষজ্ঞকেও সে দেশে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৯৩-এর শুরুতে আবু হাফ্‌জ সোমালিদের সাহায্য ও সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ১৯৯৩-এর ৩/৪ অক্টোবর, ১৮ জন আমেরিকান সৈন্য মারা পড়ে এক মোগাদিসুতে আইদিদকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য এক মারাত্মক বন্দুকযুদ্ধে অন্তত পাঁচশো সোমালিও এই যুদ্ধে মারা পড়ে। এই যুদ্ধের সময় রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড (আরপিসি) দিয়ে তিনটি আমেরিকান কালো হক হেলিকপ্টর (ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টর) ধ্বংস করা হয়। একজন ইউএস কর্মকর্তা আমাকে জানান যে দক্ষতার সাথে হেলিকপ্টর গুলি করে নামানো হয় তা সোমালিদের দ্বারা সম্ভব নয় এবং সে শিক্ষাও তারা পায়নি। মোগাদিসুর যে-যুদ্ধে ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টর নামানো হয়েছিল সে-সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে সাংবাদিক মার্ক বোডেন বলেন আইদিদের লোকজনদের ঐসব আরবরা প্রশিক্ষিত করেছিল যারা আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে

এবং কেমন করে 'আরপিজি' দিয়ে হেলিকপ্টরের পেছনে নাজুক স্থানে রকেট ছুড়তে হয় তাও শেখানো হয়েছিল। (মাগাদিসুর যুদ্ধের এক সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকা সোমালিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে।) সোমালিয়াতে বিন লাদেনের ভূমিকা সম্বন্ধে যে দাবি ও প্রতিদাবি চলছিল, এতে একটা দিক পরিষ্কার হয় যে বিন লাদেনের মানুষরা আমেরিকা-বিরুদ্ধ মোগাদিসুর উপজাতিদের প্রশিক্ষিত করেছিল। কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়নি সেই সব উপজাতি কারা এবং সত্যি সত্যি মোগাদিসুর উপজাতি আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল কিনা। ২০০১ সালে বিন লাদেনের যে চারজন অনুচরকে ম্যানহাটন ট্রায়ালে জেরা করা হয়, সেখানে সাক্ষ্যে পাওয়া যায় যে একজন আল-কায়েদা সদস্য মোহাম্মদ ওহেদ সত্যি সত্যি সোমালি উপজাতিদের প্রশিক্ষিণ দিয়েছিল যারা আইদিদ-বিরুদ্ধ ছিল। অন্যদিকে ট্রায়ালে এ-ও প্রমাণিত হয় যে হারুন ফাজিল, কেনিয়া সেলের আল-কায়েদার শীর্ষসদস্য, ১৯৯৩ সালে মোগাদিসুতে ছিল যখন যুদ্ধ হয়। ১৯৯৭ সালে, ফাজিল তার এক পত্রে আল-কায়েদার নেতাকে অবহিত করে এই বলে যে আমেরিকা ভালোভাবেই জানে, যেসব যুবক সোমালিয়ার যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে কারা সোমালি আর কারা শেখের (বিন লাদেন) অনুসারী ছিল।

কিন্তু বিন লাদেন এ বিষয়ে দ্ব্যর্থবোধক ছিল না। ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানে পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মির-এর কাছে একটি লোককে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল—এই ব্যক্তিই আমার সোমালিয়া কমান্ডার। আমার ট্রুপের কমান্ডার যারা সোমালিয়াতে আমেরিকান ট্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং এই সেই ব্যক্তি যে একটি আমেরিকান হেলিকপ্টর ধ্বংস করে। ১৯৯৯ সালে, আল-জাজিরা টেলিভিশন বিন লাদেনের প্রথম সাক্ষাৎকার প্রচার করে, আরবি ভাষায়। এই সাক্ষাৎকারে বিন লাদেন দাবি করে যে সোমালিয়াতে তার মানুষেরা যুদ্ধ করেছে। আমার ভাইদের নিকট থেকে রিপোর্ট পেয়েছিলাম যারা সোমালিয়ায় যুদ্ধ অংশ নেয়। সেই রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের যোদ্ধারা আমেরিকান সৈন্যদের দুর্বলতা, ভঙ্গুরতা ও কাপুরুষতা সব কিছুই টের পেয়েছে। কেবলমাত্র আঠার জন আমেরিকান সেন্য মারা গেছে। তা সত্ত্বেও তারা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে গেছে।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিন লাদেন ও তার অনুসারীরা সুদানে থাকার সময়ে শনৈ শনৈ নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদী রূপ ধারণ করে। এসাম দেরাজ বলেন এটা আংশিক সত্য যে এই সময় মধ্যপ্রাচ্য হতে অনেক অত্যাচারিত যুবক বিন লাদেনে কাছে জমা হয় এবং তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগে। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক যুবক অত্যাচারে মৃত্যুবরণও করেছে। এতে আল-কায়েদার সদস্যরা সন্দেহবাদী হয়ে ওঠে এবং অচেনা যুবকদের আগমনে তীব্র সতর্কতা অবলম্বন করে। এমনি একজনকে খবর সংগ্রহকারী সন্দেহে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৯৯১ সালের মধ্যে সুদানে আল-কায়েদার সদস্য সংখ্যা এক হাজার থেকে দু'হাজারে বেড়ে যায় এবং তিন বছরের মধ্যে বিন লাদেন শহরের উত্তর দিকে কয়েকটি মিলিটারি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। এই ক্যাম্পে সকলের যাওয়ার অধিকার নেই; এমন কি লা'হুসেন খেরচু (L'Hossaine Kherehton), আল-কায়েদা সদস্য, প্রায়ই সুদানে আসতো, তাকেও এই ট্রেনিং-এর গভীরতা সম্বন্ধে কোন সংবাদ দেয়া হয়নি বা দেখতে দেয়াও হয়নি। এর কারণ ছিল। কেননা, আল-কায়েদার সদস্যরা গতানুগতিক মিলিটারি ট্রেনিং-এ বিশ্বাসী ছিল না। তাদের দৃষ্টি ছিল অতি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে দীক্ষাও শিক্ষা পেতে। ১৯৯৩ সালে, আল-কায়েদা গ্রুপ ২ লক্ষ ১০ হাজার মার্কিন ডলার দিয়ে টাকশান, আরিজোনা থেকে একটি প্লেন খরিদ করে এবং তাকে খার্তুমে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়। এই প্লেন কেনা হয় পাকিস্তান থেকে এন্টি-এয়ার ক্র্যাফ্ট মিসাইল আমেরিকান স্টিনজার নিয়ে আসার জন্য। যাইহোক, এ উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

১৯৯০ ও ১৯৯৩ সালের শুরুর মধ্যে আল-কায়েদার কিছু সদস্য 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব দি আফগান জেহাদ'—শিরোনামে একটা মস্ত কাজ হাতে নেয় সংকলনের জন্য। কয়েকটি ভলিউম-এ হাজার খানেক পাতা জুড়ে এর কাজ শেষ হয় এবং এক একটি ভলিউম এই ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নামে উৎসর্গ করা হয়। এই বিশ্বকোষ থেকে প্রত্যেক আফগান-আরব সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ধর্ম-যুদ্ধের কথা জানতে পারে। বিশ্ব-কোষের মধ্যে আবদুল্লাহ আজম ও বিন লাদেনের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়—যারা এখনো জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে, বন্ধ করেনি। এই বিশ্বকোষে ৮০০ পাতা ভরে আছে শুধু অস্ত্র-শস্ত্রের নাম। আমেরিকার স্টিনজার মিসাইলসহ আর ২৫০ পাতা ভরে আছে কেমন করে সন্ত্রাসী ও প্যারা মিলিটারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এই বিশ্ব-কোষের CD-ROM ভার্সান তৈরি করে পাকিস্তানের বাজারে ছাড়া হয় বিক্রি করার জন্য ১৯৯০-এর মধ্যভাগে। এই ধরনের একটি পুস্তক 'Military Stadies in the Jihad Against the Tyrant' বাজেয়াপ্ত করা হয় ২০০০ সালে মে মাসে মাঞ্চেস্টারে আনাস আল-লিবির বাসাতে। লিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে সে বিন লাদেনের সাথে সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আল-কায়েদা গণ-ধ্বংসের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করতেও চায়। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে জামাল আল-ফাজিল হিলাট কোকো নামে খার্তুমের শিল্প এলাকায় গিয়েছিলেন, যেখানে আল-কায়েদার প্রতিনিধি ও সুদানি আর্মি অফিসার উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং-এ কেমিক্যাল অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। আল-কায়েদা ও সুদানিজ আর্মি আর্টিলারি শেল-এ কেমিক্যাল এজেন্ট যোগান দেয়ার সহযোগিতাও করেছিল। আল-ফজল অন্য এক আর্মি অফিসারের সাথে দেখা করে ইউরেনিয়াম খরিদ করার জন্য পরামর্শ নেয় এবং একজন সহযোগীর সংস্পর্শেও এসেছিল, সেই সহযোগী ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন

ডলারের ইউরেনিয়াম বিক্রি করতে চেয়েছিল এবং মাল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু পরে আল–ফজল এ উদ্যোগ বাতিল করে। (অবশ্য এই প্রচেষ্টার জন্য ১০ হাজার মার্কিন ডলার বোনাস দেয়া হয়েছিল।)

বিন লাদেন এখন ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য অস্ত্র–শস্ত্র, কেমিক্যাল ইত্যাদি যে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে তা স্পষ্টভাবে জাহির হয়ে গেছে। তার ভাষ্য ছিল যদি আমরা ন্যুক্লিয়ার, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্র জোগাড় করতে চেষ্টা করি, তা অপরাধ মনে করি না। আমাদের নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার অধিকার আছে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে অপরাধ নেই। তাছাড়া আল–কায়েদার শীর্ষ কর্মকর্তা মামদুহ মাহমুদ সলিম পরিশোধিত ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করে ন্যুক্লিয়ার অস্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, সে কথা প্রকাশ পায়। আমেরিকান লক্ষ্যমাত্রায় আল–কায়েদা সাইয়ানাইড গ্যাস জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার চেষ্টা চালানোর জন্য কুকুরের ওপর পরীক্ষাও চালিয়েছিল। অবশ্য সে টেকনিক্যাল দক্ষতা না থাকায় সে প্রচেষ্টা আর কার্যকর হয়নি।

১৯৯৫ সালের সুদানের ডি–ফ্যাক্টো প্রশাসক হাসান আল–তুরাবি ইসলামিক পিউপলস্ কংগ্রেস অরগানাইজ করেন। এই কংগ্রেসে বিন লাদেন পাকিস্তান, আলজিরিয়া, তিউনিশিয়া ও প্যালেস্টাইনের ইসলামিক জিহাদ এবং হামাস প্রভৃতি দেশের জঙ্গি নেতাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। একই সময়ে, ইরানি সাহায্যপুষ্ট হিজবুল্লাহর সাথেও আল–কায়েদা আঁতাত গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এই হিজবুল্লাহ পার্টি দক্ষিণ লেবাননে অবস্থিত। হিজবুল্লাহ পার্টি শিয়া এবং বিন লাদেন কট্টর সুন্নিপন্থী হলেও দু'দলের ধর্মীয় মতভেদের পাথর্ক ভুলে কমন শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে দ্বিধা করেনি। আল–কায়েদা সদস্য লেবাননে একটা গেস্ট হাউস প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া–আসা শুরু করে এবং হিজবুল্লাহর সাথে মিলে বড় বড় বিল্ডিং বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করে। এদিকে বিন লাদেন হিজবুল্লাহর সিকিউরিটি সার্ভিসের বড়কর্তা ইমাদ মুঘনিয়ার সাথে মোলাকাত করে। এই সিকিউরিটি সার্ভিস খোদ ইরানে অবস্থিত। এই মিটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৮৩ সালে বৈরুতে মেরিন ব্যারাকে যে সুইসাইড ট্রাক বোম্বিং হয় সেই নাটের গুরু ছিল মুঘনিয়া। এই আক্রমণে ২৪০ জন আমেরিকান সার্ভিসম্যানের প্রাণহানি ঘটে। তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই আমেরিকা লেবানন থেকে তাদের তাল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেলে।

আল–কায়েদার একজন সদস্য আলী মোহাম্মদ যে এখন আল–কায়েদার বিরুদ্ধে ইউএস সরকারের পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার ভাষ্য মতে বিন লাদেন বৈরুত ঘটনাকে আদর্শ হিসেবে ধরে তার পরবর্তী কার্যক্রম চালাতে চেষ্টা করে। বিন লাদেন মন্তব্য করেছিল, বৈরুতে যেমন আক্রমণ করে আমেরিকাকে সেখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য করা হয়েছিল, সেইভাবে সৌদি আরবে আমেরিকার 'বেস' আক্রমণ করে তাদের সেখান থেকে তাড়াতে হবে। এটা অবশ্য

আমেরিকা কিংবা তার বিদেশ–নীতিকে বিভ্রান্ত করে না, কারণ লেবাননের স্বার্থটা সৌদি আরবের তেলের স্বার্থের মত আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বা নয়ও। সৌদি আরবে তেল সম্পদে আমেরিকার অর্থনীতির রক্ত জড়িত। এখান থেকে শুধু বোমা মেরে তাদের তাড়ানো যাবে না।

আল–কায়েদা সুদানে থাকাকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওভারসিজ সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। এই দল বাকুতে (আজারবাইজান) একটা সেটেলাইট অফিস প্রতিষ্ঠা করে, চেচনিয়াতে ধর্মযোদ্ধা প্রেরণ করে এবং প্রত্যেক ধর্মযোদ্ধার পেছনে ১৫০০ মার্কিন ডলার খরচ করে। তাজিকিস্তানেও ধর্মযোদ্ধা পাঠায়, ফিলিপিন্সে মরো ফ্রন্টের জন্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়, জর্ডন ও ইরিত্রিয়ায় ১ লক্ষ মার্কিন ডলার তাদের এফিলিয়েট দলের কাছে পাঠানো হয়, ইয়েমেন ও মিশরে অস্ত্র–শস্ত্র পাচার করে। এই দলের কাছে ইরান বিস্ফোরক দ্রব্য পাথরের আকারে পাঠায়।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় সার্ভ ও মুসলিম বসনিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল নব্বুই দশকের শুরুতে, আল–কায়েদা সেখানে বহু আফগান–আরব পাঠিয়েছিল যুদ্ধে অংশ নিতে—বিশেষ করে জেনিকা অঞ্চলে। তখন সময় ছিল ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ কাল। সেই সময় বিন লাদেনের 'থার্ড ওয়ার্ল্ড রিলিফ এজিন্সি' নামে ভিয়েনাতে একটা চ্যারিটি অফিস ছিল। এই চ্যারিটি অফিসের মাধ্যমে মিলিয়নস্ ডলার বসনিয়াতে অনুদান হিসেবে পাঠানো হয়। আল–কায়েদা ১৯৯৩ দশকের শুরুতে বহু মুজাহিদিনকে প্রশিক্ষণ দেয় বসনিয়ায় যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য। আর বিন লাদেনের একটা সার্ভিস অফিস ছিল ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগরেবে।

সুদানে থাকার সময় আল–কায়েদা অন্যান্য জঙ্গি মুসলিম দলের সাথে আঁতাত ও যোগাযোগ স্থাপন করে। যেমন মিশরের ইসলামিক দল এবং জেহাদি দল, আলজিরিয়ার আমর্ড ইসলামিক দল, লিবিয়ান ফাইটিং দল, ইয়েমেনের জান্নুবি সাইফ ইসলামিক দল এবং সিরিয়ার জামাত–এ জিহাদ আল–সুরি।

১৯৯৩ সালে গোড়ার দিকে বিন লাদেন দলের সদস্যরা নাইরোবিতে আমেরিকান এম্বেসিতে আক্রমণের পাঁয়তারা করে। পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে বিন লাদেন এটা পরিষ্কার করে বলে যে নাইরোবিকে লক্ষ্যমাত্রা করার কারণ আমেরিকার সোমালিয়াতে বর্বর আক্রমণ। মিশরীয় আমেরিকান আলী মোহাম্মদ বলেন ১৯৯৩ সালে তিনি নাইরোবি ভ্রমণ করেন সেখানকার আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ ও ইসরাইলি টার্গেটগুলোকে সার্ভে করতে, বিশেষ করে আমেরিকান এম্বেসি, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সোমালিয়ায় মাতব্বরি করার প্রতিবাদে। তারপর মোহাম্মদ খার্তুমে যান, সেখানে বিন লাদেন তার সার্ভে ফাইল এবং ফটোগ্রাফ বিচার করে। সে আমেরিকা এম্বেসির ওপর দৃষ্টি এবং একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে হাত রেখে জানায় যে এখানেই আত্মঘাতী বোমা হামলা করা যায়।

সুদানে আল–কায়েদার ঘাঁটি থাকার সময় গ্রুপের মধ্যে টাকা–পয়সা ও পরিকল্পনার কৌশলগত কারণ নিয়ে ছোটখাটো মতবিরোধ ঘটলে ঝগড়া হত।

১৯৯৩ সালে আল–কায়েদার সদস্যরা তর্ক জুড়ে দিল, মিশরের আধ্যাত্মিক গুরু শেখ ওমর আবদেল রহমানের নিউইয়র্কে গ্রেপ্তার হওয়ার পর সৌদি আরবের আমেরিকান এম্বেসি আগে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে কিনা এই প্রস্তাব নাকচ করা হয়, কারণ এতে বহু নিরীহ সিভিলিয়নের প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

অবশ্য এতে সৌদি রাজ্যে আমেরিকান টারগেট বাদ পড়লো না। ১৯৯৫ সালে ১৩ নবেম্বর সৌদি আরবের রিয়াদে ন্যাশনাল গার্ড বিল্ডিং–এর বাইরে (সৌদি আমেরিকার যৌথ সম্পত্তি) এক কার–বোমা বিস্ফোরণ হল। দেশের ইতিহাসে এ ধরনের বোমা আঘাত প্রথম এবং এতে পাঁচজন আমেরিকান ও দু'জন ভারতীয় নাগরিক মারা যায়। পরের বছরে এপ্রিলে সৌদি টেলিভিশনে অপরাধীদের স্বীকারোক্তি প্রচার করা হয়। চারজন অপরাধীকে নির্যাতন করেও তাদের জবানবন্দি থেকে কোন সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি (তাদের কথায় সৌদি উপজাতিদের নাম ও ভাষায় আরবি গন্ধ পাওয়া যায়। তাই সৌদি সরকার ঘরোয়া বিপদ এড়াবার জন্য এ বিষয়ে আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নি)। অপরাধীদের মধ্যে একজন বলেছিল বিন লাদেনের এবং মিশরীয় ইমলামিস্ট দল কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে সে একাজে জড়িত হয়। অন্য আর একজন বলে আফগান জেহাদে যুদ্ধ করার সময় তার বিস্ফোরক দ্রব্যে অভিজ্ঞতা ছিল। একবার ঝালিয়ে নেবার ইচ্ছা হল। এই চারজনের মধ্যে তিনজনই আফগান ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এদের বিন লাদেনের সাথে সংযোগ ছিল। তাদের মধ্যে একজন মসলিহ আল–শামরানি আফগানিস্তানে বিন লাদেনের 'ফারুক' ব্রিগেডের সদস্য ছিল।

১৯৯৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে আল–জাজিরার আরবি টেলিভিশনে বিন লাদেন রিয়াদ বোম্বিং–এর সাথে তার সম্পর্কের কথা বলেছিল আমি স্বীকার করি যে, আমার জাতিকে জেহাদে শামিল হতে যে 'ফতোয়া' জারি করা হয় তাতে সহযোগী স্বাক্ষরকারী ছিলাম। কয়েক বছর আগে আমরা এটা করেছিলাম। আল্লাহর কাছে শোকর যে আমাদের সেই 'ফতোয়া'–তে অনেকে সাড়া দিয়েছিল। আমাদের ভাইরা যারা ধর্মযুদ্ধে মারা গেছে, তাদের আমরা 'শহীদের' দরজা দিয়ে থাকি...।

দুর্ভাগ্যক্রমে রিয়াদ আক্রমণ সম্বন্ধে আর কোন তদন্ত হয়নি, কারণ আমেরিকান তদন্তকারীরা তাদের ইন্টারোগেট করার পূর্বেই সৌদি সরকার অপরাধীদের শিরশ্ছেদ করে। এরপর কেস চাপা পড়ে যায়।

পরবর্তী আক্রমণ হল ১৯৯৬ সালে ২৫ জুন। এ আক্রমণ আরও মারাত্মক। দাহরানে খোবার টাওয়ার বিল্ডিং–এর বাইরে তেলভর্তি ট্রাক পার্ক করা ছিল। সেই ট্রাকে বোমা ফাটানো হলে ১৯ জন ইউএস সার্ভিসম্যান মারা যায় এবং শ'খানেক আহত হয়। এই বিস্ফোরণ এতো জোরে হয়েছিল যে ১৮তলা খোবার টাওয়ার বিল্ডিং–এর সামনের দিক ছিঁড়ে–খুঁড়ে বিশ মাইল দূরে বাহরাইনে গিয়ে পড়ে।

সৌদি সরকার দোষ চাপায় ইরানের ওপর কিংবা দেশের পূর্ব দিকে ইরান–সমর্থিত শিয়াদের ওপর। কিন্তু পরে ছ'শো আফগানি–আরব গ্রেপ্তারের পর বোঝা গেল একাজ বিন লাদেনের বয়স্ক অনুসারীদের দ্বারা সম্ভব হতে পারে। ২০০১ সালে জুন মাসে, শিয়া হিজবুল্লাহ সৌদি দলের (ইরান সমর্থিত) তেরজন সদস্য খোবার বোম্বিং–এ জড়িত করে পাকড়াও করা হয়।

১৯৯৭ সালে সিএনএন–এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিন লাদেন রিয়াদ ও দাহরান–এ বোমাবাজির ব্যাপারে জড়িত 'বীর'–পুরুষদের 'প্রশস্তি' গায়, কিন্তু নিজের সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে অস্বীকার করে। বিন লাদেন বলে বাপুহে, আমি এসব ব্যাপারে নেই, মোল্লা মানুষ, তবে যারা ঐ সব কাজ করেছে তাদের আমি শ্রদ্ধা জানাই। তাদের এই সম্মাননার সাথে আমি নিজেকে অংশীদার করতে পারলে ধন্য মনে করতাম।

একই সময়ে বিন লাদেন তার মানুষদের সামরিক শিক্ষার বন্দোবস্ত ও আমেরিকান টারগেট আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করলো। আর অন্য দিকে সৌদি রাজ্যের গোঁড়া কাটার জন্য খুব তীব্রভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জুড়ে দিল। সে প্রতিষ্ঠা করল 'Advice and Reformation Committee (ARC)– যাকে আমেরিকান সরকার আল–কায়েদার প্যারা–মিলিটারি অপারেশনের বর্ধিত অংশ বলে আখ্যায়িত করে; কিন্তু আসলে এটি সংস্থা বা কমিটি সৌদি-সরকারের বিরুদ্ধে বৈধ রাজনৈতিক বিরোধী দল বলে গণ্য হল। এই আন্দোলন উপদেশ–স্মারক সৌদি সরকারের বিভিন্ন দূর্নীতির সংস্কার সম্বন্ধে চিঠিপত্র প্রধান প্রধান সৌদি ইসলামিক পণ্ডিত ব্যক্তির সই ও স্বাক্ষর যুক্ত হয়ে ইস্যু হতে লাগলো।

এ আন্দোলনের শুরু হয় ১৯৯২ সালে। ১৯৯৪–এর জুলাই মাসে বিন লাদেন ARC লন্ডন অফিসে পরিচালক রূপে নিয়োগ দেয় খালেদ আল–ফাওয়াজকে। লন্ডনের সংবিধান মতে ARC শান্তিপূর্ণভাবে সৌদি সরকারের নীতি সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে বৈধ উপায়ে চিঠিপত্র ও আন্দোলন শুরু করে।

লন্ডনের ARC অফিসে আল–ফাওয়াজ আমাকে বলেছিলেন ARC কোন নতুন জিনিস নয়, এটা ঐ সমস্ত সংস্কারের ধারাবাহিক কার্যক্রম যা দশ বছর ধরে চলে আসছে। আমরা ভেবেছিলাম সংস্কারক হিসেবে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি সৌদি সরকার কর্তৃক নির্যাতিত ও নির্বাসিত হয়েছে—এই কারণে আমাদের এখন এই সংস্কার মাধ্যমে জোট বেঁধে কাজ করার সময় এসেছে, যাতে আমরা সহমত হয়ে একজোটে কাজ করলে ব্যক্তি নির্যাতন ও নির্বাসন এড়াতে পারবো এবং আমরা বাইরে থেকে আমাদের পরিবারকে সাহায্য করতে পারবো, যাদের ওপর সৌদি সরকার অবৈধভাবে জুলুম করছে। আল–ফাওয়াজ আমার কাছে একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বলছেন : আমরা বা আমি ওসামার জন্য কাজ করি না, আমরা সকলেই বন্ধু।

ARC বহু ইস্তেহার ইস্যু করেছিল। ১৯৯৫ সালে ৮ই মার্চ এটির ১৭নং ইস্তেহারে বিভিন্ন দুষ্কর্মের সমালোচনা করা হয়। যর মধ্যে ছিল 'মানুষের তৈরি

আইন'—যা শরিয়াভুক্ত নয়, ইসলামী আইনের বাইরে। জাতির প্রতি অকৃতজ্ঞতা; বেকারত্ব বৃদ্ধি; রাজপরিবারের জন্য বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ; এবং গাল্‌ফ যুদ্ধে সরকারের প্রাক্কলিত ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়—দেশের অদক্ষ ও অকার্যকর সেনাবাহিনীর পেছনে বেসুমার অর্থ অপচয় ছাড়াও। এই বিজ্ঞপ্তিতে বাদশা ফাহদের পদত্যাগও দাবি করা হয়।

এইসব সমালোচনা আল-সৌদ বংশের কাছে অভিশাপ স্বরূপ (anathema), কারণ এই পরিবার যুগ যুগ ধরে বংশীয় রাজত্ব ভোগ করেই চলেছে। ১৯৯৪ সালের দিকে সৌদি সরকার বিন লাদেনের সম্পত্তি ও অর্থ বাজেয়াপ্ত করে এবং তার নাগারিকত্ব কেড়ে নেয়। এই সূত্রে বিন লাদেনের পরিবার, দাপ্তরিকভাবে, তার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। তার ভাই বাকর, যিনি পরিবারের ব্যবসা দেখা শোনা করেন, ১৯৯৪ সালে মার্চ মাসে সৌদি মিডিয়াতে ওসামার কার্যকলাপের ওপর দুঃখ ও ঘৃণাভাব প্রকাশ করে ঘোষণা দেন।

সৌদিরা বিন লাদেনকে তার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে সরে থাকার জন্য তাকে বুঝিয়েছেন, কিন্তু ফল হয়নি। সাদ আল-ফাগিহ্ বলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে যে তিনটি ডেলিগেশন সুদানে গিয়ে বিন লাদেনকে সৌদি রাজ্যেকে টারগেট করা থেকে বিরত থাকতে বলেছিল—তাদের জানতাম। তারা বিন লাদেনকে বলেছিল—তুমি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো কর, কিন্তু সৌদি রাজ্যের বিরুদ্ধে করো না, এটা তোমার নিজের দেশ। বিন লাদেন ডেলিগেটের সদস্যদের বলেছিল সৌদিরা আমার মাকে, চাচাকে এবং আমার ভাইদের প্রায় ন'বার খার্তুমে পাঠিয়েছিল সৌদি পরিবারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কারবার বন্ধ করতে এবং বাদশা ফাহদের কাছে মাফ চাইতে...আমি দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার করি।

সৌদিরা ও ব্যাপারটি বেশ সূক্ষ্মভাবে সমাধান করেনি। আল-কায়েদা থেকে পালিয়ে আসা সদস্য জামাল আল-ফজল বিন লাদেনকে গুপ্তহত্যা করা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল। ১৯৯৪ সালে, একজন লোক এ. কে-৪৭ নিয়ে খার্তুমে বিন লাদেনের বাসায় গুলি চালিয়েছিল—সম্ভবত সৌদিরাই এই প্রচেষ্টা চালায়।

সুদানে আল-কায়েদার প্রধান কার্যালয় থাকার সময়, পাকিস্তানে ও আফগানিস্তানে আল-কায়েদা বেশ কার্যকর (একটিভ্) ছিল। আল-কায়েদা পেশওয়ারে হায়াদ্রাবাদে একটা গেস্ট হাউস প্রতিষ্ঠা করে—যা ১৯৯১ সাল থেকে চালু ছিল। আফগানিস্তানের বর্ডারের মধ্যে আল-কায়েদার কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পগুলোর নাম ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ, আল-ফারুক, সাদিক, খালদান, জিহাদ ওয়াল এবং দারুনতা।

লা'হুসাইনি খেরচ্‌তো (L'Hossaine Kherchtou) আল-কায়েদার রিক্রুট বলে মনে হয় না। একজন মরোক্কান হিসেবে তিনি ফ্রান্সে ক্যাটারিং স্কুলে পড়াশোনা করেন। তা সত্ত্বেও তিনি ১৯৯১ সালে ইতালি থেকে পাকিস্তানে যান

এবং প্রথমে বিন লাদেনের বায়েত আল-আনসার গেস্ট হাউসে কিছু সময় থেকে, পরে আফগানিস্তানে রওনা দেন। আফগানিস্তানে তিনি কড়া ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে প্রশিক্ষিত করেন। ক্যাম্পে প্রথম দিনের সকালে গান ফায়ারের শব্দে খেরচ্‌তো ঘুম থেকে আচমকা জেগে ওঠেন। পরে বোঝা গেল এটা কোন আক্রমণ নয়, নতুন শিক্ষার্থীদের ভোরে ওঠার ইঙ্গিত যাতে শিক্ষার্থীরা তৈরি হয়ে নেয়, ড্রিলের জন্য; (তাকে বলা হয়েছিল, সকালে ঘুমানোর জন্য তুমি ট্রেনিং ক্যাম্পে আসেনি) তারপর তাকে বিভিন্নভাবে অস্ত্র পরিচালনায় শিক্ষা দেয়া হয়। যেমন, আমেরিকান এম-১৬ রাইফেল, রাশিয়ান একে-৪৭ রাইফেল এবং পিকে সাব-মেসিন গান, ইসরাইলি উজি সাব-মেসিন গান এবং এন্টি-এয়ার ক্র্যাফ্‌টগান। তিনি, এছাড়া, গ্রেনেডের ওপর ক্লাস করেন এবং কেমন করে বিস্ফোরক সি-৩, সি-৪ এবং ডিনামাইট ব্যবহার করতে হয় তাও তাকে শেখানো হল। শেষে, তাকে বিভিন্ন ধরনের মাইন ব্যবহার করার ব্যাপারেও ট্রেনিং দেয়া হয়। এছাড়া এন্টি-পার্সোনেল মাইন, ইন্ট-ট্রাক মাইন এবং বাটারি ফ্লাই মাইন (যা বাচ্চারা খেলনা বলে ভুল করে) এ ব্যাপারেও তাকে ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে খেরচতো তার ৪০ পাউন্ডের মতো ওজন কমিয়ে ফেললো। প্রশিক্ষণ চূড়ান্তভাবে শেষ হওয়ার পর, তিনি পেশওয়ারে ফিরে এলেন এবং আল-কায়েদায় সদস্য হিসেবে দীক্ষা-গ্রহণ করেন একটা গেস্ট হাউসে যার নাম বায়েত আল-সালাম, অর্থাৎ শান্তিনিকেতন।

১৯৯০ দশকের শুরুতে, পাকিস্তান সরকার খেরচতোর মত আরব জঙ্গিদের সরকারি খাতায় নাম রেজিস্ট্রি করতে বললো। অবশ্য অনেকেই করেনি, কিন্তু যারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নাম লিখিয়েছিল তারা আফগানিস্তানের সীমান্তবাসী ছিল, আর ছিল ১১৪২জন মিশরীয়, ৯৮১জন সৌদি, ৯৪৬জন ইয়েমেনি, ৭৯২জন আলজিরিয়ান, ৭৭১জন জর্ডেনিয়ান, ৩২৬জন ইরাকি, ২৯২জন সিরিয়ান, ২৩৪জন সুদানিস, ১৯৯জন লিবিয়ান, ১১৭জন তিউনিশিয়ান এবং ১০২ মরোক্কান। এই সংখ্যা থেকে বোঝা যায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে আফগান যুদ্ধে কতজন আফগান-আরব ছিল।

মধ্যপ্রাচ্য সরকারের—বিশেষ করে মিশরীয়দের ইসলামিস্ট জঙ্গিরূপে পাকিস্তানের 'বেস' ব্যবহার করার ব্যাপারে বাধা পেতে হত। তারা পাকিস্তানিদের চাপ দিত আফগান-আরবদের ওপর হামলা করতে, যাদের পরবর্তী পর্যায়ে সময়ে সময়ে পাকিস্তানের ভূমি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৯৩-এর মার্চ মাসে ৮০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মে মাসে (ঐ বছরে) বিন লাদেন তাদের মধ্যে তিনশো জনের সুদানে চলে যাওয়া রাহা খরচ দিয়ে দেয়। কিন্তু জঙ্গিরা পাকিস্তানে অপারেশনের কাজ চালিয়ে যায়। ১৯৯৫-এর নভেম্বর মাসে তারা ইসলামাবাদে মিশরীয় এম্বেসিতে একটা ট্রাকে বোমার আঘাত করে, ফলে ১৫ জন মারা যায় এবং জখম হয় ৮০জন। আমেরিকান প্রসিকিউটররা বলে যে

আল-কায়েদার মধ্যে মিশরীয় নেতৃত্ব বেশি, সুতরাং এই আক্রমণ মিশরীয় জঙ্গিদের দ্বারা সম্ভব। পরে কেনিয়াতে যে আমেরিকান এম্বেসিতে আক্রমণ হয়, তার সাথে ইসলামাবাদে মিশরীয় এম্বেসি আক্রমণের মিল আছে। উভয় অপারেশনে একজন আত্মঘাতী বোমারু বিস্ফোরক ও গ্রেনেড ভর্তি ট্রাক চালিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। মিশরীয় এম্বেসিতে আক্রমণ হওয়ার ছ'মাস পূর্বে, আল-কায়েদা সদস্যরা মিশরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে হত্যা করার চেষ্টা করে, যখন তিনি ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে কনফারেন্সে যোগ দিতে যান।

মিশরীয় এম্বেসিতে আক্রমণের কারণে পাকিস্তান সরকার ১৫০ জন আরব জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে যার মধ্যে বিন লাদেনের সার্ভিস অফিসের পরিচালক প্যালেস্টাইনি মোহাম্মদ ইউসুফ আব্বাসও ছিলেন। তিনি পরে সৌদি আরবে চলে যান। এই সময়েই সার্ভিস অফিস কর্তৃক প্রকাশিত 'জিহাদ' মেগাজিনও বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৬ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও মিশর সরকার কর্তৃক গুরুতর চাপ সৃষ্টি করা হয় সুদান সরকারের ওপর বিন লাদেনকে সুদান থেকে বহিষ্কার করার জন্য। এই কারণে সুদান সরকার বিন লাদেনকে সুদান থেকে চলে যেতে বলায়, সে তার পুরানো স্থান আফগানিস্তানে এসে ডেরা বাঁধে। বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দেয়াকে তুলনা করা যেতে পারে জার্মান হাইকমান্ডের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, লেনিনকে রাশিয়াতে পাঠিয়ে দেয়ার সাথে। লেনিনকে রাশিয়ায় পাঠানোর ফলে জার্মানির স্বল্প-মেয়াদি লাভ হল বটে, কিন্তু পরিশেষে লেনিন 'রাশিয়ায়' পৌছে, জার্মানির জন্য অদম্য শত্রুতে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমনি বিন লাদেন এবং আফগানিস্তান আমেরিকা ও মিশরের জন্য কৃপাহীন শত্রুতে পরিণত হল। আফগানিস্তানে থেকে বিন লাদেন বাধাহীনভাবে তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে সমর্থন হয়েছিল, এখনও হচ্ছে, বাধা দিতে কেউ পারছে না। বিন লাদেন ও আফগানিস্তান মুসলিম জঙ্গিদের আকর্ষণ করে জড়ো করলো পাহাড়-পর্বতে ঘেরা আফগানিস্তানে যা এই বর্তমান আধুনিক বিশ্বে পৃথিবীর প্রথম জেহাদি দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। এই আফগানিস্তানে বিন লাদেন সুদানের চেয়ে পৃথিবীর কাছে মহা হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বিশ্ব এখন বিন লাদেনের সৃষ্ট সন্ত্রাসী ইসলামিস্ট জঙ্গিদের ভয়ে সদা সচকিত।

অধ্যায়–পাঁচ

হিন্দুকুশ পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে : যুদ্ধ ঘোষণা

(From the Peaks of the Hindu Kush : The Declaration of War)

What is your understanding of what the Prophet Mubammad would say about whether it is proper to drive a truck into a building and blow up everyone inside?

Question by federal prosecutor during the trial of four bin Laden associates convicted of conspiring to blow up two American embassies in Afria in 1998

If you study the life of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, you will see the most gentle man. He would never allow innocent people to die, never. Never.'

Answer by the Muslim cleric Imam Siraj Wahhaj, of Brookly, New York.

বিন লাদেন যখন ১৯৯৬–র মে মাসে আফগানিস্তানে পৌছালো, সাথে ছিল তিনজন স্ত্রী আর বেশ কয়েকজন সন্তান–সন্ততি। এক হিসেবে যেন নিজের সংসারে ফিরে এলো বিন লাদেন তার পরিবারবর্গ নিয়ে। আফগানিস্তানের বন্ধুর পার্বত্য ঘেরা পথ ও উপত্যকায় লাদেন বাস করেছে দশ বছরের অধিক; সুতরাং এদেশ ও পরিবেশ তার কাছে নতুন নয়; তাছাড়া সে তালিবানদের ধর্মীয় অনুভূতি ও যোদ্ধাদের ভূয়োসী প্রশংসা করেছে—যারা ধীরে ধীরে দেশের নিয়ন্ত্রণের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছিল।

আফগানিস্তানে যাত্রা ও অবস্থানকে বিন লাদেন স্মরণ করলো প্রফেট মোহাম্মদ নিজের দেশের অত্যাচারিত হয়ে দেশ ত্যাগ করে হিজরত করেন মক্কা থেকে মদিনায় সেই সপ্তম শতাব্দিতে। প্রফেট এবং তার অনুসারীরা তাদের প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ মক্কার প্যাগনরা ইসলামের

একেশ্বরবাদ বিশ্বাস করেনি, বাধ্য করেছে বিশ্বাসীদের দেশ ছেড়ে যেতে। মদিনা থেকেই প্রফেট মোহাম্মদ আট বছর ধরে লাগাতার যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন বিধর্মীদের কাছ থেকে মক্কা নগরী উদ্ধার না করা পর্যন্ত। প্রফেটের এই আদর্শকে অনুসরণ করে বিন লাদেন পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভ করে, আর আফগানিস্তান তার কাছে মনে হল একবিংশ শতাব্দির মদিনা মনোয়ারা।

বিন লাদেন প্রথমে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় শহর জালালাবাদে ডেরা বাঁধলো আর বিভিন্ন পর্বতের গুহা গাত্রে গোপন স্থান সন্ধানে যাতায়াত শুরু করলো। তালিবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বিন লাদেনের কাছে একটি ডেলিগেশন পাঠিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলো এই বলে যে তালিবানরা তাকে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দেবে কারণ সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে তার জেহাদের ভূমিকা অনবদ্য।

নভেম্বর মাসে 'আল্-কুদ্স আল-আরাবি' পত্রিকার সম্পাদক আবদেল বারি আতওয়ান একটি পর্বতগাত্রে বিন লাদেনের সাথে মোলাকাত করতে এলেন। তিনি স্মরণ করলেন তার পূর্ব ভিজিটকে যখন পশ্চিম লন্ডনে বিন লাদেনের একটি অফিসে দেখা করতে যান। তিনি স্মরণ করলেন—তার সেই ভিজিট বেশ আরামদায়ক ছিল। তার কোয়ার্টার গাছের ডাল-পালা দিয়ে সাদামাটাভাবে তৈরি ছিল। সেখানে ছিল শত শত পুস্তক, প্রায়ই ধর্মীয় পুস্তক। আমি একটি বিছানায় শুয়েছিলাম যার তলে ছিল অনেক গ্রেনেড। মাত্র আধঘণ্টার মতো শুয়েছিলাম। আমি দেখলাম বিন লাদেনকে ঘিরে বিশ থেকে তিরিশজন মানুষ—মিশরীয়, সৌদি, ইয়েমেনি এবং আফগান। সে রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল, শূন্যের নিচে পনের ডিগ্রি। বিন লাদেনকে দেখার জন্য আমাকে দু'দিন অপেক্ষা করতে হয়। আমার লেখার সাথে বিন লাদেন পরিচিত ছিল। তাকে দেখে সরল ও বিশ্বস্ত মানুষ বলে মনে হল, নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে না, কখনও নিজেকে ইসলামের নেতা বলে চিত্রিতও করে না। সে আমাকে বললো যে—সৌদি সরকার তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে, ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে চায়, যদি আমি বলি সৌদি রাজ্য একটি ইসলামী রাজ্য। অবশ্য, তা বলা সম্ভব হবে না।

আতওয়ান আমাকে বলেছিলেন—তার (বিন লাদেন) অনুসারীরা সত্যি সত্যি তাকে বিশ্বাস করতো। তারা দেখেছে এই কোটিপতি লোকটি তার সমস্ত সম্পদ ধর্মের কারণে উৎসর্গ করেছে। পর্বতে গুহাগাত্রে সে তার অনুসারীদের সাথে বসে মিটিং করে, খাওয়া-দাওয়া সারে অতি সাদাসিধেভাবে, কোন বিলাস বা আড়ম্বরের বাহুল্য নেই।

১৯৯৬-এর ২৩ আগস্ট বিন লাদেন ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে কতকগুলো মৌলিক ঘোষণা দেয়। প্রথম হল আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ, যারা মুসলিম বিশ্বের দুটি পবিত্র স্থানের দেশ দখল করে বসে আছে। আরব দেশে আমেরিকার সৈন্যবাহিনরি লাগাতার অবস্থান এবং এই অবস্থানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের

আহ্বান; শুধু আজকের আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য আগ্রাসনকে চিহ্নিত করে না, এর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সময়কাল থেকে আমেরিকান বৈদেশিক নীতিতে। সৌদি আরব ও তার রাজ্যের দূর্নীতি ও ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ আজকের নয়, এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ-চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

বিন লাদেনের ঘোষণায় বলা হয়েছে এখন মুসলিমদের বোধে এসেছে যে তারাই একমাত্র ইহুদি ও ক্রুসেডারদের (পশ্চিমা শক্তিদের) লক্ষ্যবস্তু। প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর পর মুসলিমদের ওপর যে সর্বশেষ মারাত্মক আঘাত তা হচ্ছে তাদের দুটি মহা পবিত্র স্থানের ভূমি এখন বিধর্মীদের দখলে। বিন লাদেন ব্যাখ্যা করে বলেছে যে এটা প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুকালীন বাণীর (হাদিস) বিপরীতে অবস্থান, কেননা তিনি তার শেষ সময়কালের বলেছিলেন—'আল্লাহর ইচ্ছায় আমি যদি বেঁচে উঠি তাহলে আমি সমগ্র আরব থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তাড়িয়ে ছাড়ব।'

এক সময়ে বিন লাদেন আমেরিকার সাবেক প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি ইউলিয়ম পেরীর উদ্দেশ্যে কবিতা করে বলেছিল—

হে উইলিয়ম আগামীকাল তুমি জানবে
এক যুবক সম্বন্ধে;
যে তোমাদের সামরিক শক্তির সম্মুখীন হবে,
হাসিমুখে রণক্ষেত্রে।
তখন দেখবে, তার রক্তাক্ত বর্শার ফলক দেখে,
তারা রণভূমি পরিত্যাগ করছে।

এই অনুবাদে হয়ত অনেক কিছু বাদ পড়ে গেছে, তবে এ থেকে তার বক্তব্যের মর্মকথা উপলব্ধি করতে লোকে ভুল করবে না।

বিন লাদেন তার ঘোষণা শেষ করেছে সকলের প্রতি অস্ত্র ধারণের আহ্বান জানিয়ে। বলেছে—হে বিশ্ব মুসলিম ভাইরা, তোমাদের দুটি পবিত্র ভূমি ও প্যালেস্টাইন তোমাদের সমর্থন চায়। তারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহবান জানায়—সেই শত্রু হল আমেরিকা ও ইসরাইল। এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব সাফল্য অর্জন করতে হবে। আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে বসে বিন লাদেন তার ঘোষণাপত্রে সই করেছিল।

ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে বিন লাদেনের এই ঘোষণাপত্র বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

১৯৯৭-এর শুরুতে বিন লাদেন তার প্রথম টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দেয় যার ওপর ভিত্তি করে এই পুস্তক। সাক্ষাৎকার দেয়া হয়েছিল সিএনএন-কে জালালাবাদের নিকটে একটি গোপন স্থান থেকে। বিন লাদেন তার পূর্ব ভাষণের

পুনরাবৃত্তি করে আমেরিকান সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণের কথা বলে এবং এও বলে যে–এ বিষয়ে আমেরিকান সিভিলিয়ানদের জীবন সম্বন্ধে কোন গ্যারেন্টি দেয়া যাবে না, এ ধরনের আক্রমণে আমেরিকান সিভিলিয়ানদেরও ক্ষতি হতে পারে। এর কিছুদিন পরেই বিন লাদেন আফগান শহর কান্দাহারের দক্ষিণে চলে যায় যেখানে মোল্লা ওমরের ঘাঁটি।

১৯৯৮–এর ২২ ফেব্রুয়ারিতে বিন লাদেন ইহুদি ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য বিশ্ব ইসলামিক ফ্রন্ট গঠন করার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণায় সহ–স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন মিশরীয় জেহাদ গ্রুপের আইমান আল জাওয়াহিরি, মিশর ইসলামিক গ্রুপের রিফিয়া আহমদ তাহা এবং পাকিস্তানি জঙ্গিদের নেতারা। এই জঙ্গি নেতারা তখন একই ছাতার তলে আশ্রয় নেন প্রথমবারের মত।

যেহেতু বিশ্ব ইসলামিক ফ্রন্ট–এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন–এর অর্থ আল–কায়েদার সন্ত্রাসী গ্রুপের আক্রমণের চাবিকাঠি, তাই সেই ঘোষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করে তুলে ধরছি :

"যেহেতু মহান আল্লাহ আরাবিয়ান পেনিনসুলার বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল ও সাগর–বেলাভূমি পাশাপাশি সৃষ্টি করেছেন, এতকাল তার কোন সমূহ ক্ষতি হয়নি, বর্তমানে যেমন খ্রিস্টান সেনাবাহিনী চারদিকে ঘিরে ধরে জবর দখল করছে, সম্পদ লুটে খাচ্ছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করে মুছে ফেলছে এবং সে দেশের নেতাদের নতজানু করছে...আজ তিনটি বিষয়ে কেউ কোন তর্কবিতর্ক করতে পারবে না যে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে একমত হয়েছেন। সে তিনটি বিষয় হল গত সাত বছর ধরে আমেরিকা ইসলামের এই পবিত্র ভূমি দখল করে রেখেছে—এই আরাবিয়ান পেনিনসুলা। আমেরিকা এই দেশের ও ভূমির সম্পদ লোপাট করছে, চুরি করছে; এদেশের নেতাদের নির্দেশ দিচ্ছে, মোড়লি করছে; দেশের মানুষদের অপমানিত করছে, প্রতিবেশীদের হুমকি দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। এই পেনিনসুলারের ওপর তারা, বলতে গেলে, শাসনও করছে, তাদের আইন খাটাচ্ছে, এবং এই পেনিনসুলাকে অন্যান্য ইসলামী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে...। এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হল আমেরিকা যখন এই পেনিনসুলাতে বসেই ইরাকি মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে, আক্রমণও চালাচ্ছে...। ইরাকি জনগণের ওপর মারাত্মক ও এক মিলিয়নের অধিক মানুষের সর্বস্ব ধ্বংস করার পরও খ্রিস্টান জোট থেমে থাকেনি। দীর্ঘমেয়াদি ব্লকেড করে ইরাকি জনগণের নারী–শিশুসহ চরম দুর্ভোগের পরও তারা সন্তুষ্ট হয়নি। জাতি হিসেবে এই খ্রিস্টান ঐক্য জোট তাদের বিলুপ্তি চায়। যদিও আমেরিকার এই সব আক্রমণ ও যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক, তবুও তারা চায় ইহুদি রাষ্ট্রেকে তুষ্ট করতে এবং প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমি থেকে মুসলিমদের উৎখাত করতে এবং হত্যা করতে।...আমেরিকার এইসব অপরাধ ও অমানবিক কার্যকলাপ আল্লাহ, তার প্রফেট ও মুসলিমদের

বিরুদ্ধেই পরিচালিত...। এর ওপর ভিত্তি করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশমতে, আমরা সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্ব মুসলিমদের আমাদের রায় জানাচ্ছি আমাদের রায় হচ্ছে—আমেরিকা ও তার মিত্রদের সাথে সংঘর্ষে নেমে পড়ো, তাদের হত্যা কর—সে সিভিলিয়ান হোক আর মিলিটারি। এই নির্দেশ দুনিয়ার মুসলিমদের কর্তব্য মনে করে পালন করতে হবে...। আমরা আল্লাহর নামে প্রত্যেক মুসলিমকে আহ্বান জানাই যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর করুণা প্রার্থী; তারা আল্লাহর নামে, যেখানে যেমনভাবে পারে, আমেরিকানদের হত্যা করুক, তাদের সম্পদ কেড়ে নিক। মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিরা নেতা ও যুবকদের, সৈন্যদের ও সমর্থ ব্যক্তিদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করবেন আমেরিকার শয়তান সেনাদের এবং তার মরদুদ মিত্রদের উচিত শিক্ষা দিতে।'

একটি সিআইএ'র বিশ্লেষণে বলা হয় এই সব ফতোয়া এই দলের প্রথম রায় এবং পৃথিবীর সর্বত্র আমেরিকান সিভিলিয়নের ওপর আক্রমণকে স্পষ্টভাবে এর ন্যায্যতা প্রমাণ করে—অর্থাৎ এই ফতোয়া তাদের তরফ থেকে জাস্টিফায়েড। এই ফতোয়া জারি হওয়ার কয়েক মাস পর, বিন লাদেনের লন্ডন প্রতিনিধি খালেদ আল-ফাওয়াজের সাথে দেখা করি। আল-ফাওয়াজকে মনে হল যে সে একটু বিস্মিত ও বিচলিত এই ফতোয়ার বাণী পড়ে। কারণ, ফতোয়াতে একদিকে বহু লোকের সই স্বাক্ষর দেখে, অন্য দিকে সব ধরনের আমেরিকানদের ওপর আক্রমণের আক্রোশ দেখে। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন—সিভিলিয়ন হত্যা করা ইসলামী নীতি নয়।

আল-ফাওয়াজের এই দ্ব্যর্থহীন ভাষ্যে আমার মনে কয়েকটি মারাত্মক প্রশ্ন উদিত হল প্রথম হচ্ছে কোরান অনুযায়ী ধর্মযুদ্ধের ন্যায্যতা কখন হয় এবং এর কারণ কোন সময়ে দেখা দেয় ? তারপর বিন লাদেনের আরব ভূমি থেকে আমেরিকান সৈন্যদের উৎখাতের জন্য যে আহবান বা ডাক, সেটা তার প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য, তার সাথে প্রফেটের মৃত্যুকালীন বাণীর সম্পৃক্ততা বা সূত্র খোঁজার কোন যুক্তি আছে কিনা ? এবং শেষ প্রশ্ন হল—ধর্মযুদ্ধে কি সিভিলিয়ান হত্যা করা জায়েজ যদি না হয় তাহলে বিন লাদেন তার এই অভিযানকে কিভাবে জাস্টিফাই করবে ?

অনেক, এমন কি সময় সময়, ধর্মযুদ্ধের বিপরীতমুখী কারণ বের করা হয়। কোরানের একটি আয়াতে আছে—মুসলিমদের আত্মরক্ষার কারণে যুদ্ধ করতে বাধা নেই—আক্রমণ করা হলে প্রতিহত করার জন্য মুসলিমদের অস্ত্রধারণের অনুমতি দেয়া হল। কারণ তারা অন্যায় আক্রমণ করছে। অন্য স্থানে আছে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুসলিমদের উৎসাহিত করা হচ্ছে—'Muslim are encouraged to engage in aggressive war against infidels' পবিত্র মাস অতিবাহিত হবার পর, মূর্তিপূজকদের হত্যা কর যেখানে পাও (But when the sacred months are past, then kill the idolaters

wherever you find them)। মনে হয় বিন লাদেন এর-ই সূত্র টেনে 'বিশ্ব ইসলামিক ফ্রন্ট'-এর উদ্বোধনীর সময় তার ঘোষণাপত্র জারি করে।

ইঞ্জিলে অবশ্য যীশু (ঈসানবী) বলেছিলেন 'তোমাদের ডান গালে কেউ চড় মারলে, বাম গাল পেতে দিও' এবং আহ্বান জানান 'তোমার শত্রুদের ভালবাস, প্রেমকর'। অবশ্য ভ্রুকুটি করে দুই 'মিলেনিয়াম ধরে বহু মানুষ ও হিদেনদের হত্যা করেছে, ইহুদিদের নির্যাতন ও হত্যা করেছে, মুসলিমদের সাথে শতাব্দি ধরে ক্রুসেড করেছে।

প্রফেট মোহাম্মদ যীশুর প্রশংসা করেছেন ঈশ্বরের মহান মেসেঞ্জারদের মধ্যে একজন বলে। জেসাস সেক্যুলার ও ধর্মীয় ব্যাপারে আলাদা করে বলেছেন— ঈশ্বরের বস্তু ঈশ্বরকে দাও, আর রাজার বস্তু রাজার কাছে। (Render Unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's)। কিন্তু প্রফেট মোহাম্মদ বলেন যা ঈশ্বরের জন্য প্রয়োজন রাজার জন্যও তাই। (The needs of God were automatically the needs of Caesar)। সত্যি বলতে কি, প্রফেট মোহাম্মদ-এর সাফল্য ছিল তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে সমন্বয়তার মধ্যে। প্রফেট মোহাম্মদ-এর মৃত্যুর এক শতাব্দির মধ্যেই, যুদ্ধ এবং ধর্মান্তর পাশাপাশি যাত্রার কারণেই ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তর আটলান্টিক-এর আফ্রিকান উপকূল থেকে ভারতের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের এই স্বর্ণযুগকে স্মরণ করে বিন লাদেন পেছন দিকে হাঁটতে চায়। [একবিংশ শতাব্দির উৎকর্ষতা ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ না করে, ধ্বংসাত্মক কর্মধারার মাঝে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার চেষ্টায় ও উন্মাদনায় মুসলিম বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিলেও এর সম্ভাবনা কতটুকু তার বিশ্লেষণ করছে না।]

তবুও এটা প্রণিধানযোগ্য যে ইসলামে সহিষ্ণুতার একটা ইতিহাস আছে (অবশ্য ইসলাম শব্দের অর্থই শান্তি)। যখন দার্শনিক মোসেস মায়মনাইড্স্ ইহুদিদের নির্যাতনের কারণে দ্বাদশ শতাব্দিতে স্পেনে পালিয়ে গেলেন, তিনি মিশরে আশ্রয় চান। পরে মিশরে এসে সালাহউদ্দিনের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এই দৃষ্টান্ত পরে অনেক দেখা যায়, যখন বহু ইয়োরোপীয় ইহুদি খ্রিস্টানদের নির্যাতন এড়ানোর জন্য অটোম্যান রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলো।

'জেহাদ' শব্দটি এখন পশ্চিমাদের কানে ভয়াবহ ঠেকলেও, এর অর্থ এই নয় যে এটা কেবল বিধর্মী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'প্রচেষ্টা' বা স্ট্রাগ্‌ল এবং প্রায়ই এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নিজের বিবেকের বা নফ্স-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ; আত্মার শুদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা। প্রফেট মোহাম্মদ 'জেহাদ' শব্দের দুটো অর্থ করতেন একটি বড় জেহাদ (জেহাদ-এ-আকবর) অর্থাৎ নিজের অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ; অন্যটি ছোট জেহাদ (জেহাদ-এ-আসগর), ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ। বিন লাদেনের মনে হয়ত এর অর্থ বিপরীত।

আমেরিকান সেনাবাহিনীকে আরাবিয়ান পেনিনসুলা থেকে বিতাড়নের ডাক সেটা কি ? এর উত্তর (যদিও পশ্চিমাদের মনপূত নয়) হচ্ছে, বিন লাদেনের এ ডাকের প্রথাগতভাবে ন্যায্যতা বা জাস্টিফিকেশন আছে। প্রফেসর বার্নার্ড লুই (মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে পণ্ডিত ব্যক্তি) বলেন—খলিফা ওমর (দ্বিতীয় খলিফা) (৩৩৪–৪৪ খ্রিঃ) তার সময়ে এক ডিক্রি জারি করেন যে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের 'হিজাজের পবিত্র ভূমি' থেকে উৎখাত করতে হবে। তার কারণ এই অঞ্চলে মক্কা ও মদিনায় দুটি পবিত্র নগরী অবস্থিত এবং এই ডিক্রি প্রফেট মোহাম্মদ–এর বাণীভিত্তিক। তিনি বলেছিলেন—আরবিয়াতে দ্বিতীয় কোন ধর্ম থাকবে না। (Let there be no two religious in Arabia)। সেই সময় থেকে, লুই বলেন, অমুসলিমদের ঐ অঞ্চলে অস্থায়ী ভিত্তিতে থাকতে দেয়া হয়েছিল বিশেষ সময়ে। যখন গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অটোম্যান রাজ্যকে পরাজিত করে ইরাক, মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন শাসন করছিল, তারা কেবলমাত্র আরাবিয়ার প্রান্তে এডেনে এবং গাল্‌ফ অঞ্চলে শেখের সাথে শান্তি স্থাপনের নামে–মাত্র কর্তৃত্ব করেছে, কিন্তু তাদের শুভবুদ্ধির কারণে কোন সময়ের জন্য ঐ পেনিনসুলায় সৈন্য সমাবেশ করেনি কিংবা ঐ এলাকায় কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়ায়নি। (অবশ্য তার অন্য কারণও ছিল; তেল আবিষ্কৃত হবার পূর্বে আরব ভূমি বিদেশীদের জন্য বন্ধুসুলভ ছিল না, কারণ মরুবাসী বেদুইনরা গোত্র হিসেবে বড় দুর্ধর্ষ জাতি ছিল, যুদ্ধবাজও ছিল)।

বিন লাদেন এই সূত্রে তার দাবিকে খাড়া করতে পারে। আমেরিকার সেনাবাহিনীর এই পবিত্র ভূমি বছরের পর বছর অপ্রতিরোধ্যগতিতে অবস্থান করার বিরুদ্ধে।

ডক্টর সা'দ আল–ফাগিহ (যিনি সৌদি থেকে বিতাড়িত হয়ে লন্ডনে বাস করছেন সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের জন) বিষয়টি আমার কাছে আরো পরিষ্কার করে দেন প্রফেসর লুই–এর মন্তব্যকে। তিনি বলেন : আমি মনে করি না, কোন বিবেচক ব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে বসবেন না, যে আমেরিকা মৌরসী পাট্টা গেড়ে সৌদি আরবে বসে যাবে...যদি তুমি একজন নিবেদিত মুসলিম হও, তাহলে তোমার ধর্মীয় কর্তব্য হবে কোন অমুসলিমকে সামরিক ইউনিফরমে দেশে অবস্থান করতে না দেয়া—বিশেষ করে পবিত্র ভূমে।

ডক্টর আল–ফাগিহ কখনও আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধাবার জন্য ওকালতি করেননি, কিন্তু তার মতামতগুলো অনেক ঈমানদার মুসলিমের বক্তব্যকে প্রতিফলিত করে। যেমন ইয়েমেনের সাবেক ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার আবদুল ওহাব আল–আনেসি বলেন ইউএস মিলিটারি ফোর্সকে কেউ পছন্দ করে না, তাদের সৌদি আরবে অবস্থান করাও ভালো চোখে দেখে না। এই অঞ্চলের একজন ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাট আমাকে বলেছিলেন যে, ১৯৯৮ সালে একজন আমেরিকান সমপর্যায়ী ডিপ্লোম্যাটের সাথে তার আলোচনা হয়েছিল। তিনি তাদের

বলেছিলেন যে তাদের সৌদি আরবে উপস্থিতিটা বেমানান এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং প্রতিক্রিয়া প্রসূত অর্থাৎ কাউন্টার প্রোডাকটিভ। লন্ডনে অবস্থিত একজন আইনজীবী আখতার রাজা বলেন আমার জিনিস আমাদের দিয়ে দাও এবং সৌদি আরব পরিত্যাগ কর। তোমরা কি করতে, যদি আমরা একদল জেহাদি ভ্যাটিকেনে পাঠাতাম ?

অবশ্য, যখন অনেক মুসলিম সৌদি আরবে আমেরিকান সৈন্য অবস্থানের জন্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকানদের নীতির কারণে অসন্তুষ্ট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মাইনরিটি আমেরিকা নাগরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদি মনোভাব পোষণ করে এবং বিন লাদেনের এই আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং আমেরিকার নাগরিকদের বিরুদ্ধে জেহাদে পবিত্র কোরানের বেশ কিছু বাণী সায় দেয় না এবং ইসলামি নীতি বিরুদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোরান স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যুদ্ধের সময় সিভিলিয়ান নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে এবং 'আহলে কিতাবি'দের জন্য সহিষ্ণু হতে বলছে—অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জন্য। ইহুদি ও খ্রিস্টান মুসলিমদের 'কেতাবি লোক' যাদের বিরুদ্ধে বিন লাদেন, সিভিলিয়ান হিসেবে, সহিষ্ণুতা দেখাতেও রাজি নয়।

তাহলে কেন বিন লাদেন আমেরিকার নীতির জন্য হাজার হাজার মার্কিন সিভিলিয়ান হত্যা করতে চাচ্ছে—তার এই সংকল্পকে বুঝতে হলে একজনের বোঝা দরকার যে যুক্তরাষ্ট্রও যে সমান তালে মুসলিম সিভিলিয়ানদের মেরে চলেছে। ২০০১ সালে গ্রীষ্মকালে সারা মধ্যপ্রাচ্যে আল-কায়েদার ভিডিও টেপে, দেখানো হয়েছিল ইসরায়েলে এবং ইরাকের সিভিলিয়ানদের ওপর হামলা এবং হত্যা; বিন লাদেন যার জন্য আমেরিকাকেই দায়ী করে। ইরাকের মরণোন্মুখ শিশুদের ছবি দেখে বিন লাদেন দুঃখের সাথে ক্রোধ ভরে বলেছিল—মিলিয়নের বেশি ইরাকি মারা যাচ্ছে, কারণ তারা মুসলিম এবং এর জন্য প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে সে বলেছিল 'কসাই'। বিন লাদেনের তাই সোর্জা কথা আমেরিকান নাগরিকদের আক্রমণ করা দরকার, এর প্রয়োজন আছে—তারা বুঝুক 'তেঁতো ফলের স্বাদ কেমন, যেমন মুসলিম নাগরিকরা সে ফলের স্বাদ অনেক দিন থেকে গ্রহণ করে আসছে। অদ্ভুত দেখালেও এটা মানতে হয় যে এই 'সাধু' ব্যক্তির 'ধর্মযুদ্ধ' (holy man's holy war) শুধু প্রতিহিংসার কারণে।

১৯৯৮ সালের ১২ মার্চ, প্রায় চল্লিশজন আফগান ওলেমার এক কনফারেন্স ডাকা হল গালফ এলাকায় আমেরিকান সৈন্যের উপস্থিতির বিরুদ্ধে কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় সে প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করার জন্য। বিন লাদেনের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিন লাদেন নিজেই কোরান সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, এমনকি তার গোঁড়া সমর্থকও একথা বিশ্বাস করে যে বিন লাদেনের পক্ষে কোন 'ফতোয়া' জারি করার কর্তৃত্ব বা অথরিটি নেই। কনফারেন্স শেষে আফগান ওলেমাগণ এই সিদ্ধান্তে পৌছান আফগান ওলামারা একমত হয়ে ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী

আমেরিকা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করছে। এপিলের শেষে (১৯৯৮) করাচিতে একদল পাকিস্তানি ওলামা অনুরূপ 'ফতোয়া' ঘোষণা করেন।

এখন বিন লাদেনের পেছনে গ্রহণীয় ধর্মীয় ওলামাদের ঘোষিত 'জেহাদের' সমর্থন এসে গেল দুই মুসলিম দেশ থেকে, বিন লাদেনের সহকারী আতেফ লন্ডনে খালেদ আল-ফাওয়াজকে ফ্যাক্স করে জানালো যে আফগান ওলামাদের ফতোয়ার 'টেক্সট্'-এর পুরোটা 'আল কুদ্স আল-আরাবি' পত্রিকায় যেন ছাপানো হয়। পরে ছাপানো হয়েছিল।

আফগানি-ফতোয়া প্রকাশিত হওয়ার চারদিন পর বিন লাদেন সেই ফতোয়ার সারাংশ বিধৃত করে একটি পত্র প্রকাশ করে। এই পত্রে বিন লাদেন আরাবিয়ান পেনিনসুলাতে আমেরিকানদের দখলদারির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষদের অবহিত করে। 'অপারেশন ডেজার্ট স্টম'-এর কথা উল্লেখ করে বিন লাদেন জিজ্ঞাসা করে—কেন আমেরিকান নারী-সৈন্য আমদানি করা হয়েছে ? সে মনে করে এর উদ্দেশ্য মুসলিম নারী সমাজকে অপমানিত করা। তার এই চিন্তার সমর্থনে মধ্যযুগের এক মুসলিম চিন্তাবিদের উক্তি সে টেনে আনে। সেই চিন্তাবিদ বলেছিলেন মুসলিম পণ্ডিতগণ একমত যে বিধর্মী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য...শেখ ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেন বিশ্বাসের পর, একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ঐসব শত্রুদের বিরুদ্ধ রুখে দাঁড়ানো যারা বিশ্বাসকে ও ধর্মকে নষ্ট করে। বিন লাদেন তার বক্তব্য শেষ করে এই বলে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান যেন গালফে অবস্থিত আমেরিকান সৈন্যদের ওপর ও প্যালেস্টাইনি নেতাদের বন্ধু ইসরাইলিদের ওপর গজব বর্ষণ করুক, আর যেসব মোনাফেক এই সব শত্রুদের ভেতরে ভেতরে সমর্থন করেছে তাদের ওপরও কঙ্করবাহী আবাবিল পক্ষীর বাহিনী আকাশ থেকে পাঠিয়ে ধ্বংস করুক।

বিন লাদেনের এই জেহাদি ডাকের সমর্থনে এবং সৌদি আরব থেকে আমেরিকান সৈন্য বিতাড়নের পক্ষে জুন মাসে (১৯৯৮) মদিনার প্রফেটের মসজিদের ইমাম, শেখ আলী আল হুদাইফি দ্ব্যর্থহীন ভাষণ দিলেন। শুক্রবারের জুমার নামাজে এক খোতবায় বিশাল জনসম্মুখে ইমাম সাহেব যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সমালোচনা করেন এবং সৌদি আরব থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আহ্বান জানান। এই ভাষণের অডিও ক্যাসেট তৈরি করে ত্বরিত গতিতে সারা বিশ্বে প্রচার করা হল, পুস্তিকা ছাপিয়ে বিতরণ করা হল, পাকিস্তানে ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় প্রচারিত হল।

১৯৯৮ সালে ভারত সরকার কয়েকটি ন্যুক্লিয়ার ডিভাইসের চেষ্টা করে। আফগানিস্তানে ফিরে এসে ১৪ই মে, এই ন্যুক্লিয়ার টেস্টকে উদ্দেশ্য করে বিন লাদেন মুসলিম ন্যুক্লিয়ার অস্ত্রের আহ্বান জানিয়েছিল, কেননা 'ভারতীয়' ন্যুক্লিয়ার এক্সপ্লোশন বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিন লাদেন লিখেছিল; গত মঙ্গলবার ভূগর্ভে ৩টি ভারতীয় ন্যুক্লিয়ার, এক্সপ্লোশনে সারা পৃথিবীকে সজাগ করে দিয়েছে...। আমরা মুসলিম জাতিও পাকিস্তানকে আহ্বান জানাই—বিশেষ করে

তাদের সেনাবাহিনীকে জেহাদের জন্য তৈরি থাকতে। তৈরি থাকতে হলে সাথে ন্যুক্লিয়ার বাহিনীও থাকতে হবে।

২৬ মে বিন লাদেন আফগানিস্তানে তার ক্যাম্প আল-বদর-এ (প্রফেটের বদর যুদ্ধের অনুকরণে) এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। পাকিস্তানি সাংবাদিক ইসমাইল খানের মতে বিন লাদেন নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রবেশ করেছিল সম্মেলন কক্ষে। খান বলেছিল—আমি সম্মুখে ধূলি-ঝড় দেখতে পাচ্ছি; তারপর আমি দেখছি তিনটি গাড়ি এগিয়ে আসছে, আর মুখোশপরা অনেক দেহরক্ষী ওসামাকে পরিবেষ্টন করে গিয়ে আসছে। গাড়িগুলো থামলো; ওসামা গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো, যেই মুহূর্তে ওসামা গাড়ি থেকে নামলো, প্রাণকাঁপানো শুটিং শুরু হল। মুখোশপরা দেহরক্ষীরা পর্বতের ওপর দিয়ে আরপিজি, রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড বর্ষণ করলো। খান গুনে দেখেছিল ওসামাকে ঘিরে ছিল চব্বিশজন দেহ রক্ষী।

বিন লাদেন কনফারেন্স রুমে তার নির্ধারিত আসনে বসলো, তার দুই পাশে উপদেষ্টা আইমান আল জওহারি এবং সামরিক কমান্ডার আবু হাফ্স। বিন লাদেন শুরুতেই বললো যে জানুয়ারি মাসে তার কিছু অনুসারী সৌদি আরবে গ্রেপ্তার হয়েছে। কেননা, তাদের কাছে আমেরিকান স্টিনজার মিসাইল এবং অনেকগুলো এস-এ-৭ ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত মিসাইল পাওয়া যায় এবং এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল-কায়েদা বিশ্বের অতি আধুনিক হাতে-বহনকারী এন্টি-এয়ার ক্র্যাফ্‌ট অস্ত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। বিন লাদেন তারপর ঘোষণা দেয় যে বিশ্ব ইসলামিক ফ্রন্টের উদ্বোধন হয়ে গেছে। খান বলেছিল যে বিন লাদেন ইঙ্গিত দিয়েছিল যে তার আল-কায়েদা দল এবার 'অ্যাকশনে' যেতে পারে।

এর নয় সপ্তাহ পরে আফ্রিকাতে আমেরিকার দুটি এম্বেসিতে বোমা ফাটানো হয়।

খান বলেছিল, সেই কনফারেন্সে শেখ ওমর আবদেল রহমানের দুই পুত্রও যোগদান করেছিল। এই শেখ ওমর আবদেল রহমান ম্যানহাটন ল্যান্ড মার্ক উড়িয়ে দেবার প্লট করার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের জেলখানায়। খান বলেছিল শেখের দুই পুত্রের নাম আসাদুল্লাহ এবং আসিম। দু'জনেরই বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে এবং তারা তাদের বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জেহাদে আত্মোৎসর্গ করেছে। এই দুই পুত্র বাপের ছবি লেমিনেটেড করে 'প্রার্থনাসহ' বিলি-বন্দোবস্ত করেছে লোকজনদের মাঝে। এই কার্ড আরবি ভাষায় মুদ্রিত এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদের আহবান জানিয়ে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাদের জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ছিন্নভিন্ন করে দাও, তাদের অর্থনীতি ধ্বংস করে দাও, কোম্পানি পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দাও, তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দাও, তাঁদের চামড়া তুলে নাও, হত্যা কর যেখানে পাও—ভূমিতে, সাগরে, আকাশে...। আল্লাহ, তাদের নির্যাতন ও অত্যাচার করার জন্য তোমাদের হস্তদ্বয় লৌহ কঠিন করে দিক।

আর একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক, রহিমুল্লাহ ইউসুফজাই বিন লাদেনকে গোপনে কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। প্রশ্ন করেছিল : তার পরিবার এখনো তাকে সমর্থন করে কিনা ? বিন লাদেন দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দিয়েছিল। বলেছিল পানির চেয়ে রক্ত গাঢ় এবং আমি অন্তরে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। বিন লাদেনের অর্থ ভাণ্ডারের পরিধি নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। ইউএস সরকারের হিসাব মতে, বিন লাদেনের পারিবারিক কোম্পানির মূল্যায়ন হয়েছিল পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই হিসেবের তিনটি কারণ ছিল (১) কোম্পানিগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় (প্রাইভটলি হেল্ড), (২) পরিবারের সব কিছুই গোপনীয় (সিক্রেটিভ্) এবং (৩) সৌদি আরব পৃথিবীর মধ্যে বন্ধ সমাজের একটি—কেউ সঠিক সংবাদ পায় না, অনুমান করতে হয়। এই অবস্থা আরও গুবলেট হয়ে যায়, পরিবারের প্রধান কোম্পানি ছাড়া (সৌদি বিন লাদেন গ্রুপ) অন্যান্য পারিবারিক ছোট কোম্পানি আছে যেখানে পরিবারের কয়েকজন মিলে টাকা খাটায় (ইনভেস্ট করে)। এই পরিবারে বেশ কয়েকশো সদস্য আছে এবং এদের মধ্যে অনেকের আল-সৌদ রাজবংশের ব্যবস্যার সাথে জয়েন্টভেঞ্চার করা আছে—সেসব কোম্পানির অংশীদারদের কোন পাত্তা পাওয়া মুস্কিল। কার স্বার্থ কোন সূত্রে বাঁধা তার খেই পাওয়া যায় না।

১৯৮০ দশকের প্রথম দিকে, বিন লাদেনের পরিবার মোহাম্মদ বিন লাদেনের এস্টেট সেটেল্ (বন্দোবস্ত) করবার জন্য চেষ্টা করে। ঐ পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ এক মহলের মতে ওসামা তার পিতার এস্টেটে ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অংশের দাবিদার। যাইহোক, ১৯৯১ সালে আমেরিকান কর্মকর্তাদের হিসাব মতে বিন লাদেনের মোট সম্পদের মূল্য দাঁড়াচ্ছে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যাতে মনে হয় সে তার ব্যবসায় বেশ মোটা রকমের অর্থ খাটিয়েছে কিংবা আমেরিকা কর্মকর্তাদের হিসেবে বেশি দেখানো হয়েছে।

এটা নিশ্চিত যে, সুদানে থাকাকালে বিন লাদেন তার অর্থ সমস্যার ব্যপারটা বেশ ভালো মত গুছিয়ে নিয়েছে। আফ্রিকার এম্বেসিতে বোমা ফাটানোর কেসে ম্যানহাটেনে ২০০১ সালে যে বিচার হয়, সেখানে এই অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ১৯৯৪ সালে শেষের দিকে একজন সাবেক আল-কায়েদা সদস্য বলেছিল—অর্থ সম্বন্ধে সঙ্কট দেখা দেয়...তখন বিন লাদেনকে বলতে শুনেছে তার অর্থ নেই, সে তার সমস্ত অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। সাক্ষীতে বলা হয়, অর্থ সঙ্কটের কারণে গ্রুপ সদস্যদের বেতন কর্তন করা হয়। ১৯৯৬ সালে, বিন লাদেনের ব্যক্তিগত পাইলট তার কাছে এসেছিল অর্থের জন্য পাইলটের লাইসেন্স নবায়নের কারণে; কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাকে টাকা দেয়া হয়নি লাইসেন্স নবায়ন করতে।

সেই পাইলট আরও বলেছিল যে, আল-কায়েদা বা গ্রুপ ৫০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত দিতে পারেনি তার স্ত্রী প্রেগনেন্সির জটিলতার জন্য চিকিৎসা খরচ বাবদ। এবং ১৯৯৭ সালে এক পত্রে, কেনিয়ার আল-কায়েদার এক শীর্ষ সদস্য অভিযোগ

করে যে, সে তার অসুস্থ মা'কে দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তাকে বলা হয়, 'ইচ্ছা'টাকে মনে মনে রাখো, কারণ আমাদের মাত্র ৫০০ মার্কিন ডলার হাতে আছে।

এই অর্থ সঙ্কটের দুটি কারণ ছিল।

সৌদি সরকার বিন লাদেনের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় ১৯৯৪ সালে এবং পরে তার সৌদি রাজ্যে বড় ধরনের 'এসেট' 'ফ্রিজ' করে দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৯১ সাল থেকে সুদানে থাকাকালে বিন লাদেন তার বিশাল অংকের অর্থ লগ্নি করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজে যেমন, রাস্তা নির্মাণ, ইসলামিক ব্যাংক, বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রকল্প ইত্যাদি। পরে ১৯৯৬ সালে বিন লাদেনকে সুদান থেকে বহিষ্কার করা হয়, ফলে সুদানে তার নিয়োজিত অর্থ ও প্রকল্পগুলো রয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে এক ঘনিষ্ঠ মহলের ভাষ্য মতে বিন লাদেন এই সঙ্কটময় অবস্থায় লোকসান হয় ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এ সত্ত্বেও বিন লাদেন ১৯৯৬ সালে সুদান ছেড়ে আফগানিস্তানে আসার পর যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানে অবস্থিত এক পশ্চিমা ডিপ্লোম্যাটের বরাত দিয়ে বলা হয়, এ সময়ে বিন লাদেন কান্দাহারে তালিবানদের প্রকল্প তৈরির জন্য মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ছিল একটা জামে মসজিদ, কৃষি প্রকল্প ও ড্যাম (dam)। একজন সিনিয়র আমেরিকান কর্মকর্তা ও মধ্যপ্রাচ্যের ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, বিন লাদেন তার প্রতি দরদী ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোটা অংকের ডোনেশন পেয়েছিল—বিশেষত সৌদি ও গাল্‌ফ ব্যবসাদারদের কাছ থেকে যাতে তার অর্থকষ্ট লাঘব হয়। এই ব্যবসাদারদের মধ্যে একজন ছিলেন খালিদ বিন মাহফুজ। তার ন্যাশনাল কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে বেশ পরিমিত অর্থ বিন লাদেনের জন্য অনুদান স্বরূপ দিয়েছিলেন, এই কারণে সৌদি সরকার তাকে গৃহবন্দি করে। তাছাড়া মুসলিম মানব কল্যাণ সংস্থা থেকেও বিন লাদেনের কাছে মোটা অংকের অর্থ যোগান দেয়া হত।

বিন লাদেনের অর্থ কোন ব্যাংক-এ গচ্ছিত থাকে তার সূত্র পাওয়া মুস্কিল কারণ সে ঐসব ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখেন না যেখানে সুদ পদ্ধতি আছে, আর বিনাসুদে টাকা খাটানোর মত ব্যাংক বিশ্বে পাওয়া মুস্কিল, কারণ ৯৯.৯% ব্যাংকে সুদের কারবার চলে। এই কারণে ইউএস সরকার বিন লাদেনের অর্থের ওপর কোন হাত চালাতে সক্ষম হয়, যদিও প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আফ্রিকাতে মার্কিন এম্বেসী বোম্বিং-এর পর বিন লাদেনের অ্যাসেট 'ফ্রিজ' করার চেষ্টা করেন; এবং ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট বুশও তাই করেছিলেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় কোন ফল হয়নি।

বিন লাদেন অবশ্য ইসলামী নীতি মতে পরিচালিত আমিরাতের দুবাই ইসলামিক ব্যাংক ব্যবহার করে যেখানে সুদের কারবার নেই, আর এই ব্যাংক

আধুনিক বিশ্বে অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ব্যাংক। ১৯৯৯ সালে কিছু আমেরিকান কর্মকর্তা ইউএস সরকারের কাছে আবেদন করে, দুবাই ব্যাংক থেকে যাতে বিন লাদেনের কাছে টাকা-পয়সা লেনদেন না করা হয়। পরবর্তীতে ইউএস সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে 'to clean up the Bank and its reputation'।

প্রশ্ন হলো আফগানিস্তানের মত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান থেকে বিন লাদেনের সাথে কিভাবে ব্যাংক লেনদেন হত ? কিছু অর্থ কোরীয়দের মাধ্যমে আসতো আর কিছু আসতো পুরানো পদ্ধতি 'হাবালা'তে মানিচেঞ্জারের মাধ্যমে। অর্থাৎ হুন্ডির মত ব্যবস্থা যে পদ্ধতি মুদ্দতকাল ধরে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়াতে চালু আছে। এই পদ্ধতিতে শত শত মিলিয়ন ডলারের কারবার হয়, কেউ টিকিটির সংবাদ পায় না।

যদিও আফগানিস্তান বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন তবুও রাজধানী শহর কাবুল খুব দক্ষতার সাথে এই 'হাবালা' পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ টাকা-পয়সার ফলাও কারবার চলে। কাবুল নদীর রাস্তার ধারে ডজন খানেকের বেশি এই ধরনের ছোট ছোট মানি চেঞ্জিং দোকান চুটিয়ে ব্যবসা করছে। আফগানি টাকার বান্ডিল নিয়ে রাস্তার ধারে বসে থাকে এই সব ব্যবসাদার। রাশিয়ার রুবল্ ছাড়া বিশ্বের সব দেশের টাকা এখানে পরিবর্তন করা যায়। কে জানে হয় তো বিন লাদেনের কোন লোক এখান থেকেই মোটা পরিমাণ অর্থ ভাঙিয়ে নিয়ে যায়, দরকার শুধু সেটেলাইট ফোন কল, যা পাশেই কাবুলের সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস থেকেই পাওয়া যায়। এখানে অবশ্য ইউএস সরকারের ক্রুজ মিসাইল চলে না। (সত্যি বলতে কি ১৯৯৮-এর সেপ্টেম্বরে বিন লাদেনের এক শীর্ষ সহযোগী মোহাম্মদ আতেকের সাথে টেলিফোন কল ও ফ্যাক্স চালাচালি হয়, যখন আমি পেশওয়ারে আর সে কাবুলের পোস্ট অফিসে)।

অবশ্য সরকারিভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন নিচে নেমে গেছে যে বিশ্বব্যাংক এর অর্থনীতির সংকেত খুঁজে পায় না; তবে এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য পৌঁছতে দেরি হয় না যা প্রতিবেশী দেশের মাধ্যমে চট করে এসে যায়। সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আমেরিকা ও সৌদি আরব আফগানদের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করতে ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার এদেশে পাম্প করে ঢুকিয়েছিল, তারপর যখন সোভিয়েতরা পালাল দেশ ছেড়ে তখন বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার যুদ্ধবাজদের কাছে বিলি হয়ে যায়, ফলে আফগানিস্তানে একজন মানুষও অস্ত্রহীন ছিল না।

বিন লাদেন ঠিকই বুঝেছিল যে সন্ত্রাসবাদ-এর অর্থই অপ্রতিসম (asymmetrical) যুদ্ধাবস্থা। যার জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভূর্গভে বোমাবাজির খরচ পড়েছিল মাত্র তিন হাজার ডলার, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ ছিল অর্ধ-বিলিয়ন ডলার এবং ছয়জন মানুষের

প্রাণহানি। পাকিস্তান থেকে যখন একজন সুদক্ষ আল-কায়েদা সন্ত্রাসী আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল, তাকে কাজ সারতে দেয়া হয়েছিল ১২ হাজার মার্কিন ডলার।

বড় ধরনের ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নিখুঁত অপারেশনের জন্য যেমন ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এর ঘটনার মত, খরচ খুব বেশি পড়ে না—প্রাক্কলিত খরচ ধরা হয় দুই থেকে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলারের মধ্যে। ষড়যন্ত্রকারী তাদের নিম্নতম খরচ হিসাব করে অপারেশন করে ফেলে। রাতে থাকে ২০ ডলারের হোটেলে, খায় ডেনিতে (Denney) অর্থাৎ ছকুখানসামা লেনের হোটেল, আর খায় কলিমুদ্দির রেস্টুরেন্টে। তাদের হাজার হাজার ডলার খরচ হয় প্যাসেঞ্জার-জেট ফ্লাইট স্টিমুলেটর-এ কোর্স ও শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করতে।

আসল কথা হচ্ছে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত তাদের নিবেদিত প্রাণ হতে হয়, লক্ষ্য একমাত্র টারগেট ধ্বংস করা এবং তা অতি সুনিপুণ ও পরিকল্পিতভাবে। টাকা-পয়সার মাপে এসব কাজ যাকে তাকে দিয়ে করা সম্ভব নয়, যদি না ষড়যন্ত্রকারীর আত্মোৎসর্গের স্পৃহার কমতি থাকে; তাই যারা এসব করে এমন সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করে, তাদের ধরা মুস্কিল—সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা এসব ষড়যন্ত্রকারীদের দক্ষতায় অবাক না হয়ে পারেনি। একমাত্র বিন লাদেনেরই প্রতিভা এই ধরনের আত্মত্যাগী মানুষদের দলে টানার ক্ষমতা রাখে, যারা ধর্মযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শহীদ হতে চায় অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে।

অধ্যায়—ছয়

তদন্ত ও পাল্টা আঘাত : এম্বেসিতে বোমাবর্ষণ

(Investigation and Retaliation : The Embassy Bombings)

A bomb outrage to have any influence on public opinion now must go beyond the intention of vengeance or terrorism. It must be purely destructive.

Joseph Conrad, The Secret Agent

And ye shall khow the truth and the truth shall make you free.

An inscription in the CIA's lobby,
from the Gospel According to St John

১৯৯৮–এর মধ্যে বিন লাদেনের সন্ত্রাসী আক্রমণের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার সময় হল—একই সময়ে তানজিনিয়া ও কেনিয়াতে আমেরিকার দুটি এম্বেসিতে বোমা হামলা হল। কেনিয়া আক্রমণকে আল–কায়েদা সদস্যরা বলল 'হলি কাবা অপারেশন' আর তানজিনিয়ার আক্রমণকে কোডনাম দিল 'অপারেশন আল–আক্‌সা', জেরুজালেমের মসজিদের নামে।

২৮ মে তারিখে বিন লাদেন এবিসি নিউজকে আফগানিস্তানে এক সাক্ষাৎকারে সে পরিষ্কারভাবে বলল যে, আরবে মার্কিন সৈন্যদের অবস্থানের কারণে, সে সমস্ত আমেরিকানের মৃত্যু কামনা করে। আমরা মিলিটারি এবং সিভিলিয়ানদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমেরিকান মাত্রই আমাদের টার্গেট এবং ভবিষ্যদ্বাণী করলো 'আমেরিকার কালো দিবস ঘনিয়ে আসছে।'

কেনিয়া অপারেশনের জন্য পরিকল্পনা চলছিল পাঁচ বছর ধরে। ১৯৯৩–এর শুরু থেকে নাইরোবির এম্বেসিতে আক্রমণ করার পরিকল্পনার ছক আঁকা হয়। ১৯৯৫ সালে আল–কায়েদার এক জর্ডান সদস্য মোহাম্মদ ওহেদ পাকিস্তান থেকে মোম্বাসা, তারপর কেনিয়া ভ্রমণ করলো মাছের কারবার করার নাম করে, তার কয়েক বছর বাদে একইভাবে ইয়েমেনে ইউএসএস কোল–এর কাজ শুরু হয়।

এই কাজ সম্পন্ন করতে ওদেহ-কে কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হয়, মাছের চালান পাঠাতে হয়। কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ওদেহ এক কেনিয়ান বালিকাকে বিয়ে করে ফেলে। এই জানাশোনার জন্য ঐ সময় এলাকায় ওদেহ একজন ধার্মিক ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়; পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ-কালাম নিয়ে সে মগ্ন থাকতো, ধার্মিক মুসলিম বলে খ্যাতি লাভ করে। এমন কি ধূমপান করে না, টেলিভিশনও দেখে না।

ওদেহ একই সময়ে তার আরব্ধ কর্মও নতুন সংসার দুই-ই সমভাবে চালিয়ে গেল। ১৯৯০-র দশকে আফগানিস্তানে তার বিভিন্ন অস্ত্রে ও বিস্ফোরক দ্রব্যে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ নেয়া হয়েছিল। ওদেহ পরে এক এফবিআই এজেন্টকে বলেছিল যে কেনিয়া 'সেল' থেকে 'কোড' মারফত যোগাযোগে 'জেহাদ'কে বল হত 'কাজ চলছে', 'অস্ত্র-শস্ত্র'-কে বলা হত 'যন্ত্রপাতি', 'গ্রেনেড'কে বলা হত 'মালামাল' কারণ তার মাছের ব্যবসায় এসব 'কোড' শব্দ উপযুক্ত ছিল।

কেনিয়া অপারেশন আল-কায়েদার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই আবু উবাইদা আল-বানসিরিকে কেনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল।

আবু উবাইদা একজন সাবেক মিশরীয় পুলিশ কর্মচারী ছিল, ১৯৯০-এর প্রথম দিকে সে বিন লাদেনের 'নাম্বার টু' অর্থাৎ দুই নম্বর লোক এবং গ্রুপের মিলিটারি কমান্ডার। ১৯৯৬-এর বসন্তকালে আল-বানসিরি লেক ভিক্টোরিয়ায় এক ফেরি দুর্ঘটনায় মারা যায়।

আল-বানসিরির স্থলাভিসিক্ত হল হারুন ফাজিল, আল-কায়েদার কেনিয়া সেলের নেতা। ১৯৯৭ সালে নাইরোবিতে তাকে পাঠান হল। আফ্রিকার উপকূলে কমরোজ দ্বীপে ১৯৭২ সালে ফাজিল জন্মগ্রহণ করে। ছোটখাটো মানুষ পাঁচ ফুটের মতো, পেটানো শরীর—মাত্র পনের বছর বয়সে কমরোজ ছেড়ে পাকিস্তানে এসে মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালে বাইশ বছর বয়সে আফগান প্যারামিলিটারি ক্যাম্পে তার প্রশিক্ষণ শুরু হয়, পরে পাঠানো হয় কেনিয়াতে। ফাজিল একবার ধরা পড়ে, বিচার হয়, কিন্তু ছাড়া পায়। ইউএস প্রসিকিউটারের মতে ফাজিল কম্পিউটারে সুদক্ষ ছিল। আর সোহিলি, আরবি, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি খুব ভালো বলতে ও বুঝতে পারতো। সে একজন কট্টর ধর্মীয় মুসলিম, তার বৌ আগাগোড়া বোরখা পরে চলাফেরা করতো।

নাইরোবিতে ফাজিল ওয়াদিহ আল-হাজের সাথে একই বাড়িতে কিছুদিন বাস করেছে। আল-হাজে সুদানে জঙ্গি সৌদিদের সাথে ছিল এবং বিন লাদেনের একান্ত সচিবের কাজ করেছে। আল-হাজে আফ্রিকান এম্বেসিতে বোমা হামলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় তার সাজা হয়েছিল। ১৯৯৮-এর মে মাসে ফাজিল নাইরোবিতে এক নির্জন স্থানে একটা ভিলা ভাড়া করে, যেখানে সে বোমা তৈরি করে। এক মাস কিংবা কিছু পরে তার দু'জন আল-কায়েদা সহযোগী একটা নিশান ট্রাক খরিদ করে মালপত্র বহনের জন্য।

এই বোমা হামলার অন্য আর একজন ষড়যন্ত্রকারী ছিল কেনিয়াতে নাম মোহাম্মদ রাশেদ আল-ওয়াহলি। বিন লাদেনের মত ওয়াহলিও সৌদি ধনী পরিবারের লোক, কিন্তু ধর্মান্ধ। লিভারপুল-এ ১৯৭৭ সালে সে জন্মগ্রহণ করে যখন তার বাবা সেখানে এম. এ করছিলেন। আল-ওয়াহ্লিকে ধর্মীয় শিক্ষায় মানুষ করা হয়েছিল। কিশোর বয়সের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ সম্বন্ধে পুস্তক ও মেগাজিনগুলো সে গিলে ফেলতো—বিশেষ করে বিন লাদেনের 'সার্ভিস অফিস' থেকে যে মেগাজিন বের হয় তার বেশি ভক্ত ছিল। সে মেগাজিনের নাম ছিল 'The love and Hour of the Martyrs' এবং 'জিহাদ' পত্রিকা। সে রিয়াদে একটি ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে এবং ১৯৯৬ সালে ঠিক করেছিল যে বসনিয়া কিংবা চেচনিয়াতে যাবে। কিন্তু পরে মত পাল্টে আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ নিতে যায়।

আফগানিস্তানে খালাদান ট্রেনিং ক্যাম্পে যখন আল-ওয়াহ্লি পৌছল, তাকে বলা হল অন্যান্যদের মত একটা বিকল্প নাম গ্রহণ করতে। কোন একসময়ে তাকে বিন লাদেনের সম্মুখে নেয়া হয়, বিন লাদেন তাকে আরও শিক্ষা গ্রহণ করতে বলে। তাকে নির্দেশ দেয়া হল হাইজ্যাকিং ও কিডন্যাপিং-এ হাত পাকাতে কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয় আমেরিকার মিলিটারি 'বেস' ও এম্বেসি-র ওপর নজর দিতে ও আক্রমণ করতে আর রাষ্ট্রদূতদের অপহরণ করতে। সে খবর সংগ্রহ করা ও নিরাপত্তায় সাংগঠনিক তৎপরতায় পাকা হয়ে গেল। আল-ওয়াহ্লি তখন তালিবানদের সাথে যোগ দিয়ে ক্ষমতা দখলে সহায়তা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করল। তালিবানদের সাথে যুদ্ধ করে সে নাম করে, তারপর আল-কায়েদার 'সেল' অপারেশন ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ নির্দেশনা গ্রহণ করল। তাকে সেখানো হয়েছিল যে 'সেল'-এ কয়েকটি ভাগ আছে—যেমন সংবাদ সংগ্রহ (ইনটেলিজেন্স), প্রশাসন, পরিকল্পনা এবং পালন (এক্সিকিউশন)। কেমন করে একটা টারগেট জরিপ করতে হয় এবং স্থির ও মুভি ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয় তাও শেখানো হল।

এখন আল-ওয়াহ্লি তার অপারেশনের জন্য তৈরি। বোমা হামলার তিন মাস আগে তাকে সর্বশেষ তার মিশন সম্বন্ধে অবহিত করা হয়; আফ্রিকাতে আমেরিকার বিরুদ্ধে হামলা ও আক্রমণ করতে তাকে 'শহীদ' হবার জন্য তৈরি থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। তার ওপর একটি ভিডিও চিত্র ধারণ করা হল, যেমন সে নিজেকে 'Army of liberation of the Islamic Holy Lands'-এর কারণে একজন 'শহীদ' বলে ঘোষণা দেয়। ২৬ মে সে আফগানিস্তানে এক প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিল, সেখানে বিন লাদেন বলেছিল আগামী সপ্তাহে আপনারা 'ভাল সংবাদ' শুনবেন। বিন লাদেনের এই ভাষণকে হুমকি হিসেবে গ্রহণ করে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ১২ জুন বলে আমরা এই ভাষণকে হুমকি রূপে গ্রহণ করে আমরা এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা জোরদার করেছি। উল্লেখ্যযোগ্য যে এই 'নিরাপত্তার' কথায় আফ্রিকা উল্লেখ ছিল না।

আল-ওয়াহ্‌লি নাইরোবিতে পৌঁছলো ২রা আগস্ট, আক্রমণের পাঁচদিন পূর্বে, যখন কেনিয়া সেলের নেতারা সে দেশ ত্যাগ করে আফগানিস্তানে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা জমায়েত হল হিলটপ হোটেলে, যা বেশ্যাদের আড্ডাখানা।

এই হোটেলেই আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া হয়। আল-ওয়াহ্‌লি তার সহযোগী শহীদ ব্যক্তি, যে এই আত্মঘাতী অপারেশনে প্রস্তুত ছিল, তার সাথে দেখা করল। এই সৌদি যুবকের নাম ছিল আজম—এদের উভয়ের পরিচয় হয় আফগানিস্তানে। ৪ আগস্ট-এ উভয়ে মিলে এম্বেসিটা ঘুরে ফিরে দেখলো। ৫ই আগস্ট, বোম্বিং-এর দু'দিন আগে কায়রোতে আল-হায়াত সংবাদপত্র অফিসে জিহাদি দলের আইমান আল-জাওহারি—র কাছ থেকে এক ফ্যাক্স এসে পৌঁছলো-যাতে লেখা ছিল আমেরিকাকে শিগ্রী আক্রমণ করা হবে, কেননা গত জুন মাসে আমেরিকা জেহাদি দলের এক সদস্যকে আলবেনিয়া থেকে মিশর আসার পথে খতম করতে সাহায্য করেছে।

৭ আগস্ট শুক্রবার বেলা ১০-৩০ থেকে ১১ টার মধ্যে বোমা 'ফিট' করা হয় ফাটানোর জন্য, যাতে সে দেশের মুসলিমদের জন্য জুম্মার নামাজ পড়ায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। কেনিয়ার লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম। আজমের কাজ ছিল গাড়িটা এম্বেসিতে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর আল-ওয়াহ্‌লির কাজ ছিল নিরাপত্তা প্রহরীকে এম্বেসি গেটের নিরাপত্তা বাঁশ তুলে ভেতরে পার্কিং লটের কাছে টারগেট পয়েন্টের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে দেয়া। সেটা সে ম্যানেজ করেছিল।

টারগেটের কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে পৌঁছে আজম ও আল-ওয়াহলি দোয়া-দরুদ পড়ে নিজেদের তৈরি করে নিল। সেখানে নিরাপত্তা প্রহরীর কাছাকাছি হতেই আল-ওয়াহ্‌লি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলো, কিন্তু পিস্তল নিতে ভুলে গেল। সুতরাং হাতে গ্রেনেড নিয়ে সে নিরাপত্তা প্রহরীকে গেট খুলে দিতে আদেশ দিল। গেট বন্ধ দেখে আজম কোন প্রকারে তার গাড়ি নিয়ে এম্বেসির কাছাকাছি পৌঁছে তার মিশন পূর্ণ করার মুখে, এদিকে আল-ওয়াহ্‌লি ভাবল শুধু বোমার আঘাতে প্রাণ দেয়া 'শহীদের' কাজ নয়, এটা আত্মহত্যা—যেটা পাপ। তাই সে 'প্রাণপণ ছুটে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে গেল।

বোমাটা TNT ও এলুমিয়াম নাইট্রেট মিশিয়ে তৈরি করা-বেশ কয়েক শতক পাউন্ড ওজন, তৈরি করেছিল আল-কায়েদার মিশরীয় বোমা-বিশেষজ্ঞ আবদেল রহমান। আমেরিকান এম্বেসি নাইরোবি শহরের ব্যস্ত এলাকায়, শহরে দুই মিলিয়ন লোকের বাস। পাশেই রেলওয়ে স্টেশন, সর্বদাই ভ্রমণকারী ও ভেন্ডারদের দ্বারা সমাকীর্ণ; তাছাড়া ঘন ঘন বাস-ভর্তি মানুষ এদিক-ওদিক আসা যাওয়া করছে। বোমা ফাটলো কর্ম দিবসে কর্মব্যস্ততার সময়। পরিকল্পনাটি তেমনি ছিল যেমন ম্যানহাটন গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টারমিনালে শুক্রবারে করা হয়েছিল সকালে, কিংবা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে।

প্রায় সাড়ে দশটার কাছাকাছি সেই অতিকায় বোমা সশব্দে ফর্দাফাঁই হয়ে গেল।

এম্বেসিতে বোমা ফাটানোর কেসে জড়িত লোকদের বিচারের সময় ইউএস সরকারের উকিল প্যাট্রিক ফিউজারেল্ড মন্তব্য করেন—ভাগ্যবানরা অন্ধ হল, আর অভাগাদের মৃত্যু হল। এই বলে তিনি কেসে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা (Summation) করেন।

ফ্রাঙ্ক প্রেসলি এম্বেসি যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। ঐ শুক্রবারের সকালে দশটার পরেই, তিনি ফ্যাক্স মেশিন জড়িত বিষয়ে কিছু সমস্যা নিয়ে মিটিং করছিলেন। বাইরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কিছু লোক ছুটাছুটি করছে কোন একটা পট্‌কার শব্দ শুনে—আসলে তখন আল-ওয়াহ্‌লি তার হাতের গ্রেনেডটা ছুড়ে ফেলে দৌড় মেরেছিল। তারপরেই তিনি এক বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান এবং ...'হঠাৎ আমি দেখলাম শূন্যে ভাসছি...কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললাম। ধাক্কা খেলাম দেয়ালে...দেখলাম ঘরের সিলিং উড়ে গেছে, আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কষ্ট হল—তবু দাঁড়ালাম, কিন্তু যা দেখলাম বিশ্বাস হল না। আমি এদিক-ওদিক চেয়ে চারদিকে মাংসখণ্ড আর রক্তের জমাট হয়ে আছে দেয়ালে...আমার চোয়ালের এক অংশ নেই, আমার ঘাড়ের বেশিরভাগ অংশ উড়ে গেছে...আমি নিচে চেয়ে দেখলাম আমার জামা ফুঁড়ে হাড্ডি বের হয়ে গেছে...আমি কয়েক ছিন্ন পা দেখলাম আর দেখলাম একটা প্যান্টের মধ্যে মানুষের দুটি পা, উত্তমাঙ্গ উড়ে গেছে।'

সাম্মি নাঙ্গা, ৫৩ বছরের এক কেনিয়ান, এম্বেসির পাশের ভবনেই ছিল। সে দুটি বিকট বিস্ফোরণ শব্দ শুনতে পায়, তারপরেই দেয়াল ভাঙা ইট-সুরকির মধ্যে চাপা পড়ে। সে তার পায়ের দিকে চেয়ে দেখে হাড্ডি বের হয়ে গেছে। চাপা পড়া অবস্থা থাকায়, তার হেঁটে চলার শক্তি ছিল না। দু'দিন পর্যন্ত সে ঐ অবস্থায় চাপা পড়ে থাকে, তার উদ্ধারে কেউ আসেনি। একটি মেয়েছেলেও চাপা পড়েছিল তার পাশে কিন্তু উদ্ধার পাবার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়।

ঐদিন সকালে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তার নিজের কামরায় ছিলেন না, প্রতিবেশী একটি কো-অপারেটিভ্ ব্যাংক ভবনে কেনিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে মিটিং করছিলেন।

প্রুডেন্স বুশনেল একজন পাকা ডিপ্লোম্যাট। এম্বেসি সম্বন্ধে অনেকদিন থেকেই শঙ্কিত ছিলেন, কেননা, স্থান খুব কর্মমুখর, শুধু সন্ত্রাস নয়, অপরাধ জগতের তীর্থক্ষেত্র। ২৪ ডিসেম্বরে (১৯৯৭) বুশনেল ওয়াশিংটনে তারবার্তায় জানিয়েছিলেন এম্বেসির নিরাপত্তার ব্যাপারে। তিনি একটা চিঠিও লিখেছিলেন ইউএস সেক্রেটারি অব স্টেটস্ মেডেলিন অলব্রাইটকে ১৯৯৮-এর এপ্রিল মাসে তার আশঙ্কার কথা জানিয়ে। কিন্তু নৈব নৈবচ।

বুশনেলের আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হল। সকালেই মিটিং-এ বসে তিনি দুইবার বিকট শব্দে বোমা ফাটার শব্দ শোনেন। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। তিনি কোন প্রকারে নিজেকে তুলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসার সময় ভীতসন্ত্রস্ত লোক এদিক-ওদিক ছুটছে—'চারদিকে, শুধু রক্ত আর রক্ত; আমি দেখলাম আমার চুলে ও পিঠে যেন কার রক্ত ঝরে পড়ছে।'

প্রেসলি, নাজ্ঞা ও বুশনেল বোম্বিং থেকে জীবন বাঁচতে পারলেও শারীরিক ও মানসিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে গেলেন। ২০১ জন কেনিয়ান ও ১২জন আমেরিকান ভাগ্যবান ছিল না, প্রাণে বাঁচেনি। বোমা-বিচারের প্রসিডিংস কভার করতে গিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস্-এর রিপোর্টার লিখেছিলেন—প্রসিকিউটরের ২১৩জন মৃত ব্যক্তির নাম লিস্ট ও বয়স পড়তে মাত্র বিশ মিনিট লেগেছিল—সে দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক নাম উচ্চারণ কেউ বুঝল, কেউ বুঝল না, অতি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। প্রায় চার হাজার নরনারী জখম হয়েছিল। মৃত্যুর সংখ্যা অসংখ্যা হতে পারতো যদি সেই সাহসী নিরাপত্তা প্রহরী গেটে বাধা না দিত—সন্ত্রাসীদের গন্তব্য ছিল গাড়ি নিয়ে বিল্ডিং-এর গ্যারেজে ঢুকে যাওয়া। যদি তারা সেখানে যেতে পারত, একজন ইউএস ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন, তাহলে গোটা ভবনটি ধূলিস্যাৎ হয়ে যেতো। শুধু এম্বেসি ভবন নয়, পাশের যে সেক্রেটেরিয়েট কলেজ ভবন ছিল, পাঁচ তলা, ভেঙে পড়েছিল, আর ২৫ তলা পাশের ব্যাংক ভবনটিরও বেশ ক্ষতি হয়।

কেনিয়া ব্লাস্ট-এর ন'দশ মিনিট পর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েকশো মাইল দূরে আরো একটা এমেরিকান এম্বেসিতে বিস্ফোরণ হয়। এটা হল তান-জিনিয়ার দারুস সালামে। তানজিনিয়ার বোম্বিং-এর পরিকল্পনা করতে কয়েক মাস লেগেছিল। পাঁচজন মানুষ এই কর্মে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল, তাদের মধ্যে একজন খালফান খামিস মোহাম্মদ এখন ইউএস-এর হেফাজতে। এই ট্রায়ালে সাক্ষী-সাবুদের ভাষ্যে প্রকাশ পায়, কেমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

তানজিনিয়ার উপকূলে এক দ্বীপে দরিদ্র চাষীর ঘরে মোহাম্মদ-এর জন্ম হয় ১৯৭৩ সালে। কিশোর বয়সে যে দারুস সালামে তার ভাই-এর মুদির দোকানে কাজ করতে গিয়েছিল। একুশ বছর বয়সে কিছু টাকা জমিয়ে সে আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণের জন্য যায়। উদ্দেশ্য ছিল বসনিয়া বা চেচনিয়ায় ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয়া। যদিও মোহাম্মদ আফগানিস্তানের কড়া শীতের কথা জানতো না, তবুও সে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায়; সাথে ধর্মীয় শিক্ষা, অস্ত্রচালনা, মিসাইল প্রক্ষেপণ ও বিস্ফোরক দ্রব্যে হাতেনাতে শিক্ষা লাভ করে। মোহাম্মদকে বসনিয়া বা চেচনিয়াতে যাওয়ার জন্য বলা হয়নি, কিন্তু তার ঠিকানা রেখে যেতে বলা হয়, যাতে প্রয়োজনে তাকে ডাকা যায়। আফ্রিকায় ফিরে মোহাম্মদ ওদেহর মত মাছের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং এই উপলক্ষে সোমালিয়া ও কেনিয়ার উপকূল পর্যন্ত ভ্রমণ করে।

১৯৯৮ সালে বসন্তকালে বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, মোহাম্মদের কাছে জেহাদে শরিক হবার জন্য 'হোসেন' নামে একটি লোক সাক্ষাৎ করে। আল-কায়েদা তাদের কাজের জন্য যে ধরনের লোক নিয়োগ করে, মোহাম্মদের টাইপ তেমনি। বিন লাদেন সম্বন্ধে মোহাম্মদের উচ্চ ধারণা ছিল বিজ্ঞ ব্যক্তি ও নেতা হিসেবে, কখনো দেখেনি। বিবিসি ও সিএনএন-এর মাধ্যমে আমেরিকার বিরুদ্ধে তার আক্রমণের ডাক শুনেছে। আফগান ক্যাম্পে আল-কায়েদার দ্বারা তার ট্রেনিং হলেও এই গ্রুপের কার্যাবলী ও সংগঠন সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না এবং আল-কায়েদার সদস্যদের যে গুণাবলী থাকা দরকার তাও তার ছিল না।

সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা ড. জেরল্ড পোস্ট, যিনি সন্ত্রাসীদের মনস্তত্ত্ব বিচার করতেন, মোহাম্মদের ট্রায়ালের সময় তার মৃত্যুদণ্ড রায়ের বিপক্ষে বলেন। এ ব্যাপারে কয়েকটা মিটিং হলে পোস্ট মোহাম্মদ সম্বন্ধে বলেন যে—আল-কায়েদার অন্যান্য সদস্যদের মত মোহাম্মদ আল-কায়েদার যোগ্য রিক্রুট নয়। আমি তাকের ধর্মীয় ব্যক্তি বললেও, ধর্মান্ধ বলি না, কারণ মসজিদের বাইরে তার জীবনযাত্রার ধারা ছিল সাধারণ, হিংস্র নয়। মসজিদের মধ্যে বসনিয়ায় ও চেচনিয়ায় মুসলমানদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে তার ছবি তাকে দেখানো হয় এবং তাকে বলা হয় ঐসব মুসলমানকে সাহায্য করতে। আফগানিস্তানে সে প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিল, শুধু সামরিক শিক্ষা নয়, আদর্শগত শিক্ষা-যার অর্থ মোহাম্মদকে ভুক্তভোগী মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য মগজ ধোলাইয়েরও ব্যবস্থা হয়।

মোহাম্মদ বলেছে—আল-কায়েদার সিনিয়র সদস্যরা তাকে বলেনি তানজিনিয়াতে তাদের কি করতে হবে এবং কোথায় আক্রমণ চালাতে হবে। সম্ভবত এ ভাষণ সত্য, কেননা আল-কায়েদা সেলুলার (মোবাইল ফোন) ভিত্তিতে কাজ করে। তোমাকে ঐটুকুই বলা হয় যা তোমার জানা প্রয়োজন। যাইহোক, সাধারণ এটুকু বোঝা যায় যে, মোহাম্মদ জানত না যে বোমাটি আমেরিকাকে টারগেট করে ফাটানো হবে।

কোনকিছুর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলেও, মোহাম্মদকে দায়িত্ব দেয়া হল বোমা তৈরির সরঞ্জাম বহন করা এবং একটি বাড়ি ঠিক করা যেখানে বোমাটি তৈরি করা হবে। বাড়িটি হবে এক পরিবারের মত ছোট, উঁচু দেয়াল, একটি গেট, আর তার চারপাশ খালি ফাঁকা জায়গা যাতে কেউ টের না পায় বাড়িতে কি ঘটছে বা হচ্ছে। (এইটা ঠিক সেই বাড়ির মত যেখানে দু'বছর পর ইউএসএস কোলেতে বোমা মারার জন্য যে বোমাটি তৈরি হয়)। মোহাম্মদকে আরো দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল গুরুদের জন্য নাস্তা-পানি ঠিক করা, বিশেষ করে ফান্টা পানীয়।

বোমা তৈরির জন্য TNT-র চারশো থেকে পাঁচশো প্যাকেট তৈরি করা হয়, প্রত্যেকটার সাইজ সোডা-ক্যানের মত, তারপর কাঠের ক্রেটবন্ধ করা। এই

কাজে মোহাম্মদকে সাহায্য করতে হয়। TNT-র প্যাকেটগুলো অক্সিজেন-এসেটিলিন সিলিন্ডারের সাথে বাঁধা হয়। সাথে শ'খানেক ডিটোনেটর জোড়া ছিল দুই ট্রাক ব্যাটারির সাথে। আল-কায়েদার বোমা-বিশেষজ্ঞ মিশরীয় আবদেল রহমান যে কেনিয়ার বোমা তৈরি করেছিল, এই কমপ্লেক্স ডিভাইসটি তারই তৈরি।

বোমা আক্রমণের কয়েকদিন পূর্বে বোমা তৈরি করা সেলের চারজন সিনিয়র সদস্য 'হোসেন' ও 'আবদেল রহমান'সহ শহরটি ঘুরে ফিরে দেখলো, যেমনটি কেনিয়াতে এবং পরে ইউএসএস কোলেতে করা হয়েছিল। মোহাম্মদের কাজ ছিল ঐ লোকটিকে সাহায্য করা যে আত্মঘাতী ট্রাক বোমা চালিয়ে এম্বেসিতে ঢুকবে। এই ট্রাক ড্রাইভারের নাম ছিল 'আহমদ দ্য জার্মান'।—অবশ্যই ছদ্মনাম তবে সে একজন মিশরীয় লোক, স্থানীয় ভাষা বলতে পারতো না, যাকে সোয়াহিলি বলা হয়। মোহাম্মদ বোমা-গাড়িতে উঠেছিল, ট্রাকটিতে ছিল একটা ফ্রিজ মাংস বইবার জন্য। মোহাম্মদ এম্বেসি ঢোকার একটু দূরেই নেমে পড়ে তারপর বাকি পথটুকু ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে যায়।

বোমা ফাটে দশটা ঊনচল্লিশ মিনিটে নাইরোবিতে বিস্ফোরণের পর।

এম্বেসির অনুবাদক জাস্টিনা মোবিলু স্মরণ করে বলে আমি হঠাৎ একটা আলোক ঝলকানি দেখলাম তারপরের সেকেন্ডে বজ্রের মত শব্দ হল পনের সেকেন্ডের মত। আমি মনে হল যেন স্বপ্ন দেখছি। যখন আমি চারদিকে চাইলাম, দেখলাম লোকজনের রক্তাক্ত দেহ। এলিজাবেথ স্ল্যাটার এম্বেসির গণসংযোগ বিভাগে কাজ করতো, তার ভাষ্য হল চারিদিকে পিচের মতো কালো মনে হল। সিঁড়ির দেয়ালে মানুষের দেহের ছিন্নভিন্ন টুকরোর অংশ লেগে আছে। স্ল্যাটার যখন বিল্ডিং থেকে বের হয়ে গেটে দেখলেন নিরাপত্তা প্রহরী 'in a terrible state'। তার গায়ে কোন চামড়া নেই। আমার ইচ্ছা হল সে যত শিঘ্রী মারা যায়, তার জন্য মঙ্গল।

এই বোমাতে এগারোজন তানজিনিয়ান মারা পড়ে, বেশিরভাগ মুসলিম; কোন আমেরিকানের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

১৯৯৯-এর জুন মাসে আল-জাজিরা টেলিভিশনে এক ইন্টারভিউতে আরবি ভাষায় বিন লাদেন নাইরোবি বোম্বিং সম্বন্ধে শুকর গুজারি করে বলে : আল্লাহকে ধন্যবাদ তাঁর কৃপায় বোম্বারি সাফল্যজনকভাবেই হয়েছে। এটা তাদের পাওনা ছিল। লেবাননে ও ইসরাইলে আমরা যে গণহত্যার স্বাদ পেয়েছি এবার তারা সে-স্বাদ পেল।

১৯৯৮-এর ৭ আগস্ট শুক্রবার সকালে যে লোকটা করাচির জনমুখর বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনে হেঁটে চলে গেল, গাল্‌ফ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক আসে, তাদের একটির মত দেখতে। মোহাম্মদ ওদেহ একদিন আগে

নাইরোবি ছেড়ে করাচি পৌঁছে দুবাই যাত্রা করবে। নিশ্চয়ই এখন তার স্বস্তি ফিরে এসেছে, ফাঁড়াও যেন কেটে গেল।

কিন্তু ওদেহ্‌র পাসপোর্টের ফটোতে কিছু বোধ হয় গোলযোগ ছিল। এই ফটোতে দাড়ি ছিল, কিন্তু কিছুদিন আগে ওদেহ দাড়ি মুড়িয়ে পরিষ্কার হয়েছে— তাই তাকে ধার্মিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। বিমানবন্দরে দৃশ্যের সাথে পরিচিত এক পাকিস্তানি বলেছেন প্রথমে ওদেহকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সুপারভাইজার দ্বিতীয়বার তার দিকে চেয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। পাসপোর্ট ইয়েমেনি ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু চোহেরায় মিলে না। তাই ওদেহকে একপাশে সরিয়ে ভাল করে চেক করলো। বিবিসিতে নাইরোবি–ঘটনা প্রচারিত হয়েছে। সন্দেহ বশে ইমেগ্রেশনের লোকরা জিজ্ঞাসা করল তুমি কি সন্ত্রাসী ? Are you a terrorist ? এই অবস্থায় মানুষের উত্তর হয়—'অবশ্যই নয়'। কিন্তু ওদেহ কোন জবাব দিল না। যখন ওদেহকে বোম্বিং সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, সে স্বীকার করলো যে এ বিষয়ে সে জড়িত ছিল। এরপর ওদেহ ইমিগ্রেশন অফিসার বোঝাতে চেষ্টা করে যে সে ইসলামের খাতিরে এসব করেছে; সে একজন সাচ্চা মুসলামান। এরপর ওদেহকে ইনটেলিজেন্স কর্মকর্তার কাছে সোপার্দ করা হয় যেখানে ওদেহ সব স্বীকার করে।

পাকিস্তানে গণ–সংযোগ মন্ত্রী মুশাহিদ হোসেন মৃদু হেসে আমাকে বলেছিলেন আমাদের ইমি কর্তৃপক্ষ বেশ দক্ষ নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবসায় নিয়োজিত লোকজন একে জেরা করায়, সে স্বীকার করেছে। এই ঘটনা থেকে শুরু হয় ইউএস সরকারের তদন্ত এবং তদন্ত কর্মকর্তারা প্রমাণ পেয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে এর পেছনে অর্থাৎ এম্বেসিতে বোমা ফাটানোর ব্যাপারে আল–কায়েদার হাত আছে।

যে সপ্তাহে ওদেহ পাকিস্তানে গ্রেপ্তার হয়, সেই সপ্তাহে ইতাদিতে আমেরিকার 'উবার–এলিট' (Uber-elite) মিডিয়া–রাজনীতির মিলন উপলক্ষে জড়ো হয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে বিয়ে হচ্ছে সিএনএন–এর আন্তর্জাতিক করেসপন্ডেন্ট খ্রিস্টিযানা আমানপোর এবং ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের অতিপরিচিত মুখ্য এবং সেক্রেটারি অব স্টেটস্‌ আলব্রাইট–এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টা জামি রুবেনের সাথে। অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রোমের বাইরে, মধ্যযুগে একটি গ্রাম ট্রেভিগনাগোতে লেক ব্রাসিফানোর পাহাড় ঘেরা মনোরম স্থানে। এখানে সব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছে (A-listgathering) যেখানে শুধু আলব্রাইট নয়, জন এফ কেনেডি (জুনিয়ার) ও তার স্ত্রী ক্যারোলিন বিসেট থেকে CEO-র Time-Warner জেরাল্ড লেভিন পর্যন্ত।

এ আনন্দ–উৎসরের মাঝে হঠাৎ খবর এলো যে আফ্রিকার দুটি আমেরিকান এম্বেসিতে ভয়ানক কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। আলব্রাইট মাত্র এসে পৌঁছেছেন,

তিনি রুবেনকে একপাশে ডেকে নিয়ে ক্ষমা চেয়ে বললেন : দেখ ঘটনা মারাত্মক আমি ওয়াশিংটন ফিরে যাচ্ছি। বিয়ে হয়ে গেল আনন্দ উৎসবের মাঝে যেমন পরিকল্পনা ছিল—কারণ বর-কনের (রুবেন ও আমানপোর) এ সময় কোন সংবাদে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত নয়। কারণ তারা এখন স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায়।

রুবেনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জর্ডন তামাঘনি। ইনি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বক্তৃতা লিখে দিতেন। তিনি স্মরণ করে বলেন বিয়ের সময় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই সকলের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল এই বলে যে, এই বোমাবাজির পেছনে নিশ্চয় বিন লাদেনের হাত আছে। তবে অনেকের মতে, ঘটনা সত্যি হলেও তাকে ধরা মুস্কিল। আর একজন অতিথি ছিলেন বিয়েতে, মাইকেল শিহান। আলব্রাইট যখন জাতিসংঘে ইউএস এম্বাসাডার ছিলেন তখন তার সাথে তিনি কাজ করেছেন। শিহানকে আল ব্রাইট বেছে নেন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসে প্রতি-সন্ত্রাসী সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতে। এই নিয়োগটা ক্লিনটন প্রশাসনের জন্য স্বাভাবিক ছিল না, কারণ শিহান রিপাবলিকান এবং অবসরপ্রাপ্ত আর্মি লেপ্টেনেন্ট কর্নেল। তিনি পালামাতে স্পেশাল ফোর্সের টিম-লিডার হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু শিহানের ওপর আলব্রাইটের আস্থা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি প্রতি-সন্ত্রাসী প্রোগ্রামকে জোরদার করতে সমর্থ হবেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে আসা অন্য একজন অতিথি স্মরণ করেন যে শিহান নিশ্চিত ছিলেন যে সৌদি জঙ্গিরা-ই এই বোমাবাজির পেছনে আছে। তিনি বলেন নিশ্চয়, ওসামা বিন লাদেন, ও ব্যাটাকে পাকড়াও করতে হবে।

পরবর্তী দু'বছরে শিহান বহু শক্তি অপচয় করলেন, বুদ্ধি খাটালেন বিন লাদেনকে ধরার জন্য। কিন্তু কেমন করে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবেন যে বিন লাদেন নাটের গুরু ? যদিও বিন লাদেন তখন এখনকার মত বিশ্বখ্যাত সন্ত্রাসী সর্দার ছিল না, তবুও ইউএস সরকারের কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহজনক ব্যক্তি। বিল লাদেনের নাম সন্দেহের তালিকাভুক্ত হয়েছিল ইউএস সরকারের কাছে ১৯৯৩ সালে যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বিল্ডিং-এ বোম্বিং হয়, সাথে অবশ্য আরো প্রায় একশো জনের মতো সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম ছিল কিন্তু নিশ্চিতভাবে চিহ্নিতকরণ করা সম্ভব হয়নি। প্রসিকিউটর বলেছিল আমরা জানি না কেমন করে এই ব্যক্তিকে (বিন লাদেন) এ ব্যাপারে জড়ানো যেতে পারে, তবে মনে হয় ও ব্যাটা জড়িত আছে। অবশ্য কংগ্রেস লাল টাস্ক ফোর্সের সন্ত্রাসবাদের রাডার পর্দায় বিন লাদেনের নাম দৃশ্যমান নয়, যদিও ১৯৯৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কয়েক ডজন নামি সন্ত্রাসীদের নাম পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বিন লাদেনের নাম ছিল না।

১৯৯৫ সালে শেখ ওমর আবদেল রহমান ও অন্য নয়জন ব্যক্তি ট্রায়ালের সময় (পরে নিউইয়র্ক সিটি ল্যান্ডমার্কস প্লটের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত) ইউএস

প্রসিকিউটর সাক্ষীদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে বিন লাদেনকে চেনে কি না! ১৯৯৬ সালে ইউএস এটর্নি অফিস একটি গ্র্যান্ড জুরি–প্যানেল নিযুক্ত করে সৌদি জঙ্গিদের সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য। এফবিআই এজেন্টস্‌কেও বিন লাদেনের বিষয় তদন্ত করতে দেয়া হয়, কারণ এরা প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার কেসটির তদন্ত করেছিল। প্রাথমিক অভিযোগ অবশ্য অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না, শুধু বিন লাদেনের সময় আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পাবলিক স্টেটমেন্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না অথচ এসব স্টেটমেন্টের ওপর ভিত্তি করে কোন ফৌজদারি কেসের চার্জ গঠন করা সম্ভব নয়।

মার্কিন সিআইএ সংস্থাও কয়েক বছর ধরে বিন লাদেন সম্পর্কে কড়া খবরদারি রাখছে। সিআইএ হেড কোয়ার্টার্স–এ ওয়াশিংটন থেকে যেতে হলে তোমাকে পোটোম্যাক নদী (Potomac River) ক্রস করে ঘুরে জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়েতে যেতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব দিকে অবস্থিত অনন্য হাইওয়ের মত এই হাইওয়ে সাদাসিদে নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যে নয়ন জুড়ানো। পনের মিনিটের মধ্যে তুমি ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া পৌঁছে যাবে যেখান থেকেই সিআইএ'র সদর অফিসের গন্ধ পাবে। পার্কওয়েটা ঘুরেই পৌঁছে যাবে নিরাপত্তা চেক পোস্টে। এখানে তোমাকে তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাতে হবে। এটা দরকার তোমার এপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য। তুমি যদি কম্যুনিস্ট বা সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত না হও, নিরাপত্তা প্রহরী তোমাকে প্রধান ভবনের দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ করবে। এই ভবনটি দেখতে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পর্ষদের মত।

ঠাণ্ডাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সিআইএ'র কার্যক্রমের যে র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা ছিল তার কিছুটা নমনীয় ভাব লক্ষ্য করা গেছে। এজেন্সি এখন তাদের নতুন মিশনে নব সংস্কৃতির দ্বার খুলে দিয়েছে। (নিচ তলায় গিফ্‌ট স্টোর আছে, কফি শপ ও কি–রিং ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাচ্ছে।) গত দশ বছরে এজেন্সি ড্রাগ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ব্যস্ত ছিল—সাধারণভাবে বলা হত 'ড্রাগস্ এন্ড ঠাগ্‌স্'। বর্তমান বাজেটে সিআইএ'র বরাদ্দ এগারো বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেনিফিসিয়ারি হয়েছে ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কাউন্টার টেরেরিস্ট সেন্টার (সিটিসি) অর্থাৎ প্রতি–সন্ত্রাসী কেন্দ্র।

প্রথমত, সিআইএ'র বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করতেন বিন লাদেন একজন 'Gucci Terrorist' অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদে অর্থ যোগাদার মাত্র, সন্ত্রাসী অপারেশনে কোন ভূমিকা নেই। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রথম আঘাত হানার পর তাদের মতের পরিবর্তন হয়েছে, কেননা বিন লাদেনের নাম তদন্তে এসে যাচ্ছে পরবর্তী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পেছনে—যেমন ১৯৯৫ সালে সৌদি আরবে আমেরিকান সৈন্যদের হাউজিং কমপ্লেক্সে বোমার আঘাত। এই কারণে প্রতি–সন্ত্রাসী কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা আলাদা ইউনিট গঠন করে শুধু বিন লাদেনকে অনুসরণ করার জন্য। আন্যান্য ইউনিটের মত এই ইউনিটকে তাদের বিদেশে গঠিত কেন্দ্রের কার্যক্রমের

জন্য ওয়াশিংটনের আমলাতন্ত্রকে জবাবদিহি করতে হয় না বা তাদের পরামর্শও দরকার পড়ে না।

প্রতি-সন্ত্রাসী কেন্দ্রকে (সিটিসি) সন্ত্রাসীদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ছাড়াও অনেক কিছু করতে হয় এবং এইসব কাজের জন্য স্টাফ ও কর্মকর্তা নিয়োগ করে সিআইএ'র অপারেশন বিভাগ। এই কেন্দ্র থেকে যে সংবাদ সংগ্রহ করা হয় বিন লাদেন সম্পর্কে, সেই সংবাদের ভিত্তিতে বিন লাদেনের প্রোগ্রামকে বানচাল করার চেষ্টা চালানো হয়।

এই প্রতি-সন্ত্রাসী কেন্দ্র (সিটিসি) অন্যান্য এজেন্সি থেকে বিশেষজ্ঞের সার্ভিস ধার করে তদন্তের কাজে। সিটিসি প্রধানত এফবিআই-এর নিবিড় সংস্পর্শে কাজ করে থাকে—উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেসব কর্মকর্তা সিটিসি পরিচালনা করেন, অধুনা বছরে তারা ব্যুরোর সাথে কাজ করছেন। পূর্বে এই দুই সংস্থার মাঝে একটা রেষারেষির ভাব ছিল, ইতিহাসও আছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই দুই সংস্থার মধ্যে একটা সমঝোতা এসেছে এবং একজোটে কাজ করার প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে। এফবিআই ছাড়া, সিটিসি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সহযোগেও কাজে নেমেছে। উপরন্তু সিক্রেট সার্ভিস, ফেডারেল এভিয়েশন এজেন্সি, ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স, দ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ব্যুরো অফ এলকোহল, টোবাকো ও ফায়ার আর্মস—এদেরও সাহায্য সিটিসি নিয়ে থাকে।

এইসব মহল ও সূত্রে সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও বিন লাদেনের নেট-ওয়ার্ক সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য তথ্য সিটিসি পাচ্ছে না—অন্তত বেশ কষ্টকর। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে আমেরিকান এজেন্সিরা কিছু সংবাদ জোগাড় করেছিল সন্ত্রাসীদের সম্বন্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে যেমন—সিরিয়া, লিবিয়া এবং ইরান। কিছু কিছু দল, যেমন আবু নিদাল সংস্থা (ANO) সাংগঠনিক কাঠামেতে বেশ শক্ত, তাদের বিশ্লেষণ বেশ সিস্টেমেটিক পদ্ধতিগত। কিন্তু বিন লাদেনের নেট-ওয়ার্ক আল্‌গা, বাঁধন শক্ত নয়, কাঠামোর ভিতও নড়বড়ে, তাই এদের অন্তরে প্রবেশ করে সংবাদ সংগ্রহ করা বেশ ক্লেশদায়ক। যদিও ইউএস সরকার কয়েকজন সাবেক আল-কায়েদার সদস্যকে কাছে টানতে সমর্থ হয়েছে সংবাদ জোগাড়ের জন্য। কিন্তু ভেতরে ঢুকে স্পাই-এর কাজ করানো যাচ্ছে না। আর একটা জটিল অবস্থা হল বিন লাদেনের অনুসারীরা কট্টর ধর্মবাদী, সকলেই মগজ ধোলাই করা। একজন আমেরিকান কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন 'পুরানো দিনকালে আমি একজন ধর্মনিরপেক্ষ সন্ত্রাসীর সাথে মাল টানতে পারতাম, কিন্তু বিন লাদেনের লোকদের সাথে মাল টানার কথা উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক।' তাছাড়া তারা বাইরের লোকদের সন্দেহের চোখে দেখে, বিশেষ করে অচেনা লোকদের।

সিআইএ ও এফবিআই-এর সম্মিলিত তদন্ত ছাড়াও, আমেরিকান কর্মকর্তাদের আল-কায়েদাকে সন্দেহ করার জন্য একটি কারণ আছে আফ্রিকা

বোম্বিং সম্বন্ধে। কেনিয়াতে বিন লাদেনের সেলকে বছর খানেক ধরে তদন্ত করে নাইরোবি এম্বেসিতে আক্রমণের আলামত সন্ধান করেছে। ১৯৯৭-এর ২১ আগস্ট, এম্বেসি বোম্বিং-এর প্রায় একবছর আগে, একজন এফবিআই এজেন্ট কেনিয়ান পুলিশের সহযোগে নাইরোবিতে ওয়াহ্দি-এল-হাজের বাড়ি তল্লাশি করেছিল। সেখানে তারা একটি এপল্ পাওয়ার বুক এবং অনেক ঠিকানাসহ বই ও ডায়েরি জব্দ করে। একজন কম্পিউটার টেকনিশিয়ান, কম্পিউটার-এ 'মিরর ইমেজ' করে আল-কায়েদা কেনিয়া সেলের এক নেতার পত্র উদ্ধার করে। ঐ পত্রে সেলের অস্তিত্ব ও পত্র লেখকের বিন লাদেন সম্বন্ধে ও তার আমেরিকানদের আক্রমণ করার ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল, তা বেশ প্রকাশ পায়, যদিও পত্র লেখক উল্লেখ করেছিল যে তখনো পর্যন্ত তার ও তার সহযোগীদের জানা ছিল না কেনিয়ার মিশন সম্বন্ধে এবং দিনক্ষণ ও সম্ভাব্য টারগেট সম্বন্ধে, কারণ তারা নীতি-নির্ধারকদের কেউ না, মাত্র দায়িত্ব পালনকারী।

এছাড়া নাইরোবি আক্রমণের নয় মাস আগে এক মিশরীয় মোস্তফা মোহাম্মদ সাঈদ আহমদ এম্বেসিতে প্রবেশ করে ইনটেলিজেন্স অফিসারকে জানিয়েছিল যে, এই এম্বেসিতে একটা গ্রেনেড ফাটিয়ে নিরাপত্তা প্রহরীকে ও দিকে ব্যস্ত রেখে একটি 'ট্রাক-বোমা' আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং গ্যারেজে ঢুকে যাবে—প্ল্যান ঠিক আল-কায়েদার পরিকল্পনার সাথে পয়েন্টে পয়েন্টে মিলে যাচ্ছে। আহমদ কেনিয়াতে বিন লাদেন কোম্পানিতে কাজ করেছিল, তাই তার সংবাদের কিছু সত্যতা বা ভিত্তি ছিল। আহমদের এই সাবধান বাণী কেউ আমলে আনে নি, সম্ভবত এই কারণে যে প্রত্যেক দিন বিশ্বের সর্বস্থানেই আমেরিকার প্রতিষ্ঠানের ওপর বিন লাদেনের হুমকি হচ্ছে।

পাকিস্তানে ওদেহ্-এর গ্রেপ্তার ছাড়া, আরো সংবাদ হল মোহাম্মদ আল-ওয়াহ্লির সিদ্ধান্ত এম্বেসি ভবন বোম্বিং করা অথবা কেনিয়া আক্রমণে আত্মঘাতী হওয়া। এর পরিবর্তে সে স্থানীয় হাসপাতালে তার চেকিং করায়, সেখানে তার শরীরে কয়েকটি মাইনর ইনজুরি ছিল। ১২ আগস্টে কেনিয়া কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেপ্তার করে, প্রয়োজন মত কাগজপত্র তার কাছে না থাকার জন্য; তারপর তাকে এফবিআই-এর কাছে সোপার্দ করা হয়। এক সপ্তাহ ধরে তাকে জেরা করার পর আল-ওয়াহ্লি এই বোমাবাজির ব্যাপারে তার সম্পৃক্ততা স্বীকার করে ফেলে।

(খালফান খামিস মোহাম্মদ দারুস সালাম ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপ টাউনে চলে গেলেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে বোমা হামলার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর। এফবিআই এজেন্ট শেষে অবশ্য তাকে সেখানে ধরতে সমর্থ হয়, প্রায় এক বছরের পর। তখন খামিস বার্গার বিশ্বে শেফের কাজ করছিলেন।)

আল-ওয়াহ্লির গ্রেপ্তার ও স্বীকারোক্তি এবং এম্বেসি আক্রমণে আল-কায়েদার নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকার ব্যাপারে বক্তব্য রাখার ঘটনা—মূলত আল-কায়েদার

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মত। আমেরিকান কর্মকর্তাদের মতে আল-কায়েদার এই কর্মের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ প্রয়োজন। তারা প্রথমে এটাকে নাম দিল 'অপারেশন ইনফিনাইট রীচ', কিন্তু পরে নাম করলো 'অপারেশন ইনফিনাইট ওভাররীচ'। যেমন বিন লাদেন দুই স্থানে আমেরিকার এম্বেসি আক্রমণ করেছে, তেমনি বিন লাদনের দু'টি প্রতিষ্ঠানে দু'দেশে আক্রমণ করা প্রয়োজন। যেমন ঢিল তারা ছুড়েছে, তেমনি পাটকেলও তাদের মারতে হবে।

'ইনফিনাইট রীচ' আল-কায়েদার ব্যাপারে যে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা উভয়ই বর্তমান, তাছাড়া বিন লাদেনের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা কিভাবে গ্রহণ করা যাবে তাও খতিয়ে দেখার ব্যাপারে। (সন্দেহ নেই যে বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের 'অপারেশন ইনফিনাইট রীচ' সম্বন্ধে যে ধারণা ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার পর তার দীর্ঘসূত্রিতাকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ নির্দিষ্ট আল-কায়েদার টারগেট শনাক্তকরা খুব সহজ হচ্ছে না।)

১৯৯৮-এর ২০ আগস্ট গ্রীষ্মের সকালে হোয়াইট হাউজের প্রেস কোর সদস্যরা ম্যাসাচুসেটের উপকূলে মার্থা ভাইনইয়ার্ডে অবস্থান করছে। তিনদিন আগে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন মনিকা লিউনিস্কির ব্যাপারে এড়িয়ে যাওয়া বক্তব্য রেখে ক্ষমা চেয়ে বললেন এ ব্যাপারে একটা যৌবনবতী রমণীর ব্যাপারে আমেরিকাবাসীর কাছে ভ্রান্তিমূলক খবর রটে গেছে। মন্তব্য রাখার পর প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন করছেন ভাইন ইয়ার্ডে। সাংবাদিকদের আর বেশি কিছু করার ছিল না তাই তারা মুভি-ছবি দেখছিল।

বেলা একটার সময় ক্লিনটনের মুখপাত্র, মাইক ম্যাক-কারি সাংবাদিকদের রসভঙ্গ করে জানালেন যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন। বেলা দু'টার মধ্যে ক্লিনটন ভাবগম্ভীর বক্তৃতা দিলেন উপস্থিত সাংবাদিকদের এবং জানালেন যে আফ্রিকাতে দুটো এম্বেসির ওপর বোমা হামলার প্রতিশোধকল্পে আফগানিস্তানে ও সুদানে বিন লাদেনের টারগেটের ওপর ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এরপর ত্বরিতগতিতে প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউজে ফিরে ওভাল অফিস থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন—আমাদের মিশন অতি পরিষ্কার 'সন্ত্রাস খতম করা'। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসবাদের যে অর্থনৈতিক ও সামরিক মদদ জোগাচ্ছে, সেই ওসামা বিন লাদেনের র‍্যাডিকেল গ্রুপের ওপর আমাদের হামলা চালাতে হবে। হামলা একই সাথে চালানো হবে সুদান ও আফগানিস্তানে বিশেষ করে সুদানের কারখানায় যেখানে কেমিক্যাল অস্ত্রাদি উৎপাদিত হচ্ছে।

বিন লাদেনের ওপর হামলা অস্বাভাবিক। ক্লিনটন প্রশাসন এর পূর্বে সাদ্দাম হোসেন ও স্লোবোদান মাইলোসেভিক-এর বিরুদ্ধে হামলা করেছিল যা যুদ্ধের

শামিল; কিন্তু একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকার শক্তি অপচয় অস্বাভাবিক ব্যাপার বৈ কি!

এর পূর্বে ১৯৯৬ সালে ইউএস সরকারের প্রশাসনিক নির্দেশ ছিল যে বিন লাদেন নয়, তার কাঠামোগত সংস্থাকে ও কারখানাকে ধ্বংস করা; কিন্তু এখন প্রেসিডেন্টের টারগেট হচ্ছে আল-কায়েদার নেতৃবর্গকে খতম করা বা পাকড়াও করা।

একজন সিনিয়র পাকিস্তানি কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে ইউএস সরকার পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার যে করবে আফগানিস্তান আক্রমণ করার জন্য সে সম্বন্ধে কোন পূর্ব সঙ্কেত দেয়া হয়নি। এই কর্মকর্তা আরো বলেছিলেন যে আমেরিকান রণতরী পাকিস্তানের জলসীমায় এপ্রিল মাস থেকেই ঘোরাফেরা করছে। মিসাইল ছোড়ার পরপরই এক আমেরিকান জেনারেল পাকিস্তানে এসে পাকিস্তান সরকারকে অবহিত করেন এই বলে যে তাদের উপস্থিতিতে ভারত সরকারের তরফ থেকে আশঙ্কিত হবার আর অবকাশ নেই।

এরমধ্যে সিআইএ ও পেন্টাগন টারগেট লিস্ট হাজির করল। প্রথম টারগেট হল পূর্ব আফগানিস্তানে বিন লাদেনের ক্যাম্পগুলো। এগুলো ছিল খোস্ত (Khost) শহরের কাছে—ছয়টা 'বেস' ছিল—আল-বদর (১), আল-বদর (২), আল-ফারুক, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু জিন্দাল এবং সালমন ফার্সি। সারা ক্যাম্প কমপ্লেক্সে মোট ছ'শো যোদ্ধা ছিল। দ্বিতীয় টারগেট ছিল সুদানে খার্তুম শহরে কথিত কেমিক্যাল উৎপাদনকারী অস্ত্র কারখানা।

সত্যি বলতে কি, আফগান ক্যাম্পগুলো প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত বহু বছর ধরে। আঘাতের পর পাকিস্তানে আমি ইসলামাবাদের শরিয়া আইনের এক ছাত্র সাইফুল্লাহ গোন্ডালকে ইন্টারভিউ করি। সে ১৯৯২ সালে খোস্তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। তার সাথে আরো প্রায় ১ শো পাকিস্তানি ছাত্র ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স করে সকালে ধর্মীয় শিক্ষা, বিকালে অস্ত্র শিক্ষা, আমাকে সে তার প্রশিক্ষণের ফটোগ্রাফ দেখিয়েছিল—ট্যাঙ্ক প্রশিক্ষণসহ। এই ফটো একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক নিয়েছিল। ১৯৭৭ সালে। এই আক্রমণে ক্যাম্পের বিশজনের মত যোদ্ধা মারা পড়ে, তার মধ্যে আফগানি ও পাকিস্তানি ছিল। মৃত্যের মধ্যে বিন লাদেনের অনুসারীও ছিল তিনজন ইয়েমেনি, দুজন মিশরীয়, একজন তুর্কি—এতে বোঝা যায় যে ক্যাম্পে বিভিন্ন জাতীর নাগরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিল। তবুও অপারেশন কৃতকার্য হয়নি আঘাতের সময়, বিন লাদেন এবং অন্যান্য আল-কায়েদা নেতারা অন্যস্থানে ছিল।

আল-কায়েদার নেতাদের সে-সময় ঐ ক্যাম্প কমপ্লেক্সে না থাকার বিভিন্ন কারণ ছিল। পাকিস্তান থেকে আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের প্রত্যাহার এবং এম্বেসি পরিত্যাগ এবং আক্রমণের একদিন পূর্বে কাবুল থেকে সব ডিপ্লোম্যাটদের পলায়ন বিন লাদেনের উপাদেষ্টাদের সতর্ক করে দেয় যে একটা কিছু মতলব

আমেরিকানদের আছে। এছাড়া মোহাম্মদ ওদেহ ৬ আগস্ট ১৯৯৮ সালে এফবিআই এজেন্টদের বলেছিল, আফ্রিকা এম্বেসি বোম্বিং-এর একদিন আগে, আফগানিস্তানের সংবাদ হল বিন লাদেনের সব লোকজন সরে গেছে এই আশঙ্কায় যে আমেরিকার ইউএস নেভি থেকে মিসাইল আক্রমণ হতে পারে। আল-কায়েদা নেতারা ভালোভাবে জানতো যে তাদের ক্যাম্পে কমান্ডো দিয়ে বা ইউএস এয়ার ফোর্স দিয়ে আক্রমণ হবে না, কারণ এতে তাদের সৈন্যদের প্রাণহানির ভয় ছিল—তারা দূরপাল্লা থেকে, আরাবিয়ান সাগর থেকে নেভি দ্বারা মিসাইল নিক্ষেপের বন্দোবস্ত করবে।

শেষ কারণ ছিল যে, বিন লাদেন খোস্ত ক্যাম্প কমপ্লেক্সে ছিল না। ২৬শে মে সে খোস্ত ক্যাম্প থেকে এক প্রেস কনফারেন্সে এবিসি নিউজকে এম্বেসি বোম্বিং-এর নয়দিন পূর্বে অনেকক্ষণ ধরে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। বিন লাদেন এ বিষয়ে একজন পাকা খেলোয়ার, সুতরাং পাঁচ বছর প্ল্যান করার পর আমেরিকান এম্বেসিতে (আফ্রিকায়) অপারেশন চালায় এবং ২৬ মে এক পাকিস্তানি সাংবাদিককে বলেছিল যে আমার কাছে খবর আছে যে আমেরিকা আমার 'বেস'গুলো আক্রমণ করবে, এ বিষয়ে আমি সতর্ক আছি।

পশ্চিমা নিউজ এজেন্সির এক আফগান রিপোর্টার আক্রমণের একদিন পর ক্যাম্প কমপ্লেক্সে মন্তব্য করল যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সব ভবন, ক্যাম্পের মসজিদ, সব ধ্বংস হয়েছে। মাত্র ৬০/৭০ জন মানুষ বেচে গেছে। রিপোর্টার এই মন্তব্য করাতে সেখানকার লোকজন তাকে আক্রমণ করে সেটেলাইট ফোন ও ক্যামেরা ভেঙে দেয়। দেখে মনে হল হয়ত তাকে খুন করে না ফেলে, কিন্তু কিছু সিনিয়র তালিবান সদস্য তার প্রাণ বাঁচিয়ে দেয়।

আফগানিস্তানে দুটো কি তিনটে মিসাইল পড়ে ফাটে নি। আফগান ও পাকিস্তানি মহল থেকে জানা যায় যে তালিবানরা যেসব মিসাইল ফাটেনি সেগুলো চাইনিজদের কাছে বিক্রি করে দেয়—চাইনিজরা এগুলো কিনেছিল এই মিসাইলের প্রযুক্তিবিদ্যা কপি করার প্রচেষ্টায়। তালিবানরা অবশ্য এ কাহিনী সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেনি, যদিও অস্বীকারও করেনি।

ক্রুজ মিসাইল আক্রমণের পর আমি একজন ১৯ বছরের পাকিস্তানি যুবককে জিজ্ঞাসা করি। তার নাম হাবীব আহমদ। যুবক আক্রমণে মারাত্মকভাবে পুড়ে যায়। আমি তার সাথে পেশওয়ারে এক হাসপাতালে দেখা করি। যুবকটি বলে যে প্রায় পঞ্চাশটির মতো টমাহক ক্রুজ মিসাইলের আক্রমণ হয়। সন্ধ্যার নামাজের পর আমরা কোরান পড়ছিলাম, পড়া শেষ করে আমরা শুতে যাই। তখন জোর আওয়াজ শোনা গেল; যখন মসজিদের বাইরে এলাম দেখলাম ক্রুজ মিসাইলের আক্রমণ। সেখানে অনেক লোক ছিল। আহত হবার পর তারা বেদনায় ক্রন্দন করছিল—যা ছিল সবই পুড়ে গেল।

আহমদ বলল—আমরা তখন ধর্মীয় নির্দেশ ও শিক্ষা-গ্রহণ করছিলাম, যদিও পাকিস্তানে হাজার হাজার ধর্মীয় স্কুল (মাদ্রাসা) আছে। সে বলল—সে ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ ক্যাম্পে বিন লাদেন ও কাশ্মিরিদের জঙ্গি দল হরকতুল মুজাহিদিন-এর সাথে এই ক্যাম্পের যোগাযোগ ছিল।

আহমদ আরও জানায় যে এই আক্রমণে স্থানীয় লোক ও দলের নিম্নস্থানীয় কিছু সদস্য মারা যায়, কোন নেতার কিছু ক্ষতি হয়নি। ক্যাম্পগুলো পুনর্নির্মাণে কোন দেরি হয়নি কারণ মাল-মসলা কাছেই ছিল।

তারপর আক্রমণের দু'সপ্তাহের পর পাকিস্তানি সাংবাদিক রহিমুল্লাহ ইউসুফজাই ক্যাম্পগুলো দেখে রিপোর্ট করল জীবনযাত্রা এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। আমেরিকানরা সুদানে যে আক্রমণ চালিয়েছিল কেমিক্যাল কারখানাকে টারগেট করে, তার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি।

আমেরিকার একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান যে সুদানে যে বিন লাদেনের ব্যবস্থা ছিল তা সুদানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক সুরক্ষিত ছিল। তাছাড়া ঐ কারখানা থেকে সিআইএ'র সদস্য কিছু মাটির নমুনা নিয়ে আসে—সে মাটি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এতে যে IMPTA কেমিক্যাল এজেন্ট আছে তা ক্ষতিকর নয়, শুধু গ্যাস পাওয়া গেছে যা কোন কাজের নয়। এই পরীক্ষায় এমন কিছু পাওয়া যায় নি যা মারাত্মক কিছু, যদিও চার বছর ধরে বিন লাদেন কেমিক্যাল অস্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করছে। সিআইএ কর্মকর্তা, শেষ মন্তব্য ছিল আক্রমণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি।

তবুও সন্দেহ রয়ে যায়, যদিও কোন আলামত পাওয়া যায়নি। প্রমাণে দেখা গেল এটা শুধু ওষুধ তৈরির কারখানা। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর টম টুলিয়াম দুটো ল্যাবরেটরিতে ১৩টি মাটির নমুনা পরীক্ষা করেন, কিন্তু EMPTA-র কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, যা মারাত্মক কিছু, যদিও ইবু প্রফেনের কিছু চিহ্ন ছিল।

সুদান অর্থনৈতিকভাবে বেশ দরিদ্র একটি দেশ। এই কারখানায় দেশের প্রয়োজনীয় অর্ধেক ওষুধ তৈরি হয় এবং ব্যবসায়ীরা ঘন ঘন পরিদর্শন করে; এই ভিজিটরদের মধ্যে একজন ব্রিটিশ শিল্পপতি ছিল, পিটার ককবান, সে বোম্বিং-এর পূর্বে কয়েকবার ভিজিট করেছে, কিন্তু কোন কিছুর আলামত পায়নি। এই প্লান্টটি ডিজাইন করে এক আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার টম জোবে (Tom Jobe)। তার মতে এই কারখানা ওষুধ তৈরি ও কেমিক্যাল অস্ত্র তৈরি করার দ্বৈত পদ্ধতি আছে। সুদানে জার্মান এম্বাসাডার বন-এ জানিয়েছিলেন এই বলে যে, বোম্বিং করে আমেরিকা ভুল করেছে— একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র হেড লাইনে বলেছিল— 'Whoops! What a Cock-up!'

এই কারখানা নিয়ে বিন লাদেনকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়। বোম্বিং-এর কয়েক মাস আগে সালাহ ইদরিস ২৮ মিলিয়ন ডলার দিয়ে এই কারখানা

কিনেছিল। তার মন্তব্য হল যে—সে কখনো বিন লাদেনকে দেখেনি, কিংবা তার সাথে কোন ব্যবসায়ী সম্পর্ক ছিল না। ইদরিস একটা নামি ইনভেস্টিগেটিভ্ ফার্ম ভাড়া করে কারখানা তদন্ত করতে বলে। ক্রল তদন্তের পর শুধু বলে—আব্দুল বাসেত হামজা একজন সুদানিজ সামরিক কর্নেল, যার টেলিকম্যুনিকেশন ব্যবসা ছিল—তার সাথে বিন লাদেন ও ইদরিসের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল।

এর মধ্যে আরও কথা আছে। ইউএস সরকার বোমিং-এর আগে জানতো না যে ইদরিস এই কারখানা কিনেছিল। এর পূর্বে মালিক ছিল বাবুদ পরিবারের, এরা বিন লাদেনের মত হাদ্রামিজ—ইয়েমেনের লোক। এই বাবুদ পরিবার ওসামার সাথে ব্যবসা করেছিল। এটা সত্য যে, এই কারখানার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ইরাকের সাথে ছিল, তবে শুধু গরুর রোগের ওষুধ তৈরি করতো এবং এর একটা শিপমেন্ট জাতিসংঘ অনুমোদন করে ১৯৯৮-এর জানুয়ারি মাসে। সুদান যখন বিন লাদেন ছাড়তে বাধ্য হয় তখন সে আল-শিফা কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের বাসা ভাড়া করে থাকতো। এর সাথে অবশ্য ঐ কারখানার কেমিক্যাল অস্ত্র তৈরি করার কোন যোগাযোগ ছিল না।

মন্টেরি ইনস্টিটিউট ফর নন-প্রলিফারেশন স্টাডিজের একজন গবেষক আল-শিফা কারখানা গভীরভাবে স্টাডি করে বলেন কোন এক সময়ে এখানে হয়ত সামান্য কিছু পরিমাণ VX প্রিকারসার কেমিক্যাল তৈরি হয়েছে বা শিফাতে স্টোর করা ছিল কিংবা এখান থেকে বা এর কাছাকাছি কোন স্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানো হয়েছিল। তবে বর্তমানে এখানে কোন CW কেমিক্যাল অস্ত্র তৈরির আলামত নেই।

সর্বশেষে, জাতিসংঘের এক সাবেক কর্মকর্তা যার ইরাকি অস্ত্র তৈরি প্রোগ্রামের সাথে পরিচয় ছিল—তিনি আমাকে বলেন আমরা সুদানের সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে ইরাকের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তার সন্ধান করেছি—এই সূত্রে ইরাকের সাথে সুদানে যোগাযোগের নথিপত্রও দেখেছি, যদি কোন যোগাযোগ থাকতো আমাদের নজর এড়াতো না। হঠাৎ করে কোন চিন্তা ছাড়াই আমেরিকা সরকার আল-শিফা কারখানা কেমিক্যাল অস্ত্র তৈরি করছে, এ ধারণা কোথায় পেলো, বুঝতে পারি না।

আক্রমণের সাথে সাথে আমেরিকা সরকার আমেরিকা ব্যাংকে গচ্ছিত ইদরিসের ২৪ মিলিয়ান ডলার ফ্রিজ করে দেয় এই সন্দেহে যে ইদরিসের সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ আছে। আটমাস পরে অবশ্য ইদরিসের একাউন্ট মুক্ত করা হয়।

যদিও এই আক্রমণ ফলপ্রসূ হয়নি, পাকিস্তানে অবস্থিত এক পশ্চিমা ডিপ্লোম্যাট আমাকে বলেছিলেন যে এই আক্রমণে একটা কাজ হয়েছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়।

আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে, কড়া সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে—'fuck with us and you have a major problem'।

এই আক্রমণ আর যাইহোক একটা অনিচ্ছাকৃত ফলাফল পাওয়া গেছে—এতে বিন লাদেনের ভাবমূর্তি বেড়ে গেছে। মুসলিম বিশ্বে একজন 'মার্জিনাল ফিগার' ছিল, এখন বিশ্বব্যাপী নাম করা লোক—গ্লোবাল সেলিব্রেটি। ইউএস আক্রমণের কয়েক সপ্তাহ পর আমি যখন পাকিস্তানে গেলাম ইসলামাবাদে বুকশপে বিন লাদেনের জীবনী সম্বন্ধে দুটো বই ছাপানো হয়েছে এবং তা বিক্রি হতে দেখলাম। পাকিস্তানে নতুন প্রজন্মের কাছে ওসামা একটা পরিচিত নাম। পাকিস্তানের এক বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতা মাওলানা সামিউল হক বললেন—এই আক্রমণ বিন লাদেনকে সারা মুসলিম বিশ্বে একটা প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মুসলমানদের যারা ধ্বংস করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। সে একজন বাপের ব্যাটা যে একাই মুসলিম-শত্রুদের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী স্বর তুলে ধরেছে। এখন সে আমাদের নায়ক এবং এই নায়কের স্থানে আমেরিকাই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অধ্যায়–সাত

আমেরিকান সংযোগ : ব্রুকলিন থেকে সিয়াটেল

(The American Connection : From Brooklyn to Seattle)

We have to be terrorists...The Great Allah said, 'Against them make ready your strength to the utmost of your power including steeds of war, to strike terror [into the hearts of] the enemies of Allah and your enemies.'

Sheikh Omar Abdel Rahman, the spiritual
leader of the Egyptian members of al-Qaeda,
Los Angeles, Deember 1992

১৯৮৬–এর নভেম্বরে আলী মোহাম্মদ তিন বছরের চুক্তিতে ইউএস আর্মিতে যোগ দিল। তার প্রথম কাজ হল, নর্থ কেরোলিনায় ফোর্ট ব্র্যাগ–এ ইউএস আর্মি সিক্রেটিভ হেড কোয়ার্টারে কোম্পানি সাপ্লাই করা। জন এফ কেনেডি স্পেসাল ওয়েলফেরার কেন্দ্রে এই উন্নত মানের সৈন্যদের শত্রুর বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক অপারেশন কিভাবে করতে হয় তার প্রশিক্ষণ হল। আলী মোহাম্মদের প্রতিভা ও কর্মে আগ্রহ এক বছরের মধ্যে তাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল অর্থাৎ নিজে সার্জেন্ট হয়েও সে সেমিনারে শিক্ষা দিতে শুরু করল। স্পেশাল ফোর্স পাঠানো হয় খুব সঙ্কটময় পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য। গালফ যুদ্ধের সময়, এর একটা ইউনিট ইরাকের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়েছিল, যেখান থেকে আমেরিকান বোমারুদের টারগেটে 'হিট' করার জন্য নির্দেশ দিত; তারপর ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ হওয়ার পর লাদেনের খোঁজে এদের আফগানিস্তানেও পাঠানো হয়েছিল। তাই ফোর্ট ব্র্যাগ বিন লাদেনের অপারেশন শেষ করার জন্য শেষ ভরসাস্থল। তবুও আলী মোহাম্মদ আল–কায়েদাকে চিহ্নিত করার কাজে একজন অবিচ্ছেদ্য মানুষ।

আমেরিকার অতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে আলী মোহাম্মদের প্রবেশ আল–কায়েদার উল্লেখযোগ্য সাফল্য—যা আমেরিকার অতি সিক্রেটিভ সংস্থার ঢুকতে পেরেছে। এরচেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর আলী মোহাম্মদের জীবনী। আলী মোহাম্মদ

মিশরে ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯৯৮ সালে আমেরিকায় গ্রেপ্তার হয়। মোহাম্মদ আলেকজান্দ্রিয়ায় স্কুলে পড়াশোনা করার পর ১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত মিশরে সামরিক বাহিনীতে কাজ করে মেজর পর্যন্ত পদে উন্নীত হয়। সামরিক বাহিনীতে থাকাকালে সে আলেজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলিজি পড়ে ১৯৮০ সালে ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়।

এক সময়, ১৯৮০ সালে, সে সিআইএ'র কাজে জড়িয়ে তাদের সংবাদদাতা হয়। এটাই তার ইউএস সরকারে প্রথম কাজ। সিআইএ'র সাথে কয়েক সপ্তাহের জন্য সম্পর্ক ছিল, পরে তাকে 'অবিশ্বাসী' সন্দেহ করে সিআইএ তাকে বাদ দেয়। এরপর আলী মোহাম্মদ মিশরে সন্ত্রাসী জেহাদি দলের সদস্য হয়।

১৯৮৪ সালে সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়ে মোহাম্মদ আমেরিকার প্রতি-সন্ত্রাসী বিভাগে কাজ নেয়। পরের বছর সে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করে; কিছুদিন বেকার থাকার পর ক্যালিফোরনিয়ায় সানিভেল-এ আমেরিকান প্রটেকটিভ সার্ভিসে নিরাপত্তা কর্মকর্তার চাকরি নেয়। এই সময়ের মধ্যে লিন্ডা স্যানচেজ নামে এক আমেরিকান মেডিক্যাল টেকনেশিয়ানকে সে বিয়ে করে। তার এই বিয়ে এবং আর্মিতে চাকরি তার আমেরিকার নাগরিকত্ব পেতে দেরি হয় না, যা একজন আল-কায়েদার সদস্যের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্পেশাল ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রে তার এক কলিগকে সে বলেছিল—ইউএস পাসপোর্টের বদৌলতে সে মধ্যপ্রাচ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারবে।

মোহাম্মদ ব্যক্তিগত রেকর্ড ফোর্ট ব্রাগ-এ তাকে একজন বুদ্ধিমান ও বহুমুখী প্রতিভার লোক বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। তার মাতৃভাষা আরবি ছাড়া সে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ও হিব্রু ভাষা বলতে পারতো এবং তার অবসর সময়ে সে ইসলামিক স্টাডিজ-এ পিএইচডি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সে একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক ছিল। সে প্যারাট্রুপারের প্রশিক্ষণ নেয় এবং তার শারীরিক ব্যাপারে খুব ভাল সনদপ্রাপ্ত হয় এবং এম-১৬ রাইফেল ব্যবহারের জন্য বিশেষ ব্যাজ লাভ করে। তার উপরআলারা তার ওপর খুবই সন্তুষ্ট, তার ব্যবহারে ও কাজে।

মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা স্পেশাল ওয়েলফেয়ার সেন্টারে তার শিক্ষকতা জীবনে সাফল্য আনে। সহকারী ইনস্ট্রাক্টররূপে সে সেমিনার পরিচালককে আঞ্চলিক রাজনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সামরিক বিষয়ে ক্লাস তৈরি করতে সাহায্য করে। তার সুপারভাইজার নরভেল ডি এট্কিন মোহাম্মদকে একজন ভাল সৈনিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসেবে স্মরণ করেন। ইসলাম সম্বন্ধে কোন লেকচার থাকলে আমি ঐ ক্লাস মোহাম্মদকে নিতে বলতাম। মোহাম্মদ ইংলিশ থেকে আরবি এবং আরবি থেকে ইংরেজিতে সামরিক ব্রিফিং অনুবাদ করতো এবং স্পেশাল ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রের ছাত্রদের জন্য মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে অনেক ভিডিও টেপ তৈরি করে দেয়। তার মিলিটারি রেকর্ড অনুযায়ী, সে

আফগানিস্তানে সোভিয়েত 'স্পেশাল ফোর্স' সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে সম্ভব হয়েছিল, কেননা আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লাদেনের পক্ষে যোগ দিয়ে সে যুদ্ধে করেছে।

ভিডিও টেপে মোহাম্মদ যে ক্লাস নিত, তাতে নিখুঁতভাবে স্যুট, সবুজ সার্ট ও কালো টাই পরে সজ্জিত থাকতো—ক্লাসের ছাত্রদের প্রথম দর্শনে 'ইমপ্রেস' করার জন্য তার উচ্চতা ছিল ছ'ফুট এক ইঞ্চি এবং ওজন ছিল ১৯০ পাউন্ড। দ্বিতীয়ত তার মধ্যপ্রাচ্যের অভিজ্ঞতা। তার নিখুঁত ইংরেজি বাচন ভঙ্গিমা কখনোও আমেরিকান নীতি বিরুদ্ধ ছিল না।

একটি ভিডিও টেপে তার সুপারভাইজার ডি এটকিন মোহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করেন—ইসরাইল কেন আরব বিশ্বের জন্য হুমকি স্বরূপ ? আমি বলতে চাই—তারা মাত্র তিন মিলিয়ন অধিবাসী। উত্তরে মোহাম্মদ বলেছিল—তিন মিলিয়ন নয়, ইসরাইল আরও লোকসংখ্যা বাড়াতে চায়।

তুমি কি এটা বিশ্বাস কর ? এটকিনের প্রশ্ন।

আমি বিশ্বাস করি, কারণ ঐ এলাকায় ইসরাইল আমাদের অস্তিত্বের জন্য 'মেজর থ্রেট।' তারপর যোগ করে 'আমরা শান্তির জন্য বলি না...কোন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের প্রয়োজন নেই; কিছুই না, কোন আপোসও নয়।'

মোহাম্মদের চারজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তখন বলেছিল যে মোহাম্মদ তার ইসলামী ভাবধারার কথা ঢাকচাপ করেনি। খোলাখুলি মত প্রকাশ করেছে এবং এও বলেছে যে লেবাননে সে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কিন্তু তার মতামত তার সুপারভাইজারদের বিচলিত করেনি। তার এটা ব্যক্তিগত মত। ড. এটকিন পরে বলেন—আটবছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে আমি যে কথা শুনেছি, সেই একই কথা মোহাম্মদ আমাকে বলেছে—তারা বলতো মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমেরিকার নীতি ভ্রান্ত।

লে. ক. রবার্ট এন্ডারসন মোহাম্মদের আসল 'বস' মিশরীয় বিশ্বাসে ও চিন্তাধারায় কিছু অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পান। এন্ডারসন প্রেসিডেন্ট সাদাতের মৃত্যুর ব্যাপারে মোহাম্মদের সাথে কথাবার্তার সূত্র টেনে আনেন। তিনি বলেন—আমি মোহাম্মদকে বলেছিলাম যে আমার মতে আনোয়ার সাদাত প্রকৃত একজন দেশ-প্রেমিক ব্যক্তি। এর জবাবে মোহাম্মদ ঠাণ্ডা স্বরে বলেছিল—না তা সত্য নয়, দেশ-দ্রোহিতার কারণে তাকে চলে যেতে হয়েছিল। এন্ডারসন বলেন—এতে আমার ধারণা জন্মে যে মোহাম্মদ সেই সামরিক ইউনিটের সাথে জড়িত ছিল যা সাদাতের রাজনৈতিক হত্যার কারণ। প্রেসিডেন্ট সাদাত ১৯৮১ সালে তার আর্মি সদস্য দ্বারা মারা পড়েন। এন্ডারসন আরো একটু গভীরে প্রবেশ করে দেখলেন—কেন ১৯৮৮ সালে মোহাম্মদ আর্মি থেকে ছুটি নিয়ে আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। যার জন্য আর্মি কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের সেনা হিসেবে আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য তার

কমান্ডারের অনুমতির দরকার ছিল, যা সে পেত না। এন্ডারসন আরো বলেন— যখন সে ট্রফি নিয়ে আফগানিস্তান থেকে ফিরে এলো, সেই ট্রফির মধ্যে একটা ট্যাকটিক্যাল ম্যাপ ছিল। সে রাশিয়ান স্পেশাল ফোর্সের একটা বেল্টও এনেছিল এবং আমাকে দিয়েছিল—এন্ডারসন স্মরণ করেন। সে বলেছিল যে, সে নিজে একজন রাশিয়ান সৈন্যকে হত্যা করে তার বেল্ট নিয়ে নেয়। এন্ডারসন আমাকে বলেছেন যে মোহাম্মদ-এর রাজনৈতিক মতবাদ ও তার অননুমোদিত আফগানিস্তান ভিজিট—এই দুই ব্যাপারে দুটি অস্বাভাবিক ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট ফাইল করা হয়। কিন্তু কেউ এই রিপোর্ট 'ফলোআপ' করে নি এবং ফোর্ট ব্র্যাগ মুখপাত্র বলেছে যে সেই দুটি রিপোর্টের কোন পাত্তা নেই।

মোহাম্মদকে ১৯৮৯ সালে ইউএস আর্মি থেকে সম্মানের সাথে ডিসচার্জ করা হয়, কিন্তু সামরিক বিষয়ে তার সম্পৃক্ততা খোলাসা হল না। ব্যক্তিগত জীবনে সে তখন আমদানি-রপ্তানির কাজে লিপ্ত ছিল, কিন্তু তার জীবন ছিল মারাত্মকভাবে ষড়যন্ত্র-জড়িত। মোহাম্মদ আফগানি যুদ্ধাঞ্চলে যাওয়া-আসা শুরু করে এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে ইসলামী জঙ্গিদের সে প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহী হয় এবং তৎপরতা চালায়।

ঐ জঙ্গিরা আল-খিফা রিফিউজি ক্যাম্পের সাথে জড়িত ছিল—এই ক্যাম্প ব্রুকলিনে অবস্থিত। এই ক্যাম্প ১৯৮৭ সালে 'আফগান রিফিউজি সার্ভিসেস ইনকর্পোরেটেড'-এর সাথে সংযুক্ত হয়। এদের কাজ হল সোভিয়েত আক্রমণের কারণে আগত আফগান রিফিউজিদের কল্যাণ ও সাহায্যের জন্য সার্ভিস দেয়া। যাইহোক, নেজাত খলিলি বলে এক আফগান-আমেরিকান, যে ১৯৮০-র দশকে আফগান রিফিউজিদের জন্য চাঁদা তোলার কাজে জড়িত ছিল, ১৯৯৩ সালে সে বলেছিল যে সে কোন দিনই আল-খিফা কেন্দ্রের কথা শোনে নি। প্রকৃত ঘটনা যে, এই ছয় বছরের অপারেশনে, আল-খিফার অর্থ সংগ্রাম (আরবিতে), আফগান রিফিউজিদের জন্য কোন কাজই করে নি; পরিবর্তে এই সংস্থা আমেরিকায় সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিম জঙ্গিদের রিক্রুট করতো। এই ক'বছরের প্রায় দুশোর মত জঙ্গি রিক্রুট করে এরা আফগানিস্তানে পাঠিয়েছে।

আল-খিফাতে আলী মোহাম্মদের এক বন্ধু ছিল নাম এল-সাঈদ নুসায়ের। সে ছিল মিশরীয়-আমেরিকান। এক ইহুদি-জঙ্গি রাব্বি মেইর খানকে হত্যা করার অপরাধে অস্ত্র রাখার জন্য নুসায়েরের জেল হয়। সেটা ১৯৯০ সাল। মোহাম্মদ নুসায়েরকে এ ব্যাপারে ভালো প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। খানের হত্যার পর নুসাইর-এর নিউজার্সি এপার্টমেন্ট থেকে কিছু ডকুমেন্ট উদ্ধার করে যা মোহাম্মদ তাকে দিয়েছিল। কিছু ডকুমেন্টে লেখা ছিল 'জন এফ কেনেডি স্পেশাল ওয়েল-ফেয়ার সেন্টার, স্পেশাল ফোর্সেস এয়ারবোন'। এই ডকুমেন্ট নিখুঁত আরবি ভাষায় অনূদিত ছিল, কেমন করে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি উচ্ছেদ ব্যাপারে। এছাড়া, বোমা তৈরির ব্যাপারে

আরবি ভাষায় নির্দেশ। কিন্তু দুভার্গ্য যে তদন্তকারীরা ১৯৯৩ সালে ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারে যে বোমা ফাটানো হয়, সে সম্বন্ধে কিছু উদ্ধার করতে পারেনি।

একই সময়ে আলী মোহাম্মদ নিউইয়র্ক এলাকায় অন্য জঙ্গিদের শিক্ষা দিতে লাগলো যারা আল-খিফাতে আসতো। আর ঘন ঘন আল-কায়েদা কেন্দ্রে আসা-যাওয়া করত—যেমন মিশর, সৌদি আরব, কেনিয়া, তানজিনিয়া, উগান্ডা, সংযুক্ত আরব এমিরেট, মরক্কো, সুদান, পাকিস্তান আফগানিস্তান ও সোমালিয়া—যেখানে দরকার হত, সে যেতো। ১৯৯১ সালে, সে আফগানিস্তানে গেল বিন লাদেনের সুদানে আসার ব্যাপারে। ১৯৯২-এর সেপ্টেম্বরে সে আবার আফগানিস্তানে গেল কমান্ডারদের ট্রেনিং দেয়ার জন্য খোস্তের অঞ্চলে। সে আল-কায়েদার সদস্যদের সার্ভিলেন্স টেকনিক সম্বন্ধেও প্রশিক্ষণ দেয়, কেমন করে গুপ্ত ক্যামেরা চালাতে হয়, ম্যাপ ও নীল নক্সা কেমন করে পড়তে হয়—ব্রিজ ও স্টেডিয়াম সম্বন্ধে টেকনিক ইত্যাদি প্রশিক্ষণও দেয়। ১৯৯৩ সালে চামড়ার ব্যবসার আবরণে মোহাম্মদ কেনিয়া ও নাইরোবিতে ইউএস এম্বেসি সম্বন্ধে একটা সার্ভে করে বিন লাদেনকে জানায়। ১৯৯৪-এ সুদানে বিন লাদেনের ওপর হামলা হওয়ার পর মোহাম্মদ খার্তুমে গিয়ে তার দেহরক্ষীদের ট্রেনিং দেয়। সেই বছরেই বিন লাদেন ও মোহাম্মদকে জিবুতি পাঠিয়ে ফ্রেঞ্চ মিলিটারি 'বেস' ও আমেরিকান এম্বেসি জরিপ করতে বলে সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য।

১৯৯২ এবং ১৯৯৭-এর মধ্যে মোহাম্মদ সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ালো তার জেহাদের কর্তব্য নিয়ে। কাজ শেষ করে ক্যালিফোরনিয়ায় সান্টা ক্লারাতে বসবাস শুরু করে। তার বাড়িআলি তার সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করে, এমন ভদ্র মানুষ হয় না এবং তার চরিত্র পরিশুদ্ধ ইত্যাদি। ১৯৯৭ সালে মোহাম্মদ ও তার স্ত্রী সাক্রামেন্টোতে উঠে গেল, যেখানে সে ভিডিও ও মিউজিক রেকর্ড-এর দোকান ভ্যালি মিডিয়াতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সার্পোট বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগদান করে। সাক্রামেন্টোর তার বাড়ি ১৯৯৮ সালে আগস্টে তল্লাশি হয় এবং সেখানে গুপ্তহত্যা, মিলিটারি সার্ভিলেন্স, সরকারি টারগেট, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে নথিপত্র পাওয়া গেল।

আল-কায়েদার মিশন ও পরিকল্পনা ইত্যাদি করার সাথে সাথে মোহাম্মদ ইউএস সরকারের এজেন্সিগুলোতেও দরখাস্ত করতে ছিল চাকরির জন্য। ১৯৯৩ সালে মোহাম্মদ এফবিআই-এ অনুবাদকের কাজের জন্য ধর্ণা দেয় এবং ১৯৯৫-এ প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্টে প্রহরীর কাজ করার জন্য সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের আবেদন করে। এফবিআই-এর কাজের জন্য তার ইন্টারভিউর সময়, সে ব্যুরো কর্তৃপক্ষকে বিরক্ত করেছিল তার জ্ঞান গরিমার প্রসার সম্বন্ধে এবং বলেছিল যে বিন লাদেন গ্রুপ সৌদি সরকারকে উৎখাত করার পাঁয়তারা করছে। ১৯৯৭ সালে এফবিআই-এ আরো একটি ইন্টারভিউতে, সে স্বীকার করেছিল যে, সে বিন

লাদেনের দেহ রক্ষীদের ট্রেনিং দিয়েছে। ১৯৯৮-এর আগস্ট মাসে এফবিআই-এর সাথে এক ফোনকলে মোহাম্মদ বলেছিল যে, সে জানে কারা কেনিয়া ও তানজিনিয়াতে মার্কিন এম্বেসিতে বোম্বিং করেছে।

১৯৯৮-এর সেপ্টেম্বরে, আলী মোহাম্মদের দ্বৈত-জীবন হঠাৎ থেমে যায় যখন আমেরিকানদের হত্যার পরিকল্পনায় সে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়। যদিও দৃশ্যত বিন লাদেনের অভ্যন্তরীণ চক্রের সাথে জড়িত এবং একজন দস্যু, তখন তার আর শহীদ হবার ইচ্ছা থাকলো না, পরিবর্তে একটা চুক্তিতে আসতে চাইলো। আলী মোহাম্মদ কি ধরনের খেলা খেলতো তা পরিষ্কার হল না। সম্ভবত সে উভয় দিক রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে। যে কারণেই হোক এসবে এটাই প্রমাণিত হল যে এম্বেসি বোম্বিং ব্যাপারে বিন লাদেনের সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ ছিল।

ইত্যবসরে ব্রুকলিনে আল-খিফা কেন্দ্রে যেসব মুসলিম সক্রিয় ছিল তার সংস্থাকে 'সার্ভিসেস অফিস' নাম দিল, যে নামে পাকিস্তানে একটা অফিস ছিল বিন লাদেনের অর্থে পুষ্ট। পাকিস্তানে 'সার্ভিস অফিস' আফগানিস্তানে জেহাদে সাহায্য যোগাতো পরে আল-কায়েদায় পরিণত হয়। ব্রুকলিন অফিস বিন লাদেনের মুখ্য মার্কিন শাখা অফিস, যেখান থেকে আটলান্টা, শিকাগো, কানেকটিকাট এবং নিউজার্সিতে সাব-অফিস খুলে ফেলে (মোটমাট আফগানিস্তানে জেহাদের জন্য আমেরিকাতে ছাব্বিশটি রিক্রুটমেন্ট অফিস খোলা হয়েছিল)। বিন লাদেনের উপদেষ্টা আবদুল্লাহ আজম, সার্ভিস অফিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, ঘন ঘন আমেরিকা যাত্রা করতো চাঁদা তোলার জন্য এবং জেহাদি মানুষের সন্ধানে। তাছাড়া মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা দেয়াও তার কর্তব্যের মধ্যে ছিল। ১৯৯৮ সালে তৈরি এক ভিডিওতে সমবেত কয়েকশো লোকের সম্মুখে বলতে দেখা গেছে যে 'রক্ত এবং শাহাদাত (শহীদ হয়ে যাও) এই দুটির মাধ্যমেই মুসলিম সমাজকে তৈরি করতে হবে।'

আল-খিফা কেন্দ্রের অফিস দেখে মনে হয় যে স্বর্গের রূপ পেয়েছে—ব্রুকলিনের আটলান্টিক এভিনিউ তিন তলা বিল্ডিং-এর ওপর, ফুকিং চাইনিজ রেস্টুরেন্টের ওপরে। তবে সুন্দর মনোরম স্থান। ১৯৮৭ সালে এই কেন্দ্র শুরু হওয়ার পর থেকে মিশরের এক ধর্মান্ধ মুসলিম মোস্তাফা শালাবি পরিচালনা করে। নিউইয়র্কে ১৯৮০ সালে স্থান পরিবর্তন করার আগে কেমিস্ট হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছিল; নিউইয়র্কে এসে সে ইলেকট্রিক কাজের ছোটখাটো চুক্তির ব্যবসা ফাঁদে। শালাবির এক সহকারী জামাল আল-ফজল যুক্তরাষ্ট্রে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আসে এবং এই কেন্দ্রে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। সে নাগরিক হবার কারণে তড়িঘড়ি এক আমেরিকান রমণী বিয়ে করে। অনেক পরে সে আল-কায়েদার সদস্য হয়। আর একজন ছিল মাহমুদ আবু হালিমা যে ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোম্বিং-এ জড়িত ছিল।

এই শালাবি মিশরীয় মোল্লা শেখ ওমর আবদেল রহমান ১৯৯০-এ যুক্তরাষ্ট্রে স্থান করে দিতে সাহায্য করে। ব্রুকলিনের বে রিজ এলাকায় তাকে একটা বাড়ি ভাড়া করে দেয়। পরে এটা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, কারণ মোল্লা শেখ কেন্দ্রের কাছাকাছি মসজিদে ইসলাম প্রচার শুরু করে দেয়; পরে শালাবি ও মোল্লার মাঝে আল-খিফা কেন্দ্রে কেমনভাবে অর্থ ব্যয় করা হবে এই দিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের পর (১৯৮৯) কেন্দ্রে কিছু অর্থ তহবিলে ছিল। একথা জানান আর এক মিশরীয় সাদ এদ্দিন ইব্রাহীম, যার মামাতো বোনকে (ফাস্ট কাজিন) শালাবি ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি বিয়ে করেছিল। শালাবি নীতিবান মানুষ ছিল, সে বললো, বাকি অর্থ কিভাবে খরচ হবে ডোনারদের সাথে পরামর্শ করা দরকার। আবদেল রহমান এতে অসন্তুষ্ট হয়, কারণ ঐ অর্থ দিয়ে সে অন্য কাজ করতে চেয়েছিল। এই কারণে মোল্লার সাথে শালাবির মতদ্বৈধতা হয়।

শেখ রহমান চেয়েছিল টাকাটা যাক মিশরীয় জেহাদি দলের কাছে, আর শালাবি চেয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানদের কাছে। এতে মোল্লা শেখ রহমান প্রচার শুরু করলো যে শালাবি খারাপ মুসলিম (bad Muslim) তার নিউইয়র্কের সব মসজিদে একথা ছড়িয়ে গেল যে আল-খিফা সেন্টারের অর্থ নিয়ে শালাবি নয়ছয় করেছে।

এই অভিযোগের কারণে ১৯৯১-এর ১লা মার্চ শালাবি এক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে। যদিও একাণ্ড শেখের কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা হয়নি।

শালাবির পরিবারের লোক এবং ব্রুকলিনের মুসলিম কম্যুনিটির বিশ্বাস যে শেখ আবদেল রহমানের লোকে শালাবিকে খুন করেছে। ইব্রাহিম আমাকে বলেছিল যে, যদিও তার কাজিন (শালাবির স্ত্রী) প্রথমে এফবিআই'র সাথে দেখা করে নি, কিন্তু পরে বলেছিল যে শেখ রহমানের মুরিদদের মধ্যে থেকে হুমকি ছিল শালাবির জীবনের ওপর। হুমকির পর শালাবি তার স্ত্রী ও তিন বছরের কন্যাকে মিশরে ফিরে যেতে বলে এবং নিজে পাকিস্তানে যাবার ব্যবস্থা করে। এ প্রোগ্রাম ছিল তার মৃত্যুর আগে।

এরপর আলখিফার দেশাশোনার ভার নেয় বিন লাদেনের নিজের মানুষ, ওয়াহিদ এল হাজে। শালাবির মৃত্যুর একদিন পূর্বে হাজে টাকসন থেকে নিউইয়র্কে এসে পৌছায়। সেও আমেরিকান নাগরিক এবং আল-কায়েদার সদস্য কিন্তু জন্ম লেবাননে এক ক্যাথলিক পরিবারে। পরে মুসলমান হয় আমেরিকা আসার পূর্বে। ১৯৭৮ সালে সে লাফিয়াতে বাসিন্দা হয় (লুসিয়ানা)। দেখতে হালকা পাতলা, দাড়ি আছে, অবিন্যস্ত মাথার চুল, লুসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে নগর পরিকল্পনা বিষয়ে পড়াশোনা করে। তার একজন প্রফেসরের মতে, সে রাজনীতি সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আট বছর ডিগ্রি নেবার সময়,

তাকে আফগান জেহাদের জন্য টানা হয়। পেশওয়ারে এসে মুসলিম বিশ্ব লীগ সৌদি চ্যারিটির জন্য কাজ করে। পেশওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জামাল ইসমাইল বলে—হাজে খুব নীরব ব্যক্তি, রোগা পটকা চেহেরা, জঙ্গি বলে মনে হয় না। তার ডান হাত একটু রুগ্ন থাকায় সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

১৯৮৫ সালে, হাজে আরিজোনার মেয়ে এপ্রিল রে-কে বিয়ে করে, যে একজন কনভার্টেড মুসলিম মহিলা। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর কয়েক ডজন অতিথি নিয়ে খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু জীবন বড় কঠিন। ব্রাউন বলেন—এল-হাজে স্ত্রীগতপ্রাণ, চমৎকার পিতা ও জামাই হিসেবে শাশুড়ির প্রিয়পাত্র। শহর পরিকল্পনায় ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও ভালো চাকরি জোটেনি। মাত্র একজন গুদামরক্ষক ছিল ডানকান দোনাটে, পরে ট্যাক্সি চালাতে শুরু করে।

বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তার এক পুত্র হয়, সাত সন্তানের প্রথম সন্তান। পেশওয়ার থেকে তার পরিবার কোয়েটায় উঠে যায়। তার শাশুড়ি মারিয়ান ব্রাউনও পাকিস্তানে চলে এসে কোয়েটার হাসপাতালে নার্সের চাকরি নেয়। পরে মেট্রন হয় দেড় বছরের মধ্যে। তার মতে এল-হাজে আবদুল্লাহ আজমের কাজ করত, পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে বাচ্চাদের বই-পুস্তক বয়ে নিয়ে যেত।

১৯৮৭ ও ১৯৯০-এর মধ্যে এল-হাজে কয়েকবার ব্রুকলিনে আল-খিফা কেন্দ্রে যাওয়া-আসা করে, তারপর কিছুদিনের জন্য, শালাবির মৃত্যুর পর, কেন্দ্রের দেখাশোনার ভার গ্রহণ করে। সেখানে তার মোলাকাত হয় তিন ব্যক্তির সাথে যাদের জেল হয়েছিল ম্যানহাটন ল্যান্ডমার্ক উড়িয়ে দেয়ার জন্য। ১৯৯৩ সালে তার নাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এ বোম্বিং-এর কেসে জড়িয়ে যায়, যখন একজন ধৃত ব্যক্তি তদন্তকারীদের কাছে স্বীকার করে যে সে এল-হাজের কাছ থেকে বন্দুক কিনেছিল। তখন এল-হাজে ছিল সুদানে বিন লাদেনের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি।

১৯৯৬ ও ১৯৯৭-এর মধ্যে এল-হাজে আরলিংটন ও টেক্সাস-এর মধ্যে যাতায়াত করে, যেখানে সে লোনস্টার টায়ার-এ ম্যানেজার রূপে কাজ করে। পরে কেনিয়ায় নাইরোবিতে চলে যায়। টেক্সাসের তার এক বন্ধু বলেছিল—'আমি কেবলমাত্র জানি যে আফ্রিকাতে চ্যারিটির কাজে নিয়োজিত ছিল—আর কি করত জানা নেই। যেখানে সে কাজ করত তার নাম 'Help Africa People' সেখানে শুধু ম্যালেরিয়ার টিকা দেয়া হত। এল-হাজে আমদানি রপ্তানির কাজেও নিয়োজিত ছিল, কিন্তু খুব ভালো করতে পারেনি। ব্যবসা ছিল মণিমুক্তা, কফি এমনকি উট পাখির মাংসেরও। তার বিচারের সময় একটি ফটোতে দেখা গেছে সে একটা উট পাখির পিঠে বসে আছে।

আমেরিকান প্রসিকিউটারের মতে, এল-হাজে তার ব্যবসা, চ্যারিটি ও উট পাখিতে চড়া ছাড়াও আরো কিছু কাজ করতো। কেনিয়াতে সে আল-কায়েদা সেল অফিস প্রতিষ্ঠা করেছিল যখন হারুন ফাজিল-এর সাথে একই বাসায় থাকতো

(চ্যাপ্টার ৬ দ্রষ্টব্য) এবং নাইরোবিতে আমেরিকা এম্বেসি বোম্বিং-এর জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়। যদিও তাকে সরাসরি অভিযুক্ত করা হয়নি বোম্বিং-এর কেসে, তবে তার অসংলগ্ন সাক্ষী দেয়ার জন্য গ্র্যান্ডজুরি আল-কায়েদার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে। তখন জুন ২০০১।

রামজি ইউসুফ, ট্রেড সেন্টার আক্রমণের নেতা খুব বেশি আল-খিফা কেন্দ্রে যেতো না, কিন্তু আল-কায়েদা সদস্যদের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ১৯৯২ সালে যখন সে পেশওয়ার থেকে নিউইয়র্কে আসে, তার সাথে আহমদ আজাজও এসেছিল।

আজাজকে কেনেডি বিমানবন্দরে সাথে সাথে গ্রেফতার করা হয়। ইমিগ্রেশন অভিযোগে আজাজের কাছে তল্লাশিতে পাওয়া যায় একটি এসপ্লোসিভ ম্যানুয়েল, যার শিরোনামে ছিল 'The Basic Rule'। কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমস এর অনুবাদ করে 'Al-Qaeda, The Base'.

ইউসুফ ও বিন লাদেনের সাথে যোগাযোগ ছিল অন্যভাবে। ইউসুফের চাচা জাহিদ শেখ ছিল পেশওয়ারে একটা রিলিফ সেন্টারের ম্যানেজার। সেন্টারটির নাম ছিল 'Mercy International Relief' তখন ১৯৯০-এর মাঝামাঝি। ঐ সময়েই নাইরোবিতে 'Mercy International Relief'-এর এক শাখা নাইরোবিতে 'আল-কায়েদার সাথে সংযুক্ত ছিল। নাইরোবির রিলিফ সেন্টার বিন লাদেন ও আলী মোহাম্মদকে আইডেন্টিটি কার্ড ইস্যু করে। ১৯৯৭ সালে ওয়াদিহ এল-হাজের নাইরোবির বাসাতে তল্লাশি করে পুলিশ চ্যারিটি অফিসে আটটি বাক্সে ব্যক্তিগত কাগজপত্রসহ উদ্ধার করে যা কেন্দ্রের স্টোর রুমে রক্ষিত ছিল। এছাড়া পাকিস্তানে এক মেগাজিন 'The Herald' ১৯৯৩ সালে রিপোর্ট করে যে জাহিদ শেখ 'ইসলামি কো-অরডিনেশন কাউন্সিল' পরিচালনা করত। এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেছিল বিন লাদেনের দক্ষিণ হস্ত ও গুরু আবদুল্লাহ আজম, শহরে অন্য বিশটি চ্যারিটি সেন্টারের কাজ দেখা শোনার জন্য।

ভিনসেন্ট ক্যানিসট্রেরো ১৯৮৮-৯০-এর মধ্যে সিআইএ'র কাউন্টার টেরেরিস্ট সেন্টার-এর পরিচালক ছিলেন। তিনি বলেন : রামজি ইউসুফকে খুঁজলে আফগানিস্তানেই পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন—যে একবার যুক্তরাষ্ট্রে ইউসুফ একদল 'Useful idiots' রিক্রুট করেছিল, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অপারেশন চালানোর কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য এবং এইসব 'idiots'-রা ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ইউসুফ পালিয়েছিল। (ঠিক একই কায়দায় এই ধরনের' ইডিয়ট' ধরা পড়ে আফ্রিকার এম্বেসিও ইউএস কোলে-তে অপারেশনের সময়।

১৯৯৩-এর বোম্বিং-এর পর ইউসুফ গাঢাকা দেয় দুবছরের জন্য-থাইল্যান্ড, ফিলিপিনস্ ও পাকিস্তানে ঘোরাঘুরি করে, তারপর বিন লাদেনের গেস্ট হাউস

পেশওয়াবে ডেরা বাঁধে। এই গেস্ট হাউসের নাম বারেত-উল-শুহাদা (শহীদদের বাড়ি)। আল-কায়েদা সদস্য (আল-খিফার নিয়মিত পরিদর্শক) জামাল আল-ফজল এম্বেসি বোম্বিং বিচারকালে জবাববন্দি দেয় এই বলে যে সে ১৯৮৯ ও ১৯৯১ পাকিস্তানে আফগানিস্তান বর্ডারে সাদ্দা ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিল। এই ক্যাম্প পারাচিনর ট্রাইবাল অঞ্চলে (আফগানিস্তানে ঢোকার মুখে পাকিস্তান অঞ্চল) খুমরাম এজেন্সিতে অবস্থিত। এই ক্যাম্পের প্রেসিডেন্ট ছিল আফগান নেতা আবদুল রসুল সায়েফ, বিন লাদেনের প্রতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। ইউসুফ পরে এক এফবিআই এজেন্টকে বলে যে সে এই ক্যাম্পে ছয়মাস ট্রেনিং নিয়েছে বোমা তৈরির কাজে এবং পরিশেষে একজন নির্দেশক হয় বোমা ব্যবহারের ব্যাপারে। বোমাতে সময় নির্ধারণের জন্য সে ক্যাসিও ঘড়ি ব্যবহার করত আল-কায়েদার প্রতীক হিসেবে।

১৯৯০-এর গোড়ার দিকে ফিলিপিন্সে থাকা কালে, এক ইসলামিস্ট সন্ত্রাসী দলের সাথে দেখা করে। দলের নাম ছিল 'আবু সায়েফ' কমান্ডারের নামের অনুকরণে। এই সন্ত্রাসী দলের জন্য অর্থ যোগাত বিন লাদেনের ভগ্নিপতি মোহাম্মদ খলিফা। ইউএস কর্মকর্তাদের মতে ইউসুফ ও খলিফা উভয়েই এক সময়ে ফিলিপিন্সে ছিল, যদিও খলিফা ইউসুফকে চেনে না বলে জানিয়েছিল।

ফিলিপিন্সে ইউসুফ সন্ত্রাসী দলের অংশীদার ছিল ওয়ালি খান আমিন শাহ, যে আফগানিস্তানে বিন লাদেনের অধীনে প্রশিক্ষণ দিত।

এবিসি নিউজের কাছে এক সাক্ষাৎকারে বিন লাদেন আমিন শাহের কথা স্বীকার করেছিল—বিন লাদেন বলেছিল তার ডাক নাম ছিল 'শের বব্বর' (সিংহ)। আমরা ভালো বন্ধু ছিলাম এবং এক সাথে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। ইউসুফ-এর দলের আর একজন সদস্য ছিল পাকিস্তানি আবদুল হাকিম মুরাদ, যে আমেরিকাতে বাণিজ্যিক বিমানের পাইলট হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। মুরাদ ফিলিপিনো তদন্তকারীদের বলেছিল যে একজন পোপকে হত্যা করা এবং বহু আমেরিকান জেট বিমান হাইজ্যাক করা ছাড়াও সে সিআইএ'র সদর অফিস ভার্জিনিয়াতে একটা প্লেন ক্র্যাশ করার পরিকল্পনা করে।

ইউসুফের দুর্ভাগ্য যে, *ফিলিপিনো পুলিশ* ১৯৯৪ সালে ঘটনাক্রমে তার ম্যানিলা এপার্টমেন্টে ধোঁয়া দেখে তাড়া করলে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার কম্পিউটার ও অন্যান্য গোপনীয় নথিপত্র জব্দ হয়, যেসব নথিতে জেট বিমান ধ্বংস ও পোপ জনপল (২)-এর হত্যার কথা প্রকাশ পায়। এক বছর পর এফবিআই এজেন্ট ইউসুফকে পাকিস্তানে ইসলামাবাদে পাকড়াও করে। তার পকেটে বিন লাদেনের গেস্ট হাউসের ঠিকানা ছিল।

২০০০-এর এপ্রিল মাসে আবু সায়েফের সাথে ইউসুফের যোগাযোগ আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যখন আবু সায়েফের দল ফিলিপিন্সের দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জে এক স্কুল থেকে পঞ্চাশজনকে অপহরণ করে এবং আমেরিকার জেলখানা থেকে ইউসুফের মুক্তির দাবি জানায়, যেখানে ইউসুফ ২৪০ বছর জেল মেয়াদ খাটছিল।

আমেরিকাতে আল-কায়েদার পুরা সদস্য ও অনুসারীর সংখ্যা কত তার হিসাব দেয়ার জন্য এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, তবে কয়েকজনের খবরাখবর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু তুলে ধরা যায়, বিধর্মীদের দেশে তারা কেমনভাবে দিনগুজরান করেছে।

ডিজ্‌নি ওয়ার্ল্ডে বিন লাদেনের কোন অনুসারীর সাক্ষাৎ আশা করা যায় না। কিন্তু এক সময় এখানেও আমেরিকান নাগরিক, ইহাব আলী নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। আমেরিকায় পড়াশোনা করে, আলী অরল্যান্ডে ও ফ্লোরিডায় হরেক রকমের কাজ করেছে যেমন—ম্যাজিক কিংডম, শেরাটন হোটেল, ওয়েলস্ ফারগো ব্যাংক এবং ট্যাক্সি ড্রাইভার। ১৯৮৯-এ সে পেশওয়ারে যায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য। চার বছর পর, সে একটি আমেরিকান এয়ারপ্লেন খরিদ করতে সাহায্য করে সুদানে আল-কায়েদার জন্য। আলী ওকলাহামায় নর্মান স্কুলে প্লেন চালনায় প্রশিক্ষণ নেয় এবং ১৯৯০-এ সে কেনিয়াতে চলে যায় আল-কায়েদার বিমান চালকের কাজ নিয়ে।

আল-ওয়াদিহ এল-হাজের সাথে যোগাযোগ ছিল। ১৯৯৯ সালে সে ধরা পড়ে কিন্তু কর্তৃপক্ষের সাথে 'ধর্মীয় কারণে' কোন সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। কিন্তু তার আল-কায়েদাতে পাইলট হিসেবে অভিজ্ঞতার বিষয়টি ১১ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণের পর গুরুত্ব লাভ করে।

বিন লাদেনের আর একজন আমেরিকান অধিবাসী রিক্রুট ছিল রাইদ হিজাজী। ১৯৬৯-এ সে ক্যালিফোর্নিয়াতে জন্মগ্রহণ করে; রাইদ আসলে প্যালেস্টাইনি বংশোদ্ভূত। সাক্রামেন্টোতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায়, হিজাজী ইসলামী জঙ্গি হয় এবং পূর্ব আফগানিস্তানে খোস্তে (Khost) বিন লাদেনের ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেয়। ১৯৯৭ বোস্টনে ক্যাব-ড্রাইভার থাকার সময়, হঠাৎ জর্ডন চলে যায়, সেখানে আম্মানে খ্রিস্টানদের এক পবিত্র স্থানে মিলেনিয়াম উৎসব পালনের সময় বোমা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা জর্ডন তদন্তকারীদের জন্য ভেস্তে যায়, কাজ হয়নি। হিজাজীকে গ্রেপ্তার করা হয় সিরিয়াতে ২০০০-এ অক্টোবরে। তারপর জর্ডনে আনা হলে সে সব কিছু অস্বীকার করে।

এছাড়া কিছু আফ্রিকান-আমেরিকান আল-কায়েদা সদস্য ছিল, যাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। আল-কায়েদা পাইলট লা হুসাইনী খেরেচতো এম্বেসি বোম্বিং বিচারের সময় বলেছিল যে সুদানে থাকাকালে 'কিছু' আফ্রিকান-আমেরিকান সদস্য ১৯৯০-র দশকে ছিল। এই পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মিরকে দু'জন আফ্রিকান-আমেরিকান সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যখন ১৯৯৮-এর মে মাসে মির আফগানিস্তানে বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করে।

২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরে যে মারাত্মক আক্রমণ হয় আমেরিকায় সেটা কিন্তু প্রথম আক্রমণ নয় এবং আমেরিকার মাটিতে প্রথম 'হলি ওয়ার'ও নয়।

ইউএস কর্মকর্তাদের মতে বিন লাদেনের আমেরিকান নেটওয়ার্ক শুরু হয়েছিল ২০০০–এ নববর্ষে একের পর এক বোম্বিং করে। মিলেনিয়ামের এই শুরু।

ওয়াশিংটন স্টেটে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯–এ ইউএস বর্ডার ক্রসিং–এ আমেরিকান প্ল্যান ব্যর্থ হল, যখন ৩০ বছর বয়স্ক এক আলজিরিয়ান আহমেদ রেশাম কানাডা থেকে আগত একটা ফেরিতে তাকে গ্রেপ্তার হয়। রেশামের গাড়ি বের হয়ে আসার সময় ইউএস কাস্টম ইন্সপেক্টর ডায়নাডিন তাকে গাড়ি থেকে বের করে দেখে যে তার হাত কাঁপে ও ঘামে যদিও তখন ডিসেম্বর ঠাণ্ডার সময়। রেশাম গাড়ি থেকে বের হয়েই ছুটে পালাতে চেষ্টা করে কাস্টম এজেন্টদের কাছ থেকে, কিন্তু সমর্থ হয়নি। মন্ট্রিলে রেশামের এপার্টমেন্টে তল্লাশি করে ক্যালিফোনিয়ার ম্যাপে তিনটি এয়ারপোর্টে গোল চিহ্ন দেখতে পায়, লস এঞ্জেলেস, লং বিচ এবং এন্টারিও। রেশামের গ্রেপ্তারের পরপর, কর্মকর্তারা অনুমান করে যে রেশামের ওয়েস্ট কোস্টের ল্যান্ডমার্কে আক্রমণ করার ইচ্ছা ছিল, যেমন সানফ্রান্সিকোর ট্রান্স আমেরিকা বিল্ডিং কিংবা সিটেলে স্পেস নিড্‌ল। (রেশাম সিটেলের কাছে একটা মোটেলে রুম 'বুক' করেছিল)। সিটেলে স্পেস নিড্‌ল আক্রমণের বিষয় চিন্তা করে কর্মকর্তারা মিলেনিয়াম সেলিব্রেশন বাতিল করেন।

রেশামের গ্রেপ্তারের দেড় বছর পর, সে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কোন উদ্যোগ নেবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু ২০০১–এ এপ্রিল মাসে, সে দেখলো যে তার ১৩০ বছর জেল হতে পারে, তখন সে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা শুরু করে এবং বলে যে লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দর বোম্বিং করা তার উদ্দেশ্য ছিল। ইউএস কর্মকর্তা তখন এই প্ল্যানের সাথে ইয়েমেনের ইউএস ওয়ারশিপ ও জর্ডনের বিভিন্ন টার্গেট–এর সাথে আল–কায়েদার যোগাযোগের সূত্র সন্ধান করে।

রেশাম একজন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হবার জন্য বিভিন্ন পথ অতিক্রম করেছে। আলজিরিয়ান হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর সে অবৈধভাবে করসিকা দ্বীপে কাজ করে, আঙুর ফল বিক্রি ও ছবি আঁকার কাজ করে একটি টুরিস্ট রেসর্টে। ১৯৯৪ সালে সে মন্ট্রিল চলে যায়, যেখানে যে কল্যাণ ভাতার ওপর জীবন নির্বাহ করে এবং টুরিস্টদের সুটকেস চুরি করা আর ক্রেডিট কার্ড ফ্রড করা তার পেশা ছিল। তার এই অপরাধী জীবন সত্ত্বেও, রেশাম নিয়মিতভাবে মন্ট্রিল মসজিদে নামাজ পড়তে যেত।

১৯৯৮–এ সে আফগানিস্তানে চলে যায় এবং পাকিস্তানে আল–কায়েদার খালদান ক্যাম্পে প্রথম সাক্ষাৎ হয় প্যালেস্টাইনি আবু জুবাইদার সাথে। আবু জুবাইদাকে আমেরিকান ও ব্রিটিশ কর্মকর্তারা বিন লাদেনের মুখ্য ব্যক্তি বলে গণ্য করে। সে বহু লোক রিক্রুট করেছে আল–কায়েদার জন্য এবং জর্ডনের ব্যর্থ মিলেনিয়াম প্লটের সমন্বয়কারী ছিল। একবার সে ক্যাম্পে কয়েক মাস বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসীদের সাথে সময় কাটিয়েছে—যেমন আরব, জার্মান, সুইডিস,

ফ্রেঞ্চ, তুর্কি ও চেচেন। (মোহাম্মদ রাশেদ আল ওহালি, আত্মঘাতী কেনিয়া এম্বেসি আক্রমণকারী ও রাইদ হেজাজীও এই দলে ছিল ১৯৯০-র দশকে)। রেশাম আল-কায়েদা ক্যাম্পে বিভিন্ন অস্ত্রে প্রশিক্ষণ নেয়, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য বিষয়ে। তাকে বিমানবন্দর আক্রমণ করার কৌশলও শেখানো হয়েছিল, শুধু তাই নয় রেল-রোড, সামরিক স্থাপনাসমূহ এবং গুপ্তহত্যা শিল্পকর্ম-মোট কথা তার সব কিছুই কৌশল আয়ত্তে ছিল। এর পূর্বে হোসনি মোবারক-এর ব্যর্থ হত্যাকাণ্ড (ইথিওপিয়া-১৯৯৫) এবং ১৯৮৩-তে সফল আক্রমণ বৈরুতে ইউএস মেরিন ব্যারাকের ওপর প্ল্যানিং-এর সময় সে উপস্থিত ছিল।

১৯৯৯-এ ফেব্রুয়ারি মাসে, রেশাম মন্ট্রিলে ফিরে আসে আল-কায়েদা কর্মকর্তা থেকে ১২,০০০ ডলার নিয়ে, সাথে ছিল বোমা তৈরি করার ম্যানুয়েল আর অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য। গ্রীষ্মের সময় রেশাম ও তার অনুসারী কানাডাতে একটা ইসরাইলি টার্গেটে বোমা মারার কথা চিন্তা করে, কিন্তু মত পরিবর্তন হয় এবং আমেরিকার মধ্যে কোন টারগেট ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সময়ের মধ্যে রেশাম, মন্ট্রিলে অন্যান্য আলজিরিয়ানদের আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণের জন্য বিন লাদেনের ক্যাম্পে যোগাযোগ করে এবং লন্ডনে অবস্থিত আল-কায়েদার আল-জিয়ান সদস্য আবু দোহার সাথে কথা বলে। (তখন জুলাই ২০০১ সাল। আমেরিকান প্রসিকিউটর আবু দোহাকে চার্জ করে আল-কায়েদাতে মুখ্য ভূমিকা পালনের জন্য। যখন ব্রিটিশ পুলিশ আবু দোহার এপার্টমেন্ট তল্লাশি করে, তার নকল পাসপোর্ট ও বোমা তৈরির সামগ্রীর সন্ধান পায়)।

রেশাম ১৯৯৯-এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর-এর প্রথম পর্যন্ত ভ্যাঙ্কুভারের এক হোটেলে বেশ কয়েকটি ক্যাসিও ঘড়ি দিয়ে টাইম বোমা তৈরি করে। তারপর তার তৈরি বোমা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি একটা ভাড়া করা গাড়িতে উঠিয়ে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, ভিক্টোরিয়া যাত্রা করে—সেখান থেকে ফেরিতে ওয়াশিংটন স্টেটে যাত্রা করে। তার ভয় ছিল যে ফেরিতে গাড়ির মধ্যে যে কম্পন হয় তাতে হঠাৎ বোমা ফেটে গেলো মুস্কিল, তাই সে প্ল্যান করে ছিল আমেরিকায় পৌঁছে ট্রেনে করে লস এঞ্জেলেসে যাবে। কিন্তু রেশাম লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দর আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয় তার গ্রেপ্তারের জন্য, তা না হলে লস এঞ্জেলেসে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারতো। রেশাম যখন তার ফাইনাল প্রস্তুতি নিচ্ছিল লস এঞ্জেলেস আক্রমণ করার জন্য, তখন আমি আফগানিস্তানে এক তদন্তে যাচ্ছিলাম কেন তালিবানরা বিন লাদেন ও আল-কায়েদাকে আফগানিস্তানে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে অনুমতি দেয় এবং কেন তারা ডজন খানেক আল-কায়েদার ট্রেনিং ক্যাম্প চালু রাখতে সাহায্য করেছিল রেশামের মত মারাত্মক সন্ত্রাসীর জন্ম দিতে যারা সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দিল।

অধ্যায়–আট

আসল বিশ্বাসী : তালিবান ও বিন লাদেন

(True Believers : The Taliban and bin Laden)

Things fall apart; the center cannot bold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

W. B. Yeats, 'The Second Coming'

মৌলবী হাফিজুল্লাহ তালিবান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা এক মুঠো বাদাম–চকলেট মুখে পুরে আনন্দের সাথে চিবোচ্ছিল। চকলেট মুখের মধ্যে গলে যাওয়ার পর কথা বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে কিছু গলা চকলেট থুথুর সাথে সামনে ছড়িয়ে পড়লো। সেই অবস্থায় বললো ঃ 'আমরা বিন লাদেনকে কখনো আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করবো না। যুক্তরাষ্ট্র একজন মানুষকে দানব তৈরি করেছে। আমরা তোমাদের ন্যুক্লিয়ার বোমার মোকাবেলায় 'হিরোইন বোমা' ছাড়বো।' জাতিসংঘ তালিবানের অধীনে আফগানিস্তানকে পৃথিবীর সেরা আফিম উৎপাদনের দেশ বলেছিল। এই আফিম হিরোইন তৈরি করার জন্য কাঁচামাল।

১৯৯৯–এর ডিসেম্বরে আমি আফগানিস্তানে ছিলাম তালিবানের এক সিনিয়র সদস্যের সাথে কথা বলার জন্য এবং তাদের আন্দোলনের বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহের জন্য। এছাড়া, এটাও জানতে কেন বিন লাদেন এবং তার মত অন্য ইসলামী জঙ্গিদের আশ্রয় দেয়ার জন্য। জাতিসংঘের বিধি–নিষেধ ও চাপ অমান্য করেও তারা তাদের মত কাজ করে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আফগানিস্তানের ধর্মীয় যোদ্ধাদের সম্পর্ক বন্ধুভাবাপন্ন না থাকা সত্ত্বেও, কেন যে স্টেট ডিপাটমেন্ট ১৯৯৬ সালে তালিবান সরকারকে স্বাগত

জানিয়েছিল তার মাজেজা খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি এই সমর্থনের প্রকাশ ক্বচিৎ উচ্ছ্বাসপ্রবণ, তবুও যুক্তরাষ্ট্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল যে তালিবানদের ইসলামী আইন প্রবর্তনের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।

এই যে সমর্থন তাকে কয়েকটা কারণে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, তালিবানের মত একটা সরকারকে আমলে আনার কোন কারণ ছিল না। ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তার কারণে কাবুল এম্বেসি বন্ধ করে দেয়ার সময় তালিবানদের সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। (১৯৯৩ সালে আমি এম্বেসি ভবনকে ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখি, দেয়ালের চারদিকে বিভিন্ন ধরনের গাছ গাছালি বেরিয়েছে–ইউএস–এর আফগান নীতির এক করুণ দৃশ্য। ২০০৫–এর ২৭ সেপ্টেম্বর, এম্বেসিতে আগুন লাগানো হয়েছিল আর প্রতিবাদীরা 'ওসামা জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ পাতাল কাঁপিয়েছিল) এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট, যারা পাকিস্তানিদের আফগানিস্তানের সংবাদের জন্য বিশ্বাস করেছিল। তখন যে–কোন দলের সাথে কোলাকুলি করতে ইচ্ছুক ছিল যারা ঐ দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে পারতো। ইউএস কর্মকর্তার হয়ত অজানা ছিল না যে আমেরিকার বিখ্যাত তেল কোম্পানি ইউনিকল তখন আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে একটি মাল্টি–বিলিয়ন–ডলার ব্যয়ে পাইপলাইন তৈরি করছিল যাতে ভারত মহাসাগরের বন্দরের সাথে তেল ও গ্যাসের সংযোগ ঘটে। ইউনিকলের স্বার্থটা তখন রক্ষা করছিলেন এক জাঁদরেল ব্যক্তি রবার্ট ওকলে, পাকিস্তানে সাবেক ইউএস এম্বাসাডার। তিনি তখন এই কোম্পানির বোর্ডে ছিলেন। দেখে মনে হয়েছিল যে তালিবানরা ইউনিকলের পাইপ লাইন তৈরি করার ব্যাপারে একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যাতে ইউনিকলের পাইপলাইনের কাজের অগ্রগতি হয়। এটাও আশা করা হয়েছিল যে তালিবানরা তাদের পূর্ব ঘোষণা মতে ড্রাগ ও মাদক ব্যবসা সম্বন্ধে কড়া বন্দোবস্ত নেবে, কিন্তু আসলে কিছু করেনি।

১৯৯৭ সালে আন্দোলনের ব্যাপারে যে মরীচিকা আমেরিকা দেখিছিল সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। মেডলিন অলব্রাইট, সেক্রেটারি অব স্টেটস পাকিস্তানে এসে ঘোষণা করলেন; 'আমার মনে হচ্ছে, এখন এটা পরিষ্কার যে আমরা এখন তালিবানদের নীতির বিরুদ্ধে কেননা নারী ও শিশুদের প্রতি তাদের মানবেতর ব্যবহার এবং মানবতার বিরুদ্ধে তার ঘৃণ্য অসম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদের আফগান নীতি পরিবর্তন হতে পারে।

আফগানিস্তানে প্রবেশের সহজ পথ হল তার প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান–তিনটি দেশের মধ্যে একটি যে শুরুতে আফগানিস্তানের ধর্মযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল (সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব এমিরেট এর মধ্যেই তালিবানদের সাথে কূটনীতি সম্পর্ক ছিন্ন করেছে)। পাকিস্তানের ইসলামিস্ট দলগুলো এবং তার শক্তিশালী গোয়েন্দা এজেন্সি–ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স (আইএস আই)–ই তালিবানদের ক্ষমতা দখলে একমাত্র সহায়ক। এর অর্থ এ নয় যে এই

আন্দোলনের গোড়া পাকিস্তানেই পোঁতা ছিল। সত্যি বলতে কি আফগানিস্তানের দেশীয় ও স্থানীয় একদল ধর্মীয় ছাত্র উড়ে এসে জুড়ে বসে গেল এবং দক্ষিণাঞ্চলে কান্দাহার নগরী অধিকার করে বসে ১৯৯৪ সালে। কিন্তু যেই মুহূর্তে তালিবান কান্দাহার শহর দখল করে নিল তখনি পাকিস্তানে সামরিক-ধর্মীয় কমপ্লেক্স তড়িঘড়ি তালিবানদের জেতা ঘোড়ার ন্যায় পিঠে টাকার বোঝা চাপিয়ে দিল গৃহযুদ্ধের কারণে, যার পরিণতিতে দেশের বারোটা বেজে গেল। বেনজির ভুট্টো সরকারের অভ্যন্তরীণ উজির জেনারেল নাসিরউল্লাহ বাবর প্রথম দিকে তালিবানদের উপদেষ্টা ছিলেন–যেমন ছিলেন পাকিস্তানের ধর্মীয় দলের নেতা ফজলুর রহমান।

১৯৯৮ সালে পাকিস্তানে অবস্থিত একজন আমেরিকান কর্মকর্তা আমাকে অবাক করে বললেন—জানো, তালিবানদের তিরিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে দশ হাজার পাকিস্তানি অর্থাৎ বিশ থেকে চল্লিশ ভাগ সৈন্য পাকিস্তানি। তালিবানদের ওপর পাকিস্তানের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি বলেন, তুমি যদি আফগানিস্তানে টেলিফোন করতে যাও, পাকিস্তানি একচেঞ্জ হয়ে যেতে হবে এবং তালিবানদের যত মোটরাইজড ইউনিট-এর তেল-পানি সব পাকিস্তানের ট্রানজিট হয়ে যেতে হয়।

১৯৯৩ সালে এক কুয়াসাপূর্ণ দিবসে আমি ওয়াশিংটনে পাকিস্তান চান্সেরিতে ভিসার জন্য গিয়েছিলাম। ভিসার ফরমে বলতে হয় নির্দিষ্ট স্থানগুলো যেখানে ভ্রমণের প্রয়োজন। পাকিস্তানি চান্সেরি ভবনটি মনোরম, যেমন রং ফেরানো, তেমনি কার্পেটে মোড়া। বাইরে প্রেস এটাশের অফিসে অপেক্ষা করছি, এমন সময় একটি লোককে চেনা চেনা মনে হল। আমি তার কাছে গিয়ে জানালাম, দেখুন, আমি প্রেস এটাশেকে খুঁজছি। তিনি মুখ ব্যাজার করে জবাব দিলেন গতকাল পর্যন্ত আমিই ঐ পদে ছিলাম, কিন্তু এখন চাকরিচ্যুত। তখন আমার মনে পড়লো যে তার নাম মালিক। এক বছর আগে আমি তার কাছে ভিসার জন্য দরখাস্ত দিয়েছিলাম। তখন আমাকে দীর্ঘ বক্তৃতা শোনানো হয় যে, জঙ্গি ইসলামিক দল দেশের কর্ণধার হয়ে যাচ্ছে অতএব–। কিন্তু পরবর্তীতেই খবর পাওয়া গেল দেশে সামরিক শাসন জারি হয়েছে এবং আর্মি শাসনভার গ্রহণ করেছে। তাই জনাব মালিকের চাকরি খতম।

পাকিস্তানে সেই পুরানো কাসুন্দি যার সুগন্ধের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে ১৯৫০-র দশকের শেষে যখন সিআইএ'র মাধ্যমে প্রথম ক্যু হয়েছিল ইসকান্দার মির্জা ও আইয়ুব খাঁন আমলে। ১৯৯৯-এর ১২ই 'অক্টোবর সেনাবাহিনী জাতির বিমানবন্দরগুলো বন্ধ করে দেয় এবং জাতীয় টেলিভিশন দখল করে। টেলিভিশন থেকে বিরতিহীনভাবে গ্রাম্য সঙ্গীত-নৃত্যের পরিবেশন চলছিল–তারপর ঘোষণা করা হয় সত্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন জাতির নতুন নেতা। মধ্যরাত্রিতে 'জেনারেল পারভেজ মুশাররফ তার সামরিক ইউনিফরমে আবির্ভূত হলেন টেলিভিশনের পর্দায় এবং মাত্র দু'মিনিটের মত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। দেশের

ইতিহাসে পাঁচ দশকের মধ্যে চারবার সেনাবাহিনী শাসনভার গ্রহণ করে। জেনারেল তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন–দেশের অবস্থা আরও খারাপ হবার পূর্বেই দেশে সেনাবাহিনীকে হাল ধরতে হল। এই সামরিক ক্যুকে উপস্থিত সকলে স্বাগত জানালেন হাততালি দিয়ে। জেনারেল আরও বলেন পাকিস্তানের তথাকথিত গণতন্ত্রমনা রাজনীতিবিদরা বছরের পর বছর ধরে পরিকল্পিতভাবে লুটপাট করেছে। পাকিস্তানিরা হতোদ্যম হয়ে গেছে এবং সেনাশাসন ছাড়া দেশকে রক্ষা করার আর কোন বিকল্প পন্থা তাদের সম্মুখে নেই।

এটা রক্তপাতহীন নমনীয় 'ক্যু'; যদিও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার কয়েকজন মন্ত্রীকে। জেনারেল জিয়ার মতো নয়। জেনারেল জিয়া কয়েকজন আমেরিকান সাংবাদিককে এক রাজনীতিককে মন্ত্রমুগ্ধ করে তার লৌহকঠিন শাসনভার দিয়ে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এমন কি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে তার বাধেনি।

১৯৯৯–এ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক দেশের ক্ষমতা দখল তালিবানদের জন্য শুভ সংবাদ বয়ে আনে, বিন লাদেনের জন্যও। ১৯৮০–র দশকের মধ্যে জিয়া সেনাবাহিনীকে ইসলামী ভাবধারায় দীক্ষা দেন, যারা পরবর্তীতে তালিবানদের পেছনে মদদ জুগিয়ে তাদের আফগানিস্তানের ক্ষমতার শীর্ষে বসিয়ে দেয় এবং তাদের সাহসী করে তোলে পশ্চিমা শক্তির ও চাপের বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু ঘুরিয়ে, বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে বহিষ্কারে অসম্মতি জানাতে।

পাকিস্তান কনসুলেটে ফিরে, আমি মালিককে জিজ্ঞাস করেছিলাম, তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা কি? দুঃখভরা মুখে সে জবাব দিয়েছিল ঃ সম্ভবত এখন দেশে ফিরে যাবার মত অবস্থা নয়, ফিরে গেলে জেলের ভাত খেতে হবে। আমি নিজেই জানি না, কি করবো। আমি জন্মগতভাবে একজন আমলা, আমার দুটি সন্তান আছে। দার্শনিকভাবে কথাগুলো বলছি, কেননা করার মত কিছুই নেই। একটা টেবিলের দিকে নির্দেশ করে সে বললো, আমি ঐ চেয়ারে আগে বসতাম, এখন এখানেই বসছি–বলে ভিজিটরদের চেয়ার দেখালো।

আমি তাকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে বললাম ঃ তুমিতো বলেছিলে যে মৌলবাদীরা দেশ দখল করবে। এখন কি হল?

সম্ভাবনা এখনও আছে। সে জবাব দিল। সেনা বাহিনীতে মৌলবাদী ভর্তি। নতুন নেতা জেনারেল মুশাররফ হতে পারেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি, কিন্তু তিনি উৎখাত হয়ে যেতে পারেন। অসম্ভব কি! সামরিক ক্যু–র সমস্যা হল, যখন একটা ঘটে তখন গণতন্ত্রের একটা করে শেকড় ছিঁড়ে যায়, ফলে ডেমোক্র্যাসি আরো দুর্বল হয়ে পড়ে।

মালিক চাকরিচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও তাকে অফিসে কিছু কাগজপত্রে সই করে ছাড়পত্র নিতে হয় তাই তার এখানে উপস্থিতি। কিন্তু আমাকে বলল, চিন্তা

করোনা, নতুন প্রেস এটাশেকে বলবো তুমি ভিসার জন্য এসেছিলে, সে যেন তোমার কেসটা দেখে। পাকিস্তানি চরিত্র এটাই, অবস্থা যা-ই হোক ভদ্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

পাকিস্তানে ইসলামাবাদে পৌঁছে পাকিস্তান ও ইসরায়েলের মধ্যে কিছু ইন্টারেস্টিং সাদৃশ্য দেখতে পেলাম। উভয় দেশ ধর্মভিত্তিক-একটি ভারত উপমহাদেশে মুসলিম আবাসস্থল, অন্যটি বিক্ষিপ্ত ইহুদিদের একীভূত হওয়া (Jews of the Diaspora)। এই দুই দেশকেই প্রসব করিয়েছে ব্রিটেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর; কেননা যে-দেশের রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতো না, সে দেশের সূর্য সবখানেই অস্তমিত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। পাকিস্তান তাদের এই আবাসভূমি অর্জন করতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভারত থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। উভয় দেশ শত্রু দ্বারা বেষ্টিত, প্রতিবেশী দেশের সাথে ঘন ঘন টক্কর ও যুদ্ধ বাধছে এবং উভয়েরই নিরাপত্তার কারণে আণবিক অস্ত্র জোগাড় করতে হয়েছে। এবং উভয় দেশে ধর্মীয় দল বেশ ক্ষমতাশালী, অন্যান্য ছোট দল থেকে।

আমি রমজান মাসে পাকিস্তানে পৌঁছলাম। পাকিস্তানিরা প্রতি পদক্ষেপে ধর্মীয় আকিদা পালন করে, তাই পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে রোজার মাসে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থেকে সিয়াম সাধনা করে। আমার হোটেল টেলিভিশনে তিনটি চ্যানেলে সৌদি আরব থেকে কাবার দৃশ্য দেখানো হয়, হাজার হাজার পুণ্যার্থী পবিত্র কাবাঘরে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

তখন ডিসেম্বর মাস, সকাল বেলায় বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু মধ্যাহ্নে সূর্যতাপে গরম হয় পরিবেশ, যদি বাতাস ঝিরঝির করে বয়। বেলা দুটো বাজার সাথেই অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যায়। লোকজন ঘরে ফিরতেই রাস্তা জনশূন্য হয়ে পড়ে। ঠিক সূর্য ডোবার আগে ড্রাইভারদের গাড়ি নিয়ে ছুটাছুটি লেগে যায়, ইফতার করার জন্য। তারপর একঘণ্টার মত রাস্তা-ঘাট নিঃশব্দ, সকলেই ঘরের মধ্যে। রোজা খুলতে ও এবাদতে মশগুল।

রমজান মাসে সিয়াম সাধনা সত্ত্বেও পাকিস্তানে একদিকে সেক্যুলার দিকও আছে। হোটেলে বই-এর দোকানে বিদেশী মেগাজিনে ভর্তি, যাতে 'ওরাল সেক্স'-এর খোরাক পাওয়া যায়। কেমন করে এর সত্যিকার স্বাদ আহরণ করা যায় এবং তোমার মনের মানুষ 'সাত-তরিকায়' (Seven ways) কত বেশি আনন্দ দান করতে পারে তার পদ্ধতি বাতলানো থাকে। আমার টেলিভিশন পর্দায় 'এশিয়ান এমটিভি' ফুটে ওঠে যেখানে বিভিন্ন কায়দায় ইণ্ডিয়ান 'ভিজে' প্রেমিক প্রেমিকার রসালো চিঠিপত্র পড়ে শোনানো হয়। এছাড়া ক্যাবল চ্যানেলে পামেলা এন্ডারসন ও তার সঙ্গীর রসকেলিও দেখানো হয়।

তা সত্ত্বেও পাকিস্তানে নারীর 'মর্যাদা' অগ্রগণ্য। ইসলামাবাদে আমার দ্বিতীয় দিনে, আমি নগরের 'পশ' এলাকায় এক আইসক্রিমের দোকানে গেলাম। কয়েকটা

টেবিল ছাড়িয়ে একটু দূরে এক মহিলা তার স্বামীর সাথে কথা বলছিলেন, আমাকে দেখা মাত্রই মুখের ঘোমটা ফেলে মুখ ঢেকে দিলেন এবং পনের মিনিট ধরে, সেইভাবেই রইলো আমি দোকান না ছাড়া পর্যন্ত। আমি ইউএন ক্লাবেও গেছি, ইসলামাবাদের কয়েকটি স্থানের মধ্যে একটি যেখানে বিদেশীরা মেলামেশা করতে পারে। নোটিশ বোর্ডে সুইমিং পুলের নিয়ম কানুন লেখা ছিল তার মধ্যে একটি ছিল যার নিচে দাগ দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

শর্তটি হল "সুইমিং পুলে মেয়েরা 'টপলেস' হতে পারবে না।"

জঙ্গি মৌলবাদীদের ভয়ে ক্লাব রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই বন্ধ করে দেয়া হয়। ভীতিটা অমূলক নয়; কারণ ১৯৯৯-র নভেম্বরের মাঝামাঝি, ইউএস এম্বেসিতে লাগাতার রকেট হামলা হয়, ইউএন এলাকা এবং আমেরিকান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অজানা সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কারণ আমেরিকা আফগানিস্তান কর্তৃপক্ষকে বারবার তাগিদ দিচ্ছিল বিন লাদেনকে আশ্রয় না দিয়ে বহিষ্কার করার জন্য। কপাল ভালো, কেউ হত বা আহত হয়নি। ক্লাব ম্যানেজার আমাকে বলেছিল ইউএন নিরাপত্তা অফিসার বলেন-ভবিষ্যতে রাত এগারোটার পরে যে-কোন আক্রমণ হতে পারে। সুতরাং সম্ভবত নববর্ষ দিবসে কোন পার্টি-টার্টি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ সাড়ে দশটায় ক্লাব বন্ধ করবে, নববর্ষ পালন হয় কি করে?

অজানা সন্ত্রাসীর দল সংখ্যায় নগণ্য যারা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে ধরে রাখতে চায়। বিন লাদেন সেখানে প্রথাগত একটা মর্যাদা লাভ করেছে যা ক্ষণস্থায়ী। এক উর্দু সংবাদপত্রের সম্পাদক হামিদ মির বলেন ঃ আমার ধারণা লাদেন পাকিস্তানে যে-কোন রাজনৈতিক নেতার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় কারণ পাকিস্তানি পত্র-পত্রিকা ও মেগাজিন বিন লাদেনের কভার-স্টোরি ছাপে এবং সে সব পত্রিকা গরম পিঠার মত বিক্রি হয়। এমনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'উজুদ' সংবাদ পরিবেশন করে যে ইসরায়েল ও আমেরিকায় ১৫০ জন প্যালেস্টাইনি কমান্ডোকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে বিন লাদেনকে ছিনিয়ে নিতে কিংবা মেরে ফেলতে। বাজে সংবাদ, ভিত্তিহীন।

বিন লাদেনের সাথে কতকগুলো পাকিস্তানি উলেমার ঘাটছড়া আছে-যারা একবার ১৯৯৭ সালে 'ফতওয়া' জারি করেছিল সৌদি আরব থেকে আমেরিকান সৈন্য হটাও। এছাড়া পাকিস্তানি ধর্মীয় দলের নেতারা প্রায়ই হুমকি ছাড়ে যদি বিন লাদেনের কিছু হয় তাহলে আমেরিকানদের ওপরও আক্রমণ হবে। এমনি একটি ডাক দিয়েছিলেন পাকিস্তানের এক নামকরা উলেমা মুফতি মিজান-উদ্দিন শামজাই যিনি বিদেশী মালপত্র বয়কট করার 'ফতোয়া' ঝাড়েন। তিনি আরো বলেন যেহেতু, আমেরিকা এখন মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত, সেহেতু ইসলামী শরিয়া মতে তাদের রক্ত ঝরানো জায়েজ। ২০০১ সালে বসন্তকালে পেশওয়ারের বাইরে একটা ইসলামী মৌলবাদী কনভেশন যেখানে লক্ষ লক্ষ মৌলবাদী জমায়েত

হয়েছিল পাকিস্তান থেকে। তারা সব বিন লাদেনকে নায়ক আখ্যা দেয়। বিন লাদেনের পর্বত প্রমাণ সাইজের পোস্টার ছাপানো হয় এবং কনভেনশনের উল্লেখযোগ্য স্থানে টাঙানো হয়। আশংগ্রহণকারীরা কিছুদিনের জন্য আমেরিকার তৈরি মালপত্র বয়কটও করে।

পাকিস্তানে মাদ্রাসাগুলোতে বিন লাদেনের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। কারণ এই সব মাদ্রাসাগুলো আফগানিস্তানে তালিবান ফোর্সের জনসম্পদ সরবরাহ বেশি করেছে। ১৯৮০-র দশকে জেনারেল জিয়াউল হকের রাজত্বে আফগান-পাকিস্তান বর্ডারে গড়ে ওঠা এসব মাদ্রাসা থেকেই দলে দলে তালিবানরা আফগানিস্তানে চলে যায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে (জেহাদে) যোগ দিতে। এইসব ছাত্র কোরান ছাড়া আর কোন বিশ্বের সংবাদ রাখতো না, জেহাদে যোগ দিয়ে 'শহীদ' হতে মেতে উঠতো। নব্বই দশকের মধ্যে সারা পাকিস্তানে বেশুমার মাদ্রাসা গড়ে উঠলো জেনারেল জিয়ার সমর্থনে। ১৯৯৭ সালে শুধু পাঞ্জাব প্রদেশে মাদ্রাসাতে দুই লাখের বেশি তালিবান (ছাত্র) ছিল। এদের মধ্য থেকে দশ হাজার মাদ্রাসা ছাত্র তালিবান ফোর্সে যোগ দেয়-যেমন মধ্যযুগে ক্রুসেডে যত নাইট টেম্পলার ছিল সকলেই যাজক-জঙ্গি।

এই মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল পেশওয়ারের বাইরে জামিয়া দারুল উলুম হক্কানিয়া। এর প্রধান ছিলেন মাওলানা সামি-উল-হক। মাওলানা হক ২৮শো পাকিস্তানি একশো আফগান এবং কয়েক ডজন সেন্ট্রাল এশিয়ান রিপাবালিক (ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন) থেকে আগত ছাত্রদের ওপর খবরদারি করতেন।

আমি মাওলানা সামি-উল-হকের সাথে তার বাসায় দেখা করি। পেশওয়ারের বাইরে একটি শান্ত ভিলায় তিনি বাস করতেন। তখনও পর্যন্ত আমি তাকে একজন গ্রাম্য মোল্লা ছাড়া কিছু ভাবতাম না, যিনি কোন রকম একটা মক্তবের হেডমাস্টার হতে পারেন। তিনি বেশ কথা বলতে পারেন। খোলামেলা মানুষ মাঝে মাঝে দাড়ির ফাঁকে তার মুচকি হাসি দেখা যায়। কিন্তু বাহ্যিক আবরণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার যথেষ্ট অর্থ ছিল। যে-কোন সময় একটা দল নিয়ে সারা ইউরোপ ভ্রমণ করে আসতে পারেন।

তিনি পাকিস্তানি ইসলামিস্ট পার্টির ও তালিবানদের মধ্যমণি। মাওলানা হক পাকিস্তানের মৌলবাদী দল জামায়াতে উলেমা ইসলামের নেতা ছিলেন এবং একসময়ে দলীয় সিনেটর ছিলেন। আফগানিস্তানে তালিবান কেবিনেট লেভেল সদস্যদের মধ্যে আটজন সদস্য তার স্কুলের ছাত্র ছিল। তিনি বিন লাদেনের গোঁড়া ভক্ত এবং আশির দশকে পেশওয়ারে তার সাথে সাক্ষাৎও হয়। (তার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আমাকে বলেছিল যে মাওলানা হক বিন লাদেনের সাথে সিএনএন-কে ইন্টারভিউও দিয়েছেন।

মাওলানা হক আমাকে বলেছিলেন–কেমন করে তার স্কুল সামান্য একটি মক্তব থেকে বিশাল একটি মাদ্রাসায় পরিণত হয়। তিনি বলেন আমার বাবা মাওলানা আব্দুল ভারতের একটি নামি মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন এবং একটি ছোটখাটো স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা হক বলেন–এই স্কুলে ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেয়া হত কারণ ধনী লোকেরা অর্থ জোগান দিত স্কুল পরিচালনায়। তাই গরিব উদ্বাস্তু আফগান ছাত্ররা এখানে ধর্মীয় শিক্ষা নিত।

এর মধ্যে সূর্য ডুবুডুবু হওয়ায় মাওলানা তার দলবদল নিয়ে পাশের বাগানে মাগরিবের নামাজ পড়তে গেলেন। প্রতিদিন জামাতে নামাজ পড়ার একটা শুভ ফল হল সম্মিলিত মানুষের মাঝে ভাবের আদান প্রদান হয় ভ্রাতৃভাব গড়ে ওঠে, যা পশ্চিমে, প্রায়ই উঠে গেছে—এখন সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত। উনবিংশ শতাব্দিতে ফরাসি চাষীরা মাঠের কাজ ছেড়ে প্রার্থনা করতো–এখন নেই।

নামাজ শেষ করে মাওলানা এলেন–আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম বিন লাদেন সম্বন্ধে তার মতামত কি? তিনি জবাবে বললেন আমার মনে হয় না, তার কোন আক্রমণাত্মক চিন্তাধারা আছে। সে কোন নাশকতামূলক কাজ করে না, সন্ত্রাসীও নয়।

আল্লাহ আমাদের তেল গ্যাস দিয়ে সমৃদ্ধশালী করেছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে আমেরিকা এসব কবজা করতে চায়। আমার মনে হয় বিন লাদেন মনে করে আমাদের প্রতি আমেরিকার এই মনোভাব অন্যায় আচরণের শামিল।

মাওলানা হক আরও বললেন যে রাশিয়া যেমন আফগানিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দখল করতে চেয়েছিল এবং বিন লাদেন যেমন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তেমনি বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নেমেছে সৌদি আরব, তার মাতৃভূমি থেকে আমেরিকান সৈন্যদের তাড়াতে চায়। এটা কি অন্যায়?

আমাদের আলাপচারিতা শেষে, আমি মাওলানাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তান অনুরূপ সামাজিক ব্যবস্থা চালু করবে তালিবানরা যেমন চালু করেছে আফগানিস্তানে? এ বিষয়টি সেক্যুলার–মনা পাকিস্তানিদের ভাবিয়ে তুলেছে কেননা তারা দেখছে যে আফগানিস্তানের বর্ডারে, পাকিস্তান এলাকাগুলোতে 'তালিবানাইজেশন' শুরু হয়ে গেছে এবং সেখানকার মৌলবাদী দল তেহ্‌রি–ই তালিবান টেলিভিশন রাখা নিষিদ্ধ করেছে, তালিবান স্টাইলে অঙ্গাছেদ–শাস্তি প্রদান চালু হয়ে গেছে। মালাকান্দ উপজাতি এলাকায় স্থানীয় মোল্লারা শরিয়া আইন প্রবর্তন করেছে। এই উগ্রবাদী দলের প্রভাবে পাকিস্তানে কট্টর মৌলবাদী সিপাই–ই–সাবা (সাহাবাদের সৈন্য) প্রতিষ্ঠা পেয়ে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু শিয়াদের কচুকাটা করছে। যদিও অধিকাংশ পাকিস্তানি এদের আচরণের নিন্দাবাদ করে, কিন্তু ভোটের সময় এদেরই দরজায় ইসলামী দল ধর্ণা

দেয়। ১৯৯৮ সালে 'নিউলাইন' মেগাজিন কর্তৃক পরিচালিত এক সার্ভে দ্বারা প্রমাণিত যে পাকিস্তানে ৭% লোক শরিয়া আইন প্রবর্তনের পক্ষে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরিফ নিজের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য এক প্রকার প্রস্তাবই করেছিলেন যে পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করে দেশে একমাত্র ইসলামী শরিয়া আইন চালু করতে।

মাওলানা হক আমার প্রশ্নগুলো বিবেচনার জন্য কিছু সময় ক্ষেপণ করে পরে আবেগতাড়িত হয়ে বললেন : তালিবানরা জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই কারণে যে তারা সমাজ থেকে দূর্নীতি উচ্ছেদ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং কিছুটা সাফল্যও এনেছে। এখানে গণতন্ত্র বা মৌলিক অধিকার কারোর নেই। সাধারণ মানুষ দূর্নীতি যাঁতাকলে চাপা পড়ে মারা পড়ছে এবং আমেরিকা চায় না যে আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটুক। আমেরিকার এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অন্যান্য স্থানে আফগানিস্তানের মত অবস্থা হতে পারে।

ইসলামাবাদে আমার হোটেল রুমে ফিরে এসে আমি আফগানিস্তান সম্পর্কে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ট্রাভেল এ্যাডভাইজরি চেকআপ করে যে মেসেজ দেখলাম তাহল আমেরিকানদের ওপর রাজনৈতিকভাবে ও অন্যান্য কারণে আক্রমণ হতে পারে; এমনকি ডাকাতি, অপহরণ, ধরে নিয়ে বেঁধে রাখার প্রবণতাও আছে। সারা দেশে পাঁচ থেকে সাত মিলিয়ন ল্যান্ড মাইনস্ যা ছাড়িয়ে আছে তা-ও বিপজ্জনক

তা সত্ত্বেও যারা আফগানিস্তানে থাকতে চায় তাদের প্রতি ডিপার্টমেন্টের আবেদন যে, তারা যেন সবদিক দিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে খুব সাবধানে চলা ফেরা করে। কারণ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা হঠাৎ ধসে যেতে পারে। এই 'হঠাৎ' শব্দের ওপর আমি গুরুত্ব আরোপ করলাম।

পরদিন ভোরে আজানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। হোটেলের বয়রা রোজা রাখে, সুতরাং তাদের অনিচ্ছাকৃতভাবে বয়ে আনা প্রাতরাশ কোন প্রকারে গিলে আমি আফগান এম্বেসিতে গেলাম। কালো পাগড়ি মাথায় এক তালিবান কর্মকর্তা একগাদা ভিসা ফরম নিয়ে নাড়াচাড়া করছে তার টেবিলে বসে। আমি এক অফিসারের পাশের চেয়ারে বসলাম। অফিসারটির গায়ে লাগানে কার্ডটিতে লেখা আছে : ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খবির হোতাকি, থার্ড সেক্রেটারি।

কর্মকর্তা মুখ না তুলেই ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার জন্য কি করতে পারি?

বললাম : আফগানিস্তানের জন্য ভিসা চাই।

কি উদ্দেশ্য?

আমি ইসলামী আন্দোলন সম্বন্ধে বই লিখছি কিছু তথ্য জোগাড় করার জন্য। জবাব দিলাম।

কি সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করতে চাও? ইসলামী আন্দোলন তো ব্যাপক বিষয়।

মিনমিন করে জবাব দিলাম কিছু বিষয় জানতে চাই, যাতে মিশরীয় জঙ্গি দল ও বিন লাদেন জড়িত। এবার হোতাকি তার মুখ তুলে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্তর ভেদ করে দিল। বলল দেখ, এই দলের সকলেই আমেরিকার বিরুদ্ধে। আমি এতে মৃদু হাসলাম।

হোতাকি আরও বললো দেখ, তোমার ভিসা সম্বন্ধে তোমার প্রকাশকের কাছ থেকে একটা চিঠি লাগবে নির্দিষ্টভাবে অনুরোধ জানিয়ে। তারপর দশ থেকে পনের দিন লাগতে পারে অনুমোদন পেতে।

এরপর নির্ধারিত দিনে আমি আমার ভিসা আনতে গেলাম। জানালার পেছনে বসা লোকটি বললো : ত্রিশ ডলার ফি লাগবে।

টাকায় চলবে না? আমি বললাম।

না, শুধু ডলার।

তালিবানরা আমেরিকানদের ঘৃণা করে, যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু, কিন্তু ডলারের মূল্য সম্বন্ধে খুব সচেতন।

আমি ভিসা সংগ্রহ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। এর মধ্যে দেয়ালে টাঙানো কিছু নির্দেশাবলী পড়ে দেখলাম যা সাংবাদিকের জন্য প্রযোজ্য। লেখা আছে প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে; তারপর তোমাকে কেবলমাত্র কাবুলের হোটেল ইন্টারকনে থাকতে হবে এবং সরকার প্রদত্ত 'গাইড' ও ড্রাইভার ব্যবহার করতে হবে। ড্রাইভারদের অবশ্যই পেমেন্ট করতে হবে মার্কিন ডলারে। সর্বশেষে, ফটোগ্রাফি এবং ফিল্ম করা নিষিদ্ধ জীবন্ত বস্তুদের জন্য–অর্থাৎ মানুষ ও প্রাণীর কোন ছবি তোলা যাবে না। এখানে যে সংশোধনী আছে তাতে শরিয়া আইন সম্বন্ধে কিছু বলা নেই।

একটু ক্ষুদ্র হাসি মুখে মেখে কাউন্টারের লোকটি আমার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিল, সাথে ইসলামিক এমিরেট অব আফগানিস্তানের স্ট্যাম্প মেরেও দিল। বলল এখন তুমি যেতে পারো।

আফগানিস্তানে যাত্রার পূর্বে আমি পেশওয়ারের 'দি নিউজ' ব্যুরোর–প্রধান এবং 'টাইম', 'বিবিসি' ও এবিসি নিউজের স্থানীয় প্রতিনিধি রহিমুল্লাহ ইউসুফজাই–এর সাথে দেখা করলাম। রহিমুল্লাহর অফিসে আগত সাংবাদিক, রাজনীতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের লোক গিজিগিজ করছে। সম্মিলিত সকলেই সেখানে কথাবার্তা বলছে, ঠাট্টা মশকরা করছে। রহিমুল্লাহ ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাই নামাজের সময় কথাবার্তা বন্ধ করে উঠে চলে যায় প্রার্থনা করতে। রহিমুল্লাহ তার গ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট, তাই প্রতি শুক্রবারে সে গ্রামে গিয়ে মানুষের অভাব–অভিযোগ শোনে ও ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করে। মানুষ হিসেবে খুব বিনয়ী ও

ভদ্র। আমি ভেবে পাই না এত সব করেও সে সাংবাদিকতার সব দিক সামাল দেয় কি করে? অথচ তার কোন কাজ পড়ে থাকে না।

আমাকে দেখে রহিমুল্লাহ তার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। আমরা উভয়েই অধুনা পাকিস্তানে মিলিটারি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য অধীর ছিলাম। প্রথম গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী মুশাহিদ হুসেন—অন্যদের মতে নেওয়াজ শরিফের পতনের পেছনে তাঁর ঘিলুই কাজ করছে। আমি হুসেনকে পূর্বে ইন্টারভিউ করেছি এবং তাকে পছন্দ করেছিলাম, ভদ্রলোক বেশ খোলামেলা স্মার্ট এবং কৌতুক প্রিয়। যেসব গুণ পাকিস্তানি রাজনীতিকদের থাকে না। মিডিয়ার সাথে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন কেননা, তার পত্রিকা সম্পাদকের অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি রহিমুল্লার 'বস' ছিলেন। রহিমুল্লাহ বলেছিলেন যে যেহেতু হুসেন বেশ চালাক চতুর স্মার্ট ব্যক্তি এবং সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে কেমন করে মিডিয়াকে খেপাতে হয় সে কায়দা তার জানা ছিল বলে, সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাকে চার্জ করে বেঁধে ফেলে।

সামরিক জান্তা কিছু প্রভাবশালী পাকিস্তানিকে কাছে টানতে চেষ্টা করে তাদের সাহায্য করার জন্য—রহিমুল্লাহর কাছেও দাওয়াত এসেছিল নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে প্যানেল তৈরি করার মিটিং–এ কিন্তু সে অতি বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে।

আমরা তালিবানদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলাম–এখানে রহিমুল্লাহর অপ্রতিরোধ্য গতি, শুধু পাকিস্তানি সাংবাদিক হিসেবে নয়, সে একজন পাঠান গোত্রভুক্ত উপজাতি এলাকার, যেখান থেকে তালিবানদের নেতার আবির্ভাব। সত্যি বলছি, রহিমুল্লাহ হাতে গোনা কয়েকজন সাংবাদিকদের মধ্যে একজন যে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মোল্লা ওমরের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। রহিমুল্লাহ বলেছিল মোল্লা ওমর বিদেশী সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলে প্লেগের মত। আর তালিবান অর্থ ভাণ্ডার ১২ শতাব্দির ইংলিশ রাজাদের মত নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। মোল্লা ওমরের ঘরে একটা বাক্স আছে, দরকার মত পকেট থেকে চাবি বের করে সে প্রয়োজন মত টাকা বের করে বিতরণ করে আপন লোকজনদের। রহিমুল্লাহ আমার ধারণাকে সমর্থন করে বলল যে তালিবানরা মূলত বিন লাদেনের ভক্ত নয়; যা প্রচার করা হয়। 'আমি গোপন আলোচনা শুনেছি যেখানে বিন লাদেনের সমালোচনা হয়'–রহিমুল্লাহ বললো। তারা বিদ্রুপ করে বলে, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর, আমাদের বিন লাদেনের পেছনে লাগতে হবে। অন্যান্যদের মতে কট্টর ও মধ্যপন্থী তালিবানদের মধ্যে বিন লাদেন সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কেননা এদের মধ্যে কিছু পশ্চিমাপন্থী কাজ করে।

রহিমুল্লাহ আমার আফগানিস্তানে ভিজিটের সাফল্য কামনা করে আমায় বিদায় জানালো, আমি চলে এলাম। আমি দু'বছর পূর্বে বিন লাদেনের সাথে দেখা করার জন্য যে পথে গিয়েছিলাম সেই পথ অনুসরণ করলাম। জালালাবাদের

স্পিংহার হোস্টেলে উঠলাম। এখানে আমি একা, অন্য কোন গেস্ট নেই। আমি সেই পুরানো ডেস্ক ক্লার্ককে চিনতে পারলাম। ইতোমধ্যে তার ভালো একগোছা দাড়ি গজিয়েছে এবং যত্ন করে পালন করছে, বোধ হয় তালিবানদের তাড়া খেয়ে। সে তার জিরে-স্টার হোটেলের জন্য অতিমাত্রায় চার্জ শোনালো—প্রতি রাতে আশি ডলার। এই আশি ডলার একজন সাধারণ আফগান মাসে উপার্জন করে গড়পড়তার। পরে সে আমার রুমে এসে জানতে চেয়েছে আমার কাছে অতিরিক্ত মার্কিন ডলার বা ব্রিটিশ পাউন্ড আছে কিনা।

পরেরদিন সকালে আমি কাবুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। তলস্টয় বলেছিলেন ঃ প্রত্যেক সুখি পরিবার একই রকমভাবে সুখি, আর প্রত্যেক দুখি পরিবার তাদের নিজেদের মতো দুখি, এক রকম নয়। একথা আফগান পরিবার সম্বন্ধে বলা চলে। ১৯৭০ সালের এক গাইডবুক মতে জালালাবাদ থেকে কাবুল যাত্রা আড়াই ঘণ্টার মত। আজকে প্রায় সাত ঘণ্টা লেগে গেল। দুই দশকের যুদ্ধের কারণে রাস্তার করুণ অবস্থা, এমন ছেঁড়া-খোঁড়া রাস্তা, মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত ও পাথরের চাঁই পড়ে আছে। এই রাস্তার অবস্থা কিশোর বালক ও বুড়োদের জন্য ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হয়েছে, কারণ, তারা হাতে কোদাল, বেলচা, গাঁইতি ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খালা-খন্দকের কাছে, চলতি গাড়ি-ঘোড়াদের আরোহীরা তাদের সেসব খানা-খন্দ ভরাট করতে কাছে লাগায় আর গাড়ির জানালা দিয়ে টাকা পয়সা ছুড়ে দেয়।

কাবুল শহরে ঢোকার মুখে যে রাস্তায় এলাম তাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোমার পর ড্রেসডেনের মত মনে হল অথবা দ্বিতীয়বার রাশিয়ানরা ধ্বংস করার পর গ্রোজনির মত, আর ঐসব রাস্তায় বাচ্চা ছেলেরা 'যুদ্ধ' 'যুদ্ধ' খেলছে আর মুখে 'ব্যাঙ' 'ব্যাঙ'-শব্দ করছে অস্ত্রের মত।

কাবুলে তখন রমজান মাস, ফ্লোরেন্সে স্যাভোনাবোলার লেন্টের মত। যে দেশে মিলিয়ন মানুষ শীতে ও ভাত-কাপড়ের অভাবে মরছে, তারা সিয়াম পালনও করছে।

জালালাবাদে স্প্রিংহার হোটেলে যেমন আমি একাই গেস্ট, তেমনি কাবুলে ইন্টারকনে আমি একা, আর কেউ নেই। এজন্য হোটেল স্টাফদের কাছে আমি জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম, যারা আমাকে ক্ষুধার্ত হায়েনার মতে ছিঁড়ে খেতে চাইলো। একরাতে একজন ওয়েটার আমার রুমে এসে তার দুঃখের কাহিনী জুড়ে দিল। সে বললো : তার পরিবারে সেই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। 'দিনে নির্মাণকর্মীর কাজ করি, রাতে এই হোটেলে। আমার পরিবারের জন্য মাসে মাত্র চার ডলার উপার্জন করি। আমি তাদের মুখে এই রমজান মাসে অন্ন জোগাতে পারি না। আমি মিথ্যা বলছি না, স্যার। আফগানিস্তানে প্রায় সকলের অবস্থা এই রকম। এমন কি পেশাধারী ডাক্তারও মাসে ছয় ডলালের বেশি কামাতে পারে না।' আমি সেই ওয়েটারকে বিশ ডলালের মত দিলাম। আমাকে সে আলিঙ্গান করলো এবং অনুরোধ

করে বললো একথা যেন আর কেউ না জানতে পারে। হোটেলে সবই বর্তমান। সেই বলরুম, লবি, বার, ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করে বিজ্ঞাপন বোর্ড–সবই আছে, কিন্তু মরুভূমির মত ধু–ধু খালি। কিন্তু আগে এসব রমরমা ছিল। কাবুলে ন'টায় কারফিউ আরম্ভ হয়। আটটার মধ্যে রাস্তা–ঘাট জনশূন্য হয়, শুধু জোয়ান তালিবান সৈন্যরা টহল দেয়, প্রত্যেক ট্রাফিক পাহারা দেয়, সতর্কতার সাথে গাড়ি ঘোড়া চেক করে। তালিবান সৈন্যদের চোখে গাঢ় সুর্মার প্রলেপ টানা, যেমন কুৎসিত তেমনি বদমেজাজি। এর মধ্যে মেয়েদের প্রসাধনদ্রব্য নিষিদ্ধ হয়েছে।

সারা দেশে তালিবানরা কট্টর মৌলবাদী নিয়ম–কানুন চালু করেছে। পুরুষদের দাড়ি কামানো কিংবা, ছেঁটে–ছুটে দেখুন–ধারী করা নিষিদ্ধ। নারীদের আগা–পাশতলা ভারি কাপড়ের খোলে আবদ্ধ হওয়া যাকে 'বোরখা' বলা হয়। এবং সারা দিন ঘরের চার দেয়ালে বন্দী থাকা। যদি দরকার পড়ে সাথে নিকট আত্মীয় নিয়ে ঢেকে ঢুকে বের হতে পারে। তালিবানদের ধর্মীয় বিধি–বিধান বাস্তবায়নের জন্য একটি মন্ত্রণালয়ের পত্তন হয়েছে (ধর্মীয় পুলিশ) যার কাব্যিক নাম হল–'মিনিস্ট্রি ফর দি প্রমোশন অব ভারচু এন্ড দি প্রিভেশন অব ভাইস'–বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। এই ধর্মীয় পুলিশ পিক–আপে চড়ে টহল দেয়, রাস্তায় কোন কিছু অশ্লীল দেখলে লাঠি দিয়ে পেটানো শুরু করে। প্রত্যেক বাড়ির মালিকদের আইন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের বাড়ির জানালা কালো বার্নিশ রং দিয়ে রং করতে হবে, যাতে বাইরে থেকে অন্দর মহলে কোন নারীর প্রতি নজর না পড়ে। প্রতিবেশী ইরানে অবশ্য মেয়েদের পর্দা থাকলেও তাদের কাজ করার, ভোট দেয়ার ও রাজনীতি করার অধিকার আছে।

তালিবানরা মেয়েদের প্রতি এই আচরণের সাফাই গেয়ে বলে যে এটা আফগানিস্তানে মুসলিম সাংস্কৃতিক ধারা। পাঠানদের একনিষ্ঠ কালচার। প্রতিবেশী পাকিস্তানে মেয়েদের জন্য বোরখা পরার আইন নাই, কিন্তু আফগানিস্তানে পাঠান এলাকায় নারীদের এটাই স্বাভাবিক পোশাক। পাঠান মেয়েদের জন্য একটা প্রবচন আছে : নারী অন্দর মহলের কিংবা কবরের বস্তু।

মেয়েদের অন্দর মহলে কেন আবদ্ধ রাখা হয় এদেশে সে সম্বন্ধে একটু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। তালিবানরা মনে করে না, এতে মেয়েদের অধিকার হরণ হচ্ছে, যা বাকি দুনিয়ার চোখে মনে হয়। বরং এতে মেয়েদেরকে তাদের পূর্ণ অধিকার দেয়া হচ্ছে। কেননা এই অধিকার শরিয়তসম্মত। হেরাটের তালিবান গভর্নর এ সম্বন্ধে বলেছেন : আমরা মেয়েদের সেই অধিকার দিয়েছি যা ঈশ্বর ও তার সংবাদবাহক নির্দেশ দিয়েছেন–অর্থাৎ তাদের হেজাবের (একান্তে) মধ্যে থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

আফগানিস্তানে অন্যান্য এথনিক (নৃতাত্ত্বিক) গ্রুপের–যেমন তাজিক, হাজারা, উজবেক এবং বড় বড় শহরের বাসিন্দা–বিশেষ করে কাবুলের—তালিবান–পাঠান নীতি অন্য সংস্কৃতি অনুসরণ করে।

এমনকি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কাবুল একটা কসমোপলিটন (উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন) শহর ছিল। ১৯৬৭ সালে একজন জাপানি পর্যটক লিখেছেন পুরুষ বিদেশী ঢঙের স্যুট এবং ইটালীয় বুট পরে বেড়াতো, দেখে মনে হত কোন ইউরোপদেশীয় সরকারের আমলা . . . মেয়েরাও চমৎকার স্টাইলের স্যুট (স্কার্ট ও কোট) এবং হাইহিল জুতো পরে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতো, মনে হতো, ইউরোপীয় মহিলা। আমরা বিস্ময় প্রকাশ করতাম। আজকালকার মত চাদর এবং মোট কাপড়ে বোরখা ও ঘোমটার কোন রেওয়াজ ছিল না। সেই সময়ে ভারতে আসার পূর্বে কাবুলে দু'দিন কাটাতে পর্যটকরা হিপ্পিরা স্থানীয় হাশিশ কিনতো সেবনের জন্য এবং খানদানি পাকিস্তানি মহিলারা, মিনি স্কার্ট পরে কাবুলে ফ্যাশন পার্টিতে অংশ নিতো, যা তাদের নিজের দেশে করতে পারতো না।

তালিবান সম্বন্ধে বিশ্বমত হল, তারা বেশি বাড়াবাড়ি করছে, যা তাদের সাংস্কৃতির বাইরে। একই কঠোরতা শুধু দুই দশকের যুদ্ধ-বিগ্রহের ফসল। তালিবানদের এই আচরণ আমাকে মনে করিয়ে দেয় খেমেরুজের কথা যা ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরোক্ষ যুদ্ধের কারণে কম্বোডিয়াতে দেখা দেয়। কম্বোডিয়ার জঙ্গলে মাওবাদীদের আচরণ।

খেমেরুজের মত না হলেও, তালিবানরা চেয়েছিল তেমনি স্বর্গসুখের সন্ধান করতে। (খেমেরুজ বা তাদের 'স্বর্গকে' 'year zero' বলতো, তালিবানরা তাদের শাসনকে বলে 'শরিয়া শাসন' এবং বিশ্বাস করতো যে একবার ঠিকমত শরিয়া আইন দেশে প্রচলিত হলে আফগানিরা একটা নিষ্পাপ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলে দেশকে স্বর্গসম করে তুলতে পারবে।

কিন্তু তালিবানদের শরিয়া আইনের ব্যাখ্যা প্রায় প্রফেটের শিক্ষার সাথে মিলতো না, সংঘাত হত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রফেটের প্রথম বিবাহ খুব সুখের ছিল। বিবি খাদিজা ধনী মহিলা, প্রফেটের চেয়ে বয়সে প্রবীণ। তিনি ছিলেন শহরের সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা এবং প্রফেটকে নিয়োগ করেছিলেন তার ব্যবসা ও কারবার দেখাশোনা করতে। এর বিপরীতে তালিবান ডিক্রি জারি করলো নারীদের লেখাপড়া করা চলবে না, কাজ করা চলবে না, এমনকি নিকট আত্মীয় ছাড়া কারোর সম্মুখে বের হতে পারবে না।

কোরানের ভাষ্য মতে উভয় নারী-পুরুষ ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের যৌনাকাঙ্ক্ষাকে দমন করে চলবে; পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে নিজেদের যৌনকামনা দমন করে; মেয়েরাও দৃষ্টি সরিয়ে রাখবে যাতে তাদের সতীত্ব বজায় থাকে। নির্দেশ হল, মেয়েরা সংযতভাবে পোশাক পরিচ্ছদ পরবে তাদের নাজুক এমন কোন অঙ্গ প্রদর্শন করবে না যাতে পুরুষের কামনার উদ্রেক হয়—তাদের বুকের ওপর পর্দার আবরণ থাকবে এবং শরীরের কোন অংশ স্বামী, পুত্র, স্বামীর বাবা ইত্যাদি ছাড়া তাদের শিথিল পোশাক বা আবরণ নিয়ে বাইরে বের না হয়। এই নির্দেশ সারা মুসলিম বিশ্বে নারীরা এক বা অন্যভাবে পালন করছে।

যদিও তালিবানরা দেখতে একশিলাসম্পন্ন জাতি (মনোলিথিক)। তবুও এদের মধ্যে কট্টরবাদী আর নরমপন্থী বর্তমান। সত্যি বলতে কি, ১৯৯৯ সালে তালিবানদের নীতি–নির্ধারণ ব্যাপারে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাজ করার জন্য একটা নমনীয় ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল। আফগানিস্তানে জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেন এরিক দ্য মূল। তিনি বলেন শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে এলাকা একটু আলোকিত (twilight zone) ছিল। শহরে এলাকাগুলোকে তালিবানরা সডোম ও গোম্‌রাহ এলাকা মনে করতো এবং এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

মেয়েদের শিক্ষার পরিবর্তনটা ছিল উল্লেখযোগ্য গ্রামাঞ্চলে। আফগানিস্তানে সবচেয়ে বৃহৎ সংস্থা সুউডিশ কমিটির রিপোর্টমতে সেখানে দু'শো স্কুল ছিল, যেখানে এই কমিটির তিরিশ হাজার বালিকার পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল, আফগান ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা বলেন যে এমন কি কান্দাহার ও কাবুলে ১৯৯৮–এর পর বহু বেসরকারি স্কুল স্থাপিত হয়, যেখানে হাজার হাজার বালিকা পড়াশোনা করে। কাবুলে স্বামী–স্ত্রী মিলে নিজস্ব বাসভবনে শিফ্‌টে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে বালিকাদের জন্য। এই দম্পত্তিকে এক পশ্চিমা দাতব্য সংস্থা মাসে পঞ্চাশ ডলার অনুদান দেয় বিশ/পঁচিশটি বালিকাকে লেখা, অঙ্ক ও বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য।

তালিবানরা এই সব পরিবর্তনের স্বীকৃতি দিতে ইতস্তত করে দাপ্তরিকভাবে, কারণ তাদের ইসলামী আদালতের কোন পরিবর্তন করতে গররাজি। তবে মেয়েদের বার বছর পর আর লেখাপড়া করতে দেয়া নয়, এখানেই ইতি টানতে হয়। এরিক দ্য মূল আশাবাদী। তিনি মনে করেন ভবিষ্যতে অনেক পরিবার মধ্যপন্থা অবলম্বন করে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার পক্ষে সাড়া জাগিয়ে তুলবে।

১৯৯৯ সালে অন্য দিকে পরিবর্তন দেখা দিল। তালিবানরা সময়ের সাথে বুঝতে পারল যে একই সাথে মেয়েদের ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শী হতে এবং পুরুষ ডাক্তার দিয়ে মেয়েদের চিকিৎসা করনো বন্ধ করতে পারবে না। হেরাটে বিশ্বখাদ্য প্রোগাম তিন বছরের একটি মেডিক্যাল ফোর্স মেয়েদের জন্য চালু করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়। (সেটা ১৯৯৯ সালের মে মাস) বিশ্ব খাদ্য প্রোগ্রামের এক কর্মকর্তা বলেন এই প্রকল্প আগে চালু করা সম্ভব হয় নি। কান্দাহারে একদল পুরুষ ডাক্তার আমাকে বলেছিল যে তাদের দিয়ে মেয়েদের চিকিৎসা করার যে বাধা ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

নব্বুই দশকের শেষের দিকে মেয়েদের জন্য অফিস আদালতে বা অন্য কোনখানে কাজ করার কোন সুযোগ বলতে গেলে ছিলই না। ১৯৯৭ সালের পর বিশ্ব খাদ্য প্রোগ্রামে কাবুলে এবং উত্তর দিকে শহর মাজারই–শরিফে ৪৯টি বেকারি (রুটির দোকান) চালু করে এবং এ দোকানগুলো মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত, বিশেষ করে সর্বহারা বা বিধবা মহিলার দ্বারা।

তবু মানবাধিকার সম্বন্ধে তালিবানদের রেকর্ড কালিমাময়। এই বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভের জন্য আমি ইহুদি আইজ্যাক লেভির বাসায় গেলাম। তিনি একমাত্র ইহুদি ব্যক্তি কাবুলে একটি জনবসতিহীন স্থানে তার হতচ্ছেদা অপরিচ্ছন্ন রুমে দেখা করলাম। লম্বা সাদা দাড়ি, ধূসর কোঁচকানো মুখমণ্ডল লেভির। ষাট বছর পূর্বে কিংবা তারও বেশি হবে, তিনি হেরাটে জন্মগ্রহণ করেন, কাবুলে বসবাস করছেন গত পঁচিশ বছর ধরে। আমি যখন পৌঁছলাম, তিনি আমার বসার সুবিধার জন্য তার বালিশ খুঁজছিলেন, একটি ইলেকট্রিক কুকারে তিনি ভাত পাক করছিলেন, যাতে তার সাবাতের জন্য খাদ্য তৈরি থাকে, পরবর্তী দিন সাবাত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঐ পবিত্র দিনে তাঁর প্ল্যান কি? তাকে চিন্তিত ও বিচলিত মনে হল–ম্লান মুখে উত্তর দিলেন কি আর করবো, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো। লেভি বললেন ১৯৭৯–এ সোভিয়েত আক্রমণের পূর্বে, প্রায় ষাটটি ইহুদি পরিবার কাবুলে বাস করত। তার সন্তানদের মধ্যে চারটি পুত্র, একটি কন্যা ছিল, তারা এখন সকলেই ইসরাইলে চলে গেছে। তিনি নিজেকে রাব্বি বলে পরিচয় দিলেন এবং সর্বশেষ ইহুদি যাকে গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখা হয়। '১৯৯৯–এর মে মাসে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যাদুকর বলে পেটানো হয়'–তিনি বললেন। পুল–এ–চরকি জেলে আমি ৪৯ দিন আটক ছিলাম, কাবুল থেকে কয়েক মাইল দূরে অন্ধকার রুদ্ধ বন্দিশালা। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় তার মূল্যবান তোরহি গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

আমি লেভিকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কেন কাবুলে রয়ে গেলেন? উত্তরে বললেন ঃ এই গৃহটি আমার বাবার এবং ইহুদি গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের মিলন কেন্দ্র ছিল। আমি এটা ছেড়ে গেলে তালিবানরা দখল করে নেবে। তাই, আমার এই স্থান রক্ষা করার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে।

তিনি কেমন করে নিজেকে পালন করছেন এই প্রশ্নটি সরাসরি এড়িয়ে নিয়ে পরোক্ষভাবে জবাব দিলেন মোল্লা (রাব্বি) মানুষ হিসেবে মানুষের মাথাব্যথার নিরাময়ে তিনিই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন (এখানে আমার দোভাষী আমাকে জানালো যে লেভি প্রায় মানুষের হস্তরেখা বিচার করে থাকেন)। রাব্বি প্রায় পনের মিনিট ধরে নিজেকে গুটিয়ে রাখলেন এবং এদিক ওদিক দেখলেন যাতে তার প্রতিবেশীরা ধর্মীয় পুলিশকে বলে না দেয় যে তিনি বিদেশীদের সাথে আলাপ করছেন। (২০০১ সালের মধ্যে লেভি আফগানিস্তান ত্যাগ করার মনস্থ করলেন এবং ইসরাইল সরকারের কাছে আবেদন জানান—দয়া 'করে আমাকে উদ্ধার করুন'–আমি এখানে আর থাকতে পারছি না)।

আইজাক লেভির কাহিনী এখানে একটা আকস্মিক ঘটনা বলা যায়, যার সাথে আমার আফগানিস্তান ভিজিটের ক্বচিৎ সম্পর্ক ছিল। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তালিবানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো ১৯৯৮ সালে

মাজার-ই-শরিফ দখলের পর হাজার হাজার হাজার গোত্রের শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ হত্যা করার জন্য। তখন আগস্ট মাস এবং ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টমতে ২০০০ সালে তালিবানরা অসংখ্য এবং জঘন্যভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপবাদে অভিযুক্ত। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী, তাদের জঘন্য অপরাধ ছিল আফগানিস্তানের উত্তরে যুদ্ধের সময় জাতির সাবেক শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অত্যাচার। অসংখ্য সিভিলিয়ান তারা বিচার ছাড়াই মেরে ফেলেছে, জোর করে জনবসতি উচ্ছেদ করেছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, শস্যক্ষেত পুড়িয়েছে এবং জবরদস্তি মানুষের শ্রম আদায় করেছে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি তালিবানদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের পদ্ধতি অবলোকন করার জন্য স্থির করলাম কোন এত্তেলা না দিয়েই আমি পুলে-ই চো-কে জেলখানা দেখতে যাবো। সেখানে পৌঁছে গেটের কাছে যেতেই কমান্ডার মোল্লাখান জান আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। সে বলল মাত্র গত মাসে তার এখানে চাকরি হয়েছে। মোল্লা বেশ উৎফুল্ল ছিল, আমাকে আমার ইচ্ছামত ঘুরে ঘুরে সব দেখতে দিল; মনে হল সে জেলার নয় একজন গাইড।

জেলের মধ্যে সদর প্রাঙ্গণে শত শত বন্দী এদিক ওদিক পরিশ্রম করছে, চাক্কি পিষছে। জেলের সাধারণ দুরবস্থা সত্ত্বেও, কারোর প্রতি অত্যাচার বা দুর্বব্যহারের কোন ঘটনা দেখা গেল না। জেলখানার ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৮০০ বন্দীর। বন্দীরা চারভাগে বিভক্ত—রাজনৈতিক, যুদ্ধ-বন্দী উত্তর মৈত্রী-জোটের (নর্দান এলায়েন্স) তালিবান বিরুদ্ধ, সাধারণ আসামি এবং ধর্মীয় পুলিশ কর্তৃক ধৃত অপরাধী। প্রথম দুই বিভাগে বন্দিসংখ্যা খুব বেশি। আমি একজন রাজনৈতিক বন্দীর সাথে কথা বলে জানলাম, তিনি এগারো মাস ধরে কারারুদ্ধ। তার বিশ্বাস তিনি অনন্তকালের জন্য অন্তরীণাবদ্ধ। আমি ধর্মীয় পুলিশ কর্তৃক আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের সাথে কথা বললাম। এক বয়সী ব্যক্তি বললো ড্রিঙ্ক করার কারণে তাকে বেদম পেটাই করা হয় এবং আড়াই মাস ধরে সে জেলবন্দি। এই দলের সংখ্যা ছিল মাত্র পনের জন। তালিবানদের আসল যুদ্ধ হয়েছিল সাবেক শাসকদের বিরুদ্ধে যারা ছিল নর্দান এলায়েন্সের। এদের বিরুদ্ধে ছিল সাংস্কৃতিক যুদ্ধ, যার প্রমাণ পেলাম আমার এই ভিজিটে। যেখানেই গেলাম দেখতে পেলাম মানুষে ফুটবল খেলছে, আর ছেলেরা ঘুড়ি উড়াচ্ছে। এই দুটি সাংস্কৃতিকে তালিবানরা প্রথম ধাক্কায় নিষিদ্ধ করেছে। আমি প্রায়ই ট্যাক্সিতে নিষিদ্ধ হিন্দি গান শুনতাম। এবার আমি নিকট আত্মীয় ছাড়াই মহিলাদের একা রাস্তায় বের হতে দেখলাম, যা ১৯৯৭ সালে দেখিনি। যদিও এসব পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবুও এ পরিবর্তন প্রশাসনের নমনীয়তার দৃষ্টান্ত, সম্ভবত এটা রাজনৈতিক বাস্তবতা যা বেশিরভাগ আফগান অনুভব করে এবং তালিবানদের কট্টর, মৌলবাদী ইসলামকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করছে না (সেই বাস্তবতা প্রকাশ পেল ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে, যখন খবর পাওয়া গেল আফগানিস্তানে

অনেক আফগান তালিবান নীতি অবজ্ঞা করছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটা সম্মিলিত আন্দোলন তালিবানদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠার আভাস পাচ্ছে অথবা তাদের ধ্বংস ডেকে আনছে)।

একটি বিষয় অবশ্য তালিবানরা অবিচল রয়ে গেল ওসামা বিন লাদেন। আমার কাবুলে প্রথম ভিজিটে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যখন আমি পরিকল্পনা মন্ত্রী হাফেজ দীন মোহাম্মদ হানিফের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। 'কারী' পদবির অর্থ হল যে মন্ত্রী মহোদয় সমস্ত কোরান মুখস্থ করেছেন।

মাত্র ন'বছর বয়সে তিনি কোরানে তালিম গ্রহণ করে বারো বছর বয়সে 'হাফেজ' হয়ে যান। তার এই পদবি অবশ্য তার এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করতে সাহায্য করবে না বলেই ধারণা। দেশের যে দৈন্যদশা তার চিত্র অফিসেই ফুটে উঠেছে। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কোন সম্পদ নেই, সম্ভাবনা নেই; সারা মন্ত্রণালয়ে মাত্র চারটি কম্পিউটার। (আফগানিস্তান স্পষ্টত **Y2K**-র সমস্যা সমাধানে বিচলিত নয়, সে পরিকল্পনাও নেই)। মন্ত্রী হানিফের টেবিলে সেন্ট্রাল এশিয়া গ্যাস লাইন পাইপ লিমিটেডের একটি পেপার ওয়েট ছাড়া আর কোন বস্তু ছিল না–ঐ পেপার ওয়েটটি সাক্ষ্য দিচ্ছে বর্তমানে অচল মাল্টি-বিলিয়ন ডলার এন্টারপ্রাইজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে।

মন্ত্রী বলেন আমরা এখন আহত মানব। ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার কারণে আফগানিস্তানের ওপর জাতিসংঘের চাপের জন্য বিরক্ত প্রকাশ করে মন্ত্রী মহোদয় বললেন এখন আমাদের ক্ষতের জন্য মলমের প্রয়োজন, তা না লাগিয়ে ওরা (জাতিসংঘ) আমাদের ঘায়ে লবণ ঘষে দিল। প্রতিদিন অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম জ্যামিতিক হারে বাড়ছে এবং আফগান মুদ্রার মূল্যমান দশ ভাগ কমে গেছে। বিন লাদেনের জন্য যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তাকে লক্ষ্য করে হাফেজ সাহেব বলেন বিষয়টি সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল। আমাদের ট্রাডিশনকে মর্যাদা দিতে হবে। সে সন্ত্রাসী নয়, একজন ধর্মযোদ্ধা। পশ্চিমা দেশ তাকে সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ করে। আমাদের অতিথিয়েতার মূল্যমান এখনো বর্তমান, এর ট্রাডিশন বিশ্বশান্তির মত। সে একজন অতিথি আমাদের কাছে, আমাদের জাতি অতিথির মর্যাদা দেয়।

এটা মানতে হবে যে তালিবান নেতৃত্ব প্রাচীন পাঠান ট্রাইবাল কোড অব কন্ডাক্ট মেনে চলে—যাকে বলা হয় 'পুখতুনওয়ালী'। পুখতুনওয়ালী দুটি ধারণায় একান্তভাবে বিশ্বাসী। একটা হল 'মালমায় তিয়া'–অর্থাৎ কোন বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে অতিথিকে সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদা দান। এর জন্য কোন প্রত্যাশা নেই, কোন সম্মানীও গ্রহণ করার রীতি নেই। অন্যটি হল 'নানাওয়াতি'–অর্থাৎ, আশ্রয় প্রদান। বর্তমান কর্তৃপক্ষ নানাওয়াতি–কে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করে যে ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থী তাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। ১৯৯৮ সালে পাকিস্তানের এক সংবাদপত্রে ব্যাখ্যা করা হয় কেমন করে আশ্রয় দানের মর্যাদা আফগান

ট্রাইবাল কোড এখনো পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। সংবাদপত্রে বলা হয়েছে–বর্তমান সময়ে এক বয়স্ক উপজাতি তার দুর্গসম বাসস্থানকে ধূলিস্যাৎ করতে পিছপা হয়নি। কিন্তু আশ্রয় প্রার্থীকে গভর্নরের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে। অর্থাৎ ঘরবাড়ি, এমনকি প্রায় সব যায় যাক, কিন্তু আশ্রয় প্রার্থীকে তার শত্রুর হাতে তুলে দেব না। তাই তালিবানরা বিন লাদেনকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়ার কথা কল্পনা করতে পারে না, যেমন মধ্যযুগে খ্রিস্টান পাদরি চার্চে আশ্রয়গ্রহণকারীকে তার শত্রুর হতে তুলে দিত না, প্রাণ দিয়ে রক্ষা করত।

সবচেয়ে শক্ত কথা শোনালেন বিদেশ মন্ত্রী মৌলবী হাফিজুল্লাহ যিনি কোন দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সুযোগ না নিয়ে পনের মিনিট ধরে বিন লাদেনের ওপর মার্কিন নীতিকে রাম ধোলাই দিলেন। তিনি বলেন আমরা আমেরিকানদের পছন্দ করি, কিন্তু আমরা আলব্রাইট, ক্লিনটন ও কোহেনকে বলতে চাই যে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থ এ অঞ্চলে হারাচ্ছে ... আফগানদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। যারা মূলত তালিবান–প্রিয় নয়, কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা আফগানদের বর্তমান সরকারের কাছে টেনে এনেছে ...। আমরা ঘাস খেয়ে বাঁচতে পারি, পেপসি চাই না। স্পষ্টত যা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে আবার যুদ্ধে নামতে হবে। হাফিজুল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন মিত্র শক্তি থেকে আফগানদের ওপর চাপ এসেছিল কয়েকশো জার্মানকে (যারা এদেশে তখন আশ্রয় নিয়েছিল) তাদের হাতে দিয়ে দিতে, সে অনুরোধ অস্বীকার করা হয়। যদিও তারা মুসলিম ছিল না, কিন্তু আশ্রয়প্রার্থী ছিল, আমরা তাদের মিত্র শক্তির হাতে তুলে দিইনি।

তালেবানদের সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতির লিওনিভ ব্রেজনেভ–এর পলিটবুরোর মত স্বচ্ছতা ছিল, কিন্তু একটা কথা হল মোল্লা ওমরই হল আসল ব্যক্তি তার শেষ কথাই ছিল আসল সিদ্ধান্ত। এই মোল্লা ধর্মীয় ছাত্রদের (তালিবান) দল সাথে নিয়ে ১৯৯৪ সালে শহর অবরোধ করে। মোল্লা ওমর তাদের প্রফেটের আলখেল্লা (ক্লাক) গায়ে জড়িয়ে তার নেতৃত্বকে পোক্ত করে। আফগানিস্তানে প্রফেটের আলখেল্লা পবিত্র প্রতীক নেতৃত্বের জন্য, আর এই প্রতীক ব্যবহার হয়েছিল গত শতাব্দিতে মোট তিনবার। মোল্লা ওমর নিজেকে সব সময়ের জন্য গুটিয়ে নিয়ে নির্জনে বাস করতো, কোন ইন্টারভিউ দেয়ার পক্ষপাতী ছিল না, ক্বচিৎ জানাশোনা মহল ছাড়া। বাস করতো একটি সাদামাটা কাচারিতে, কান্দাহারে। এই কান্দাহার শহরই (কাবুল নয়) তার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক পিঠস্থান–অর্থাৎ রাজধানী ছিল তালিবানদের।সরকারের শাসন ব্যবস্থার সে কোন স্থান দখল করেনি, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী নয়–তবে উপাধি ছিল 'আমির–উল–মুমোনিন'–অর্থাৎ বিশ্বাসীদের সর্বাধিনায়ক। সর্বময় কর্তৃত্ব তার ওপর। ঐ সর্বাধিনায়ক বলেই তার সিদ্ধান্ত ছিল সরল ও পরিষ্কার। বিন লাদেন সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিল : আমাদের জন্য বিন লাদেনকে কারোর হাতে তুলে দেয়ার অর্থ হল–ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ ছেড়ে দেয়ার মত কঠিন কাজ।

একজন সম্মানিত অতিথি ছাড়াও, বিন লাদেন তালিবানদের অতি মূল্যবান মিত্র—কারণ তালিবানদের যাবতীয় অর্থ মানবশক্তি জুগিয়েছে কয়েক বছর ধরে। সে তালিবানদের সঙ্কটের সময় তিন মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল ১৯৯৬ সালে, কাবুল অধিকারের সময় ধর্মীয় যোদ্ধাদের সমবেত করার জন্য। এসেসিয়েটেড প্রেসের এক আফগান সাংবাদিক আমাকে বলেছিল, সে বিন লাদেনের 'এক ডিভিশন' 'ট্রুপ' দেখেছিল–যাতে সর্বসমেত তিনশত যোদ্ধা ১৯৯৭ সালে শীতে তালিনাবদের সাথে যুদ্ধ করেছে কাবুল দখলে। তারা ছিল আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত, এমনকি তাদের সাথে ট্যাঙ্কও ছিল। ১৯৯৯-এর দিকে বিন লাদেনের নেতৃত্বে চারশো আরব-০৫৫ ব্রিগেড যুদ্ধ করে নর্দান এলায়েন্সের বিরুদ্ধে যারা তালিবানদের ঘোর শত্রু।

নর্দান এলায়েন্সের বিদেশ মন্ত্রী ডা. আবদুল্লাহ লাদেন বাহিনীর দক্ষতা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ২০০০-এর সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াশিংটনের এ প্লাওয়ার হোটেলের লবিতে ডা. আবদুল্লাহ-এর টেবিলে আমার সাথে দেখা করেন। তিনি বলেন ০৫৫ ব্রিগেড যুদ্ধ করেছিল কাবুলের চারপাশ এলাকায়, কিন্তু উত্তর দিকে সরে যায়। তার ইনটেলিজেন্স টিম রেডিও ইন্টারসেপ্টের মাধ্যমে বিন লাদেনের দু'জন সহকারীকে কুন্দুজ এলাকায় সৈন্য পরিচালনায় চিনতে পারে। তারা ছিল যোদ্ধারূপে বেশ ভালো তবে কৌশলগত ব্যূহ রচনা তাদের উন্নত ছিল না, কিন্তু নৈতিক উদ্যম ছিল অদম্য। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে বিন লাদেনের ট্রুপ আত্মদান করে করে দখল করার চেষ্টা করে–কারণ তাদের উদ্দেশ্য 'শহীদ' 'হয়ে স্বর্গবাস করা। চারজন আরব সৈন্যের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল। শেষে তারা তাদের শেষ গ্রেনেডটি ব্যবহার করে নিজেদেরই উড়িয়ে দেয়।

আমাদের মিটিং-এর সময় ডা. আবদুল্লাহ নর্দান এলায়েন্সের কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তারা ছিলেন অসম জুটি। মাসুদ ছিল সৈন্য। তার দেশীয় পাঞ্জশির উপত্যকার পশমি টুপি ও অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত থাকতো; ডা. আবদুল্লাহ ছিলেন পেশাদার ডিপ্লোম্যাট-কূটনীতিবিদ। কেতাদুরস্ত স্যুটে বুটে সজ্জিত—ব্লু জ্যাকেটের বুক পকেটে লাল রুমালের একটা কোনা বের হয়ে থাকতো। সাদা মাড়-দেওয়া কড়া ইস্তিরি করা সার্ট, সিলভার কাফ-লিঙ্ক। কিন্তু তার চেহারা ছিল প্রতারণামূলক, ভ্রান্তিজনক (ডিসপেটিভ)। ডা. আবদুল্লাহ হত্যাকাণ্ড দেখেছেন। ১৯৮০-র দশকে তিনি কাবুলে চোখের সার্জেন হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, তারপর ১৯৮৫ সালের দিকে তিনি পাঞ্জশিরে মাসুদ বাহিনীতে যোগ দেন এবং একটি মেডিক্যাল ক্লিনিক স্থাপন করেন। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি, পাঞ্জশিরে মাসুদ ফোর্সের ওপর সোভিয়েত বাহিনী বেশ কয়েক বার প্রচণ্ড আক্রমণ করে এবং ডা. আবদুল্লাহর ক্লিনিক এ সময় খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আহত লোকজনদের সেবা ও চোখের ব্যামো সারাতে ডা. আবদুল্লাহ যেন সময় দিতে পারেন না।

পাঞ্জশিরের পর ডা. আবদুল্লাহ সার্বক্ষণিকভাবে মাসুদ বাহিনীতে কাজ করতে শুরু করেন। প্রথমে কমান্ডার মাসুদের সেক্রেটারির কাজ করে তিন বছরের মধ্যে বিদেশ মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। ২০০১ সালে মাসুদের হত্যার পর (৯ই সেপ্টেম্বর) ডা. আবদুল্লাহর জন্য আমেরিকানদের প্রচেষ্টায় সহযোগীরূপে বিন লাদেনের সংবাদ সংগ্রহ ও তার এবং তালিবানদের বিরুদ্ধে মিলিটারি অপারেশন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বিন লাদেনের সাথে 'আমিরুল মুমেনিন' মোল্লা ওমরের কেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এটা একটা প্রশ্ন। সম্পর্কটা কেমন? জোর গুজব যে উভয়ের মধ্যে একটা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল উভয় পরিবারে। সম্ভবত বিন লাদেন মোল্লা ওমরের কন্যাদের মধ্যে একটির পাণি গ্রহণ করেন। কিন্তু তালিবান কর্মকর্তাদের যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি, তারা এ সংবাদ অস্বীকার করে। (২০০০ সালে বিন লাদেন যে তার চার নম্বর শরিয়তি স্ত্রী গ্রহণ করে, সে মহিলা ছিল ইয়েমেনি)।

তালিবান এবং বিন লাদেন কোন পরিপূর্ণ (পারফেক্ট) সম্পর্ক ছিল না। বিন লাদেন তালিবানদের অতিথি ছিল সত্যি এবং তাকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে আগ্রহী ছিল না এটাও সত্যি, কিন্তু তালিবান আন্দোলনের নেতাদের কাছে বিন লাদেন ছিল মাথাব্যথার কারণ, কেননা বিন লাদেন সব সময়ই আমেরিকা ও অন্য মুসলিমদের শত্রু ভেবে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা আঘাত হানার পরিকল্পনা তালিবানদের কাছে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণীয় ছিল না, কারণ এতে আফগানিস্তানের পক্ষে অন্য দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকাশ যে, ১৯৯৮ গ্রীষ্মের শুরুতে তালিবানরা সৌদি আরবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে বিন লাদেনকে সৌদি জেলখানায় পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু আফ্রিকায় আমেরিকান দুটো এম্বেসিতে বোমা ফাটানোর জন্য এবং পরবর্তীতে আফগানিস্তানে ইউএস মিসাইল আঘাতের কারণে সৌদি আরবের সাথে সে 'ডিল' চৌপাট হয়ে যায়।

১৯৯৯ ফেব্রুয়ারিতে বিন লাদেনের সাথে আফগান হোস্টদের টেনশন তুঙ্গে উঠে। আলকুদস্ আল আরাবি সংবাদপত্রের মতে, মোল্লা ওমর রমজান শেষে ঈদ উপলক্ষে বিন লাদেনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে এসে তাকে (বিন লাদেন) তার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে উপদেশ দেয়। ১৯৯৮–এর ডিসেম্বরের শেষে বিন লাদেন জনসম্মুখে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হুমকি দিলে মোল্লা ওমর বিরক্তি প্রকাশ করে। নিউইয়র্ক টাইমস একটা ঐতিহাসিক সংবাদ পরিবেশন করে এই মর্মে যে, তালিবান সেনাদের সাথে বিন লাদেনের দেহরক্ষীদের মধ্যে সম্ভাব্য বন্দুকযুদ্ধ হয়ে গেছে। আফগান কর্মকর্তারা এ সংবাদ অস্বীকার করে, কিন্তু বলেছিল তারা বিন লাদেনকে ১৯৯৯ ফেব্রুয়ারির দিকে সকল রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখতে। বিন লাদেনের সেটেলাইট ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মাত্র দশজন দেহরক্ষীকে তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর বিন

লাদেন বিশ্ব মিডিয়ার কাছে ইন্টারভিউ দেয়া বন্ধ করে দেয়। (পরিবর্তে, তার লেকচার ও জনসম্মুখে উপস্থিতি ভিডিও টেপে ধারণ করে প্রচার করার জন্য আরব বিশ্বে পাঠান হয়)।

২০০১ সালে জুন মাসে, মোল্লা ওমর বলে যে বিন লাদেনের সব ফতোয়া বাতিল, অচল; কারণ এসব 'ফতোয়া' জারি করার মত তার কোন ধর্মীয় কর্তৃত্ব নেই। মোল্লা ওমরের এ বক্তব্য কতটুকু আফগানদের কাছে গ্রহণীয় ছিল এটাই প্রশ্ন। কেননা আফগান ধর্মনেতারা সৌদি আরবে আমেরিকান সেনাদলের অবস্থিতির কারণে বিন লাদেন দেয়া 'ফতোয়া'-কে সমর্থন করেছিল।

যদি তালিবানরা বিন লাদেনকে আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছা করতো তাহলে অনেক আগেই তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো আক্রমণ করে ভেঙে দিতে পারতো, চালু রাখতো না। ঐসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যেসব অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করা হয় তা সবই তালিবানদের কাছ থেকে কেনা। এক আফগান সাংবাদিক আমাকে বলেছিল, পেশওয়ার, কোয়েটা ও লাহোরের মাদ্রাসা থেকে ১৯৯৯ শেষে কাবুলে যারা এসেছিল সামরিক ট্রেনিং-এর জন্য, সেই সব পাকিস্তানির সাথে কথা বলে জানতে পারে যে, তারা শুধু পাকিস্তানি নয়, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সমাবেশ ও সংমিশ্রণ।

ইউএস কর্মকর্তা, পাকিস্তানি ও আফগান সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে আমি গুনে দেখেছিলাম ২০০০ সালের দিকে আফগানিস্তানে ডজন খানেকের মত ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। একজন ইউএন কর্মকর্তা, যিনি নিয়মিতভাবে এদেশে আসেন, তিনি বলেছিলেন, যে আরব ও চেচেন যোদ্ধাদের জন্য একটি ট্রেনিং ক্যাম্প জালালাবাদের দক্ষিণে বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল; এখানে বিন লাদেন বছরের পর বছর ধরে এটি পরিচালনা করতো।

ডা. আবদুল্লাহ আন্তর্জাতিক জঙ্গি ইসলামীদের ট্রেনিং -এর জন্য চারটি প্রধান ক্যাম্প চিহ্নিত করেন। খোস্তের কাছে যেটা ছিল ১৯৯৮ সালে আগস্ট মাসে আমেরিকান ক্রুজ মিসাইল তা ধূলিস্যাৎ করে দেয়, কিন্তু পরে সেটা পুনর্নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয়টি জালালাবাদ এলাকায় হাদ্দার কাছে-এটা বিন লাদেনের দল ব্যবহার করে। তৃতীয়টি কাবুলের দক্ষিণে চারাসায়েরে এটা একদা গুলবুদ্দিন হিকমতিবারের ' বেস' ছিল। আমি এই ঘাঁটি (বেস) ১৯৯৩ সালে দেখেছি। এটা ট্রেনিং-এর জন্য উপযুক্ত এবং আদর্শ ক্যাম্প ছিল, শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য বড় ব্যারাকও তৈরি করা হয়েছিল। চতুর্থ ক্যাম্পটি ছিল উরুজগান-এ, আফগানিস্তনের মধ্য-দক্ষিণে।

১৯৯৯-এর মধ্যে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা, যারা তালিবানদের সমর্থক ছিল, এই ট্রেনিং ক্যাম্প সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো, কারণ এই ক্যাম্পের গ্রাজুয়েটরা তাদের শিক্ষা ও দক্ষতা ব্যবহার করতে শুরু করলো শিয়া-সুন্নির সংঘর্ষে-যাতে শতশত মানুষ খুন হতে লাগলো। জেনারেল মুশাররফ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হবার

এক সপ্তাহ পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরিফ ঘোষণা করেছিলেন : আমাদের কাছে জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে যে আফগানিস্তানে ট্রেনিং ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের শিক্ষিত করে পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে আমাদের লোকজনকে হত্যা করার জন্য। ২০০০ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের সামরিক সরকার তালিবানদের আঠারোটি ট্রেনিং ক্যাম্পের একটা লিস্ট দিয়েছিল যেখানে পাকিস্তানি জঙ্গিদের শিক্ষা দেয়া হয়। এরপর তালিবানরা কাবুলের কাছে দুটো ট্রেনিং ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়।

মোদ্দা কথা, তালিবানদের, অধিকাংশ ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো সচল রাখা হয়, যদিও বিদেশ মন্ত্রী ওয়াকিল আহমদ মুতাওয়াক্কিল ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে সিএনএন-কে বলেছিল আমাদের আর ট্রেনিং ক্যাম্পের দরকার নেই বা কোন লোকজনকে সামরিক শিক্ষা দেয়ার আগ্রহ নেই। এইসব ক্যাম্প এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেছে। যেহেতু তালিবানরা ঐ ক্যাম্পগুলো বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়, তাই প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন ক্যাম্পগুলোর বন্ধ করার কাজটি তিনিই করে দেবেন, তালিবানদের আর কষ্ট করতে হবে না।

১৯৯০-র দশকের শেষ দিকে তালিবান সরকার কিছুটা নমনীয় ভাব ধারণ করলেও ২০০১ সালে তালিবান সরকার কট্টরবাদীদের মুঠোয় এসে যায়। ঐ বছরের শুরুতে মোল্লা ওমর সমস্ত স্থাপত্য মূর্তি-শিল্প ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দেয় এই কারণে যে মানুষের আকারে মূর্তি তৈরি অনৈসলামিক। সে মতে, আফগানিস্তানের অসাধারণ ও অমূল্য সম্পদ হাজার বছরের বুদ্ধিস্ট প্রতীক চিহ্ন, যা বুদ্ধিস্ট সংস্কৃতিকে ধারণ করে ছিল এতোকাল ৩য় এবং পঞ্চম শতাব্দি থেকে, সে-সব মূর্তি ধ্বংস করে ফেলা হয়। তালিবানদের এই ন্যক্কারজনক কুকর্মকে সারা বিশ্ব-মুসলিম বিশ্বসহ-নিন্দাবাদ জানানো হয়-বিশেষ করে যখন ঘোষণা দেয়া হয় যে দুটি একশো ফুটের অধিক উচ্চ বৌদ্ধ-মূর্তি ভেঙে দেয়া হবে। মধ্য আফগানিস্তানে বিশাল পাথরের চাঙড় কেটে তৃতীয় ও পঞ্চম শতাব্দিতে যে মূর্তি তৈরি করা হয় এবং যা দেখার জন্য ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পর্যটকদের বিপুল ভিড় জমতো, ২০০১ সালে মার্চ মাসে তালিবান সেনারা আর্টিলারি ও বিস্ফোরক দ্বারা সে মূর্তি দুটো ধ্বংস করে দেয়। তারপর হিটলারের, ন্যুরেমবার্গ আইনের স্মরণে ও প্রতিধ্বনিতে তালিবান সরকার আদেশ জারি করে যে আফগানিস্তানে হিন্দুদের হলুদ রং-এর পরিচ্ছদ পরিধান করতে হবে এবং তাদের বাসস্থানও হলুদ বর্ণে চিহ্নিত করতে হবে। তাদের আরও বলা হল যে তারা মুসলিমদের সাথে বাস করতে পারবে না।

তালিবান শুধু তই নয়, আন্তর্জাতিক এজেন্সির কর্মচারীদের এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার পরিবেশকে দুরূহ করে তুললো ২০০১ সালে আগস্ট মাসে, তালিবান সরকার চব্বিশজন সাহায্যকারী সংস্থার কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে দু'জন আমেরিকান, বাকিরা আফগান ও বিদেশী। অভিযোগ ছিল ঐসব সংস্থা সাহায্য দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করছে। এ

অপরাধের শাস্তি হল বিভিন্ন মেয়াদে জেল বা বিদেশীদের বিতাড়ন আর আফগানিদের মৃত্যুদণ্ড।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তালিবানরা জেদ ধরেই থাকলো, তারা বিন লাদেনকে হ্যান্ডওভার করবে না। মনে হচ্ছে যেন তালিবান আন্দোলন ও বিপ্লব জ্যাকোবিন পর্যায়ে ঠেকেছে, কিন্তু হারমিডোরকে দেখা যাচ্ছে না।

সুতরাং আফগানি জেহাদি আন্দোলন সচল থাকলো এবং জোরদার হল। জঙ্গি যোদ্ধারা কাশ্মির থেকে ভারি অস্ত্র দিয়ে ট্রেনিং নিতে এল। একটি সন্ত্রাসী দল আফগান মুজাহিদিন কমান্ডারের নামে ফিলিপিন্সে পশ্চিমা টুরিস্টদের অপহরণ করতে থাকলো। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কিরগিজস্তানে মধ্য এশিয়ান ইসলামিস্ট জঙ্গিরা নিজ নিজ সরকারের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে শিক্ষা নেয়ার দক্ষতা ব্যবহার করতে থাকলো এবং মিশরীয় জঙ্গিদল যারা আফগানি প্রশিক্ষণ নিয়ে বসবাস করেছিল তারা মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান স্থাপনায় আক্রমণ করার জন্য তাগিদ দিল।

যেহেতু ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে আঘাত হানার পর এটা পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হল যে, আফগানিস্তানে অবস্থিত প্রশিক্ষিত জঙ্গিদল এখন যুক্তরাজ্যের জন্য প্রধান জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায়—নয়

ইয়েমেনের ধর্মযোদ্ধারা : ইউএসএস কোলে-তে বোমা

(The Holy Warriors of Yeman : The Bombing of the USS Cole)

Faith is Yemeni, wisdom is Yemeni

Yemeni proverb

The heads of the unbelievers flew in all directions, and their limbs were scattered. The victory of Islam had come, and the victory [we scored] in Yemen will continue.

Osama bin Laden speaking about the bombing of the USS Cole on al-Qaeda recruitment videotape, 2001.

এক গুমোট গরমের দিন। আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন। ১২ অক্টোবর ২০০০, সকাল বেলা, দুইজন ইয়েমেনি আদেনের সাদান বন্দরে একটি নিশান ট্রাক চালিয়ে এলো। ট্রাকযোগে ছোট একটি নৌকা নিচে নামালো। নৌকাটিতে পাঁচশো থেকে সাতশো পাউন্ডের এক্সপ্লোসিভ ভরা ছিল। তারা জানতো যে তাদের মিশন পূর্ণ করার জন্য সুযোগ পাওয়ার আশা কম। কেননা যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস কোলের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় নেবে জাহাজে তেল ভরতে। একটি বারো বছরের ছেলেকে কিছু পয়সা দিয়ে তারা তাদের গাড়িটাকে লক্ষ্য রাখতে বলে। নৌকোটিকে ঠেলে সমুদ্রে নামিয়ে নিল। সেখান থেকে মাত্র পনের মিনিট লাগতে পারে সেখানে পৌঁছতে, যেখানে বিশাল ডেস্ট্রয়ারটি নোঙর করা আছে।

যুদ্ধ জাহাজের ডেকে ক্রু-রা দাঁড়িয়েছিল। বোমাবাজদের উপস্থিত বুদ্ধি উদয় হল, তারা ক্রুদের হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে সরাসরি স্বর্গে যাবার আশায় দুইজন ইয়েমেনি তাদের আরব্ধ কর্ম সেরে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ছোট নৌকার এক্সপ্লোসিভ ফেটে ভীষণ শব্দ হল। যুদ্ধ জাহাজ 'কোলে'-র রি-ইন ফোর্সড স্টিল

হাল-এ ৪০'×৬০' ফুট গর্ত হয়ে গেল। সতেরজন আমেরিকান নাবিক প্রাণ হারালো, আরও জখম হল ৩৯ জন। ক্ষতির পরিমাণ কোয়ার্টার বিলিয়ন ডলার।

এর পূর্বে কোন সন্ত্রাসী দল ইউএস যুদ্ধজাহাজ আক্রমণ করেনি, তাই এ বোম্বিং-এর ঘটনা পেন্টাগনকে সাংঘাতিকভাবে আহত করলো। এটা ঘটা ঠিক হয়নি, কেন এবং কি করে হল পেন্টাগনের কাছে অদ্ভুত ঠেকছে।

গত দশ বছরে, ইয়েমেন আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিম জঙ্গি সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে বেশ বদনাম কামিয়েছে। কারণ এর দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিস্তৃত পর্বতমালা সন্ত্রাসীদের ট্রেনিং নেবার উপযুক্ত স্থান। এখানকার সন্ত্রাসীদল বেশ কয়েকটি আমেরিকান ও ব্রিটিশ টারগেটে আক্রমণ করেছে এবং যদিও আফগানিস্তানের মত ইয়েমেন এখনো সত্যিকারের জেহাদি রাষ্ট্র বলে গণ্য হয়নি, মনে হচ্ছে এরা এখন সেই দিকেই ছুটছে। আফগানিস্তানের মত পাহাড় ও শুকনো ভূমিক্ষেত্র ইয়েমেনে নেই, আরব সাগরের তীরে অবস্থিত এবং সুয়েজ খালের প্রতি তার গতি গুরুত্বপূর্ণ। ইয়েমেন এখন তাই সবার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে এর অবস্থান এমনি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেখান থেকে পশ্চিমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা সম্ভব।

ইয়েমেনের রাজধানীর উত্তর দিকে সরজমিনে বিষয়টি দেখার জন্য যাত্রা করলাম, যে রাস্তা উপরে অবস্থিত তাকে বলা হয় কানা জানা সান (Kidnappers Allay) তাই সরকার থেকে সশস্ত্র প্রহরী দেয়া হল আমার সাথে। টয়োটা পিক-আপে চড়লাম-সাথে ভারি অস্ত্র নিয়ে ইয়েমেনি সেনা সদা সতর্ক অবস্থায় আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চললো। আমার প্রথম সমস্যা হল এই সেনাদল সাথে রাখলে আমার কাজ হবে না। কোন প্রকারে এদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে, আমি উপজাতি সর্দার শেখ মোহাম্মদ বিন শাজেয়ার সাথে দেখা করলাম। শেখ সাহেব ঐ সারা এলাকাটা খবরদারি করে। বিস্তীর্ণ এলাকা, তার মরু দুর্গ থেকে উত্তর বর্ডারে সৌদি আরবের বিরাট সরু এলাকা-এমটি কোয়ার্টার। আমার মনে হল এই শেখ সাহেব ইয়েমেনের প্রভাবশালী উপজাতি সর্দার-ইয়েমেনের অন্ধকার জগতের খবরাখবর রাখে। এ ঘটনার কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে।

সার্দাতে এসে আমরা সেনা-রক্ষীদের 'গুডবাই' জানালাম, সম্ভবত তারা মনে করলো আমরা কোন স্থানীয় টুরিস্ট এলাকা ঘুরতে যাচ্ছি এবং তার পরেই হঠাৎ করে বিন শাজেয়ার বন্দুকধারী মানুষ আমাদের সাথে যোগ দিল। বন্দুকধারীরা ফটাফট পিক-আপে উঠে পড়তেই আমাদের গাড়ি পূর্ব দিকে কয়েক ডজন মাইল এগিয়ে গেল পাহাড় ও টিলার মধ্য দিয়ে। সে এলাকায় জনমানবের বসতি নেই।

ঠিক এই সময় সাঁই সাঁই করে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে দুটো গুলি চলে গেল। বিন শাজেয়ার বন্দুকধারী ওমর শরীফ তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে তার চকচকে কালাশনিকভ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার সাথে যোগ দিল আমাদের ড্রাইভার তার নিজের রাইফেল ও পিস্তল হাতে নিয়ে পরিস্থিতির

মোকাবেলা করতে। এর পরেই একটা লক্কর মার্কা পিক-আপ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে গেল এবং সেই গাড়ি থেকে তিনটি যুবক হাতে অস্ত্র নিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালো। তারপর দুই পক্ষে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। পরে ঐ তিনজন যুবক বললো যে তারা আমাদের কোন ক্ষতি করতে চায়নি, শুধু এ পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাই দুটো ফাঁকা আওয়াজ করে। যাই হোক এটা তাদের বানানো গল্প বলে মনে হল। আমার দোভাষী জানালো যে তাদের মতলব ছিল কিডন্যাপ করা, কিন্তু প্রতিরোধ কড়া থাকায় হাল ছেড়েছে।

ঘটনা যাই হোক, এটা তাদের গোত্র ভব্যতার বিরুদ্ধ। উপজাতিদের মধ্যে একটা সামাজিক রীতি আছে যা মেনে চলতে হয়। ঐ তিনজন যুবকের নেতা ওমর শরীফকে তার অস্ত্রটা গছিয়ে দিয়ে ব্যাপার মিটমাটের ব্যবস্থা করলো, যাতে গোত্র প্রধানদের কানে না যায়, তা হলে মামলা অনেক দূর গড়াতে পারে। এই অঞ্চলে কোন বিবাদ বাধলে তা সমাধান হয় অস্ত্রের দ্বারা।

মনে হল আমাদের যাত্রাটা ইয়েমেনের অভ্যন্তরে চলে যাচ্ছে। এ দেশ সন্ত্রাস ও অপহরণের জন্য ইতিহাসে বেশ ভালো স্থান করে নিয়েছে। ইয়েমেনি সরকারের অস্থিতিশীল অবস্থা দেশকে ঠেলে দিয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্বে ও গৃহযুদ্ধের দিকে। কমিউনিস্ট লড়ছে জাতীয়তাবাদীদের সাথে এবং ইসলামিস্ট জঙ্গিদের সাথে। এর ধারাবাহিকতা চলেছে ১৯৯৪ পর্যন্ত আর আঠারো মিলিয়ন লোকের মধ্যে পয়ষট্টি মিলিয়ন অস্ত্র-শস্ত্র বিলি-বন্দোবস্ত হয়েছে। এবার অংকটা কষে দেখুন।

কোলে বোম্বিং-এর কয়েক মাস পূর্বে ইয়েমেনের ওপর একটি মুভি পিকচার রিলিজ হয়। পিকচারটির নাম 'Rules of Engagement'. এর নায়ক স্যামুয়েল এল. জ্যাকসন, এক মেরিন অফিসারকে অন্যায়ভাবে চার্জ করা হয় যে, সে কয়েকজন ইয়েমেনি সিভিলিয়ন হত্যা করেছে। মুভির প্রথম দৃশ্য এক বিশাল সশস্ত্র জনতা সানা-তে আমেরিকান এম্বেসি ঘেরাও করে তছনছ করছে। স্পষ্টত এটা হলিউডের চিত্রায়িত মুভি কাহিনী। আসলে ইয়েমেনে আমেরিকান এম্বেসি কোন অরক্ষিত ভাঙা-চোরা ভবনে অবস্থিত নয় যাতে কোন জনতা ইচ্ছামত হামলা করতে পারে। আমেরিকান এম্বেসি রাস্তা থেকে অনেক দূরে জেলখানার মতো সুউচ্চ দেয়াল বেষ্টিত আর মজবুত গার্ডপোস্ট। অবশ্য ঐ মুভি পিকচারে কিছুটা সত্য ভাষণও আছে-তা হলো অস্থিতিশীল ও অস্থির চিত্ত ইয়েমেনি জনগণ যা দেশের শিথিল শাসনব্যবস্থার কারণে ঘটেছে। 'Rules of Engagement'—ঐ অবস্থাটা চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছে। 'কোলে' আক্রমণের একদিন পর, ব্রিটিশ এম্বেসিতে একটা বোমা ফেটেছিল। এতে বাইরের দেয়াল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কয়েকটি জানালা উড়ে যায়। কারণ, বোমা ফেটেছিল ভোর ছ'টায়, তাই কেউ মরে নি, বা আহত হয়নি। ২০০১ সালে জানুয়ারি মাসে একটি প্লেন আমেরিকান এম্বাসাডারকে ইয়েমেনে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় হাইজ্যাক হয়। হাইজ্যাক করেছিল একজন স্ব-ঘোষিত প্রো-ইরাকি জঙ্গি। কোন ক্ষতি হয়নি, কেননা হাইজ্যাকারকে সহজেই

কাবু করা হয়। ২০০১–এর জুন মাসে সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে, এফবিআই এজেন্ট 'কোলে' আক্রমণ বিষয়টি তদন্ত করার পর ইয়েমেন থেকে সব কিছুই তুলে নেয়া হয় এবং আমেরিকান এম্বেসিতে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া। ইয়েমেনি পুলিশ দশজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে–যাদের কাছে বোমা বানানোর মালমসলা পাওয়া যায়; গ্রেনেড ও আমেরিকান এম্বেসির এলাকার ম্যাপও পাওয়া যায়। এদের সাথে বিন লাদেনের যোগাযোগ আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

ইয়েমেনের বন্য আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মধ্যযুগীয় নগর ও ভবনের নিদর্শন থাকার কারণে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরাতন সানা নগরী শতাব্দিকাল ধরে প্রাচীন কাদা–মাটির মিনি–স্কাইস্ক্র্যাপার (বারতলা পর্যন্ত) এবং বিশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী–কেক, রুটি ইত্যাদির আকার–আকৃতি ও স্বাদ ভিন্ন রকম। উঁচু ভবনের চিলেকোঠাকে 'মাফরাজ' বলা হয় এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কামরা, কেননা এখানে ইয়েমেনি লোকেরা একসাথে বসে বিকালে 'কাত'–চিবায় আর গুলতানি করে। 'কাত' এক প্রকার সবুজ পাতা, তেঁতো, কিন্তু মৃদু মাদকতা জাগিয়ে দেয় যে কারণে আড্ডা জমে যায়।

শহরগুলো গোলক ধাঁধার মতো একবার ঢুকলে বের হওয়া মুস্কিল, অতি পরিচিত গাইড ছাড়া বিপদে পড়তে হয়। এই গলির দু'পাশে হাজার রকমের কারবার—আধুনিক দ্রব্যাদি থেকে বহু শতাব্দি–প্রাচীন এন্টিক দ্রব্যও খুঁজে পাওয়া যায়; তবে জহুরি ব্যক্তি না হলে প্রতিপদে ঠকে যাবার চান্স আছে।

রমজান মাসের শুরুতে আমি গিয়ে পৌঁছলাম। মাত্র চাঁদ দেখা গেছে।

এই পবিত্র মাসে ঘড়ি উল্টে দেয়া হয়। ব্যবসা–বাণিজ্য ও কায়–কারবার শুরু হয় পড়তি বেলায় এবং বন্ধ হয় রাত তিনটের দিকে। অস্বাভাবিক সময় সিডিউল। মধ্যরাতে সানা–র ডাউন–টাউনের অবস্থা দেখে আমি অবাক, ঠিক যেন ম্যানহাটেনের মত কর্মমুখর। সব দোকান পর্যন্ত পুরো দমে কারবার চালাচ্ছে। কালো বোরখা না পরে মেয়েরা রাত দুটো/তিনটেয় পেপ্‌সি টানছে স্ট্র দিয়ে। রাত একটায় ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমার হোটেলে ঢাকঢোল বাজিয়ে গান হচ্ছে–'রাস্তাফারি, রাস্তাফারি, সিনসেমিল্লা, সিনসেমিল্লা'–এই বলে এক আল্লাহর নাম স্মরণ করে রাতের খাবারের (সেহরি) আহ্বান জানায় এবং তারা যে 'কাত' পাতা চিবোয়, তাতে অনেকের হারবাল অষুধের কাজ করে।

আমি প্রথম যখন 'কাত' পাতা চিবোই, তেঁতো ঘাসের মতো মনে হল। যখন এর রস গিলে ফেললাম, তীব্র একটা ধাক্কা খেলাম যেন ডাবল মার্টিনি গিলে ফেলেছি। যদিও এটা মদের মতো 'নিষিদ্ধ' দ্রব্য নয়, কিন্তু দ্রব্যগুণ মদের চেয়ে অনেক গুণে বেশি, তাই ইয়েমেনের পুরুষ মানুষ প্রধানমন্ত্রী থেকেই নিচের স্তরে সবাই চিবোয় অথচ ইসলামী শরিয়া আইন ভঙ্গ হয় না।

মাত্র ছয় সপ্তাহ পার হয়েছে 'কোলে' বোম্বিং–এর পর, কিন্তু তবুও যখন আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটি, লোকে আমাকে দেখে হাত নাড়ে, হাসে। আমার

হোটেলের ঠিক বিপরীত একটি ওভারপাস আছে বড় কোল অক্ষরে সাইন বোর্ড আঁকা 'ওসামা'—যা আমার ইয়েমেনে আগমনের উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আরব উপসাগরে ইয়েমেন সবচেয়ে দরিদ্র দেশ, কিন্তু সানা-র রাস্তা মার্সিডিস ও টয়োটা, ল্যান্ড ক্রুজারে ঠাঁসা—কেউ কেউ হয়তো বেশ 'রিয়াল' কামাচ্ছে। তবুও ইয়েমেন দেশটি গণতান্ত্রিক পন্ধতির পথে বেয়ে উঠে আসার চেষ্টা করছে। ১৯৭৮ সাল থেকে এদেশের প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল আলী আবদাল্লাহ সালিহ একটা নতুন রাজনৈতিক প্রথা চালু করেছেন, যাকে এককথায় স্বৈরাচারী-গণতন্ত্র বলা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য বেশিরভাগ দেশে হয় ডিক্টেটরশিপ ও রাজতন্ত্র চলছে, এখানে যদিও প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ তবুও একটা পার্লামেন্ট আছে বা শক্তির উৎস এবং এখানে বিভিন্ন দল-মতের প্রতিনিধি বর্তমান-ইসলামিস্ট ট্রাইবাল ইসলাহ্ পার্টি এবং ছোট জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী দলসহ। তাই ইয়েমেনকে সাধারণভাবে আরব দেশের মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ বলা যেতে পারে—এটা তাদের জন্য মৃদু তোষণ-বাক্য।

তবুও জাতির এই স্বাধীনতা থেকে ১৯৯০-র দশকে জেহাদি দলের উত্থান ঘটেছে। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আফগানিস্তানে লাদেন গ্রুপের সবচেয়ে বেশি রিক্রুট ছিল ইয়েমেনি।১৯৮৯ সালে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষে, অনেকেই ইয়েমেনে ফিরে আসে, সাথে নিয়ে আসে সহযোদ্ধাদের—সিরিয়া, জর্ডন ও মিশরের লোক—যারা নিজের দেশে ফিরে গেলে গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ১৯৯১ সালে, উত্তর ইয়েমেনের পার্বত্য অঞ্চলে একটা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আফগান-আরবদের জন্য। এই ক্যাম্প ছিল সাদা শহরের নিকটে। এদিকে বিন লাদেন ইয়েমেনের দক্ষিণে আকয়ান প্রদেশে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য অর্থ যোগান দেয়।

এই আফ়গান-আরবরা প্রথমে ইয়েমেনে আমেরিকান মিলিটারি টারগেট আক্রমণ করে ১৯৯২ সালে ডিসেম্বরে, 'কোলে' আঘাতের আট বছর আগে। তখন আদেনে দুটি হোটেলের বাইরে বোমা ফাটে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় একশো-র মত আমেরিকান সার্ভিসম্যান যেখানে ঘাঁটি গড়েছিল বুবুক্ষু সোমালিদের সাহায্য করার জন্য, যার নাম ছিল 'অপারেশন রেস্টোর হোপ'। কয়েকজনের প্রাণহানির পর এই 'অপারেশন' প্রত্যাহার করা হয়। বিন লাদেনের ভাষায় এই 'সাহায্য-অপারেশন'-এর নামে আমেরিকা মুসলিম জাতির মধ্যে তাদের সামরিক ঘাঁটি বাড়ানোর মতলবে গিয়েছিল।

আদেনের বাইরে 'পশ' হোটেল 'মোভেনপিক' ও 'গোল্ড মোহর'-এ বোমা ফেটেছিল; একজন অস্ট্রেলিয়ান টুরিস্ট ও হোটেল কর্মী মারা পড়ে, কোন আমেরিকান হতাহত হয়নি। একজন ইউএস আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে এই আক্রমণের পেছনে বিন লাদেনের কারসাজি আছে, কিন্তু এই বিষয়ে এগোনো যাবে না কারণ ফরেনসিক এভিডেন্সে এ সন্দেহের কোন দানা

খুঁজে পাওয়া যায়নি। হোটেল বোম্বিং-এর কয়েক দিন পর, পেন্টাগন ঘোষণা দিল যে, তারা সোমালিয়া অপারেশনের জন্য ইয়েমনকে আর সাপোর্টিং ' রেস' হিসেবে ব্যবহার করবে না। বিন লাদেন সিএনএন-এর কাছে এক ইন্টারভিউতে এই আক্রমণ সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা ইঙ্গিত দিয়েছিল। বিন লাদেন বলেছিল যদি ইউএস মনে করে যে ভিয়েতনাম, বৈরুত, এডেন এবং সোমালিয়াতে মার খাওয়ার পর, তারা তাদের ক্ষমতার দাপট দেখাবে, তাহলে তারা আবার সেই সব স্থানে ফিরে গিয়ে দেখুন নতিজা কি দাঁড়ায়। এটাকে কি যুক্তরাষ্ট্র তাদের অন্তরে সাবধান বাণী বলে ধরে নিচ্ছে?

ইয়েমেনে অবস্থিত একজন পশ্চিমা কূটনীতিক ও এক সিনিয়র ইয়েমেনি কর্মকর্তার মতে, ঐ হোটেলে যে বোমা ফাটানোর প্ল্যান কার্যকর করে তার নাম তারিক আল-ফাদলি, আদেনের কাছে আবায়ানের নির্বাসিত সুলতানের পুত্র। ১৯৯৭ সালে, দক্ষিণ ইয়েমেনের সমাজবাদী দল ব্রিটিশদের উৎখাত করে দেয়, যারা আদেনের সিটি-স্টেট এক শতাব্দির বেশি শাসন করে আসছিল। আল-ফাদলির বাবা, তার সালতানাত হারিয়ে সৌদি আরবে চলে যায় এবং তারিক আল-ফাদলি জেদ্দার বড় হয়ে লেখাপড়া করে। ১৯৮০-র দশকে দুই বছর ধরে সে আফগানিস্তানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সেখানে সে বিন লাদেনের সাথে দেখা করে এবং ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতরা চলে গেলে আল-ফাদ্‌লি ইয়েমেনে ফিরে আসে আফগান-আরবদের নেতা হয়ে। এই আফগান-আরবদের সমমনা জঙ্গিদল ছিল, কোন সংস্থা নয়। বিন লাদেন দক্ষিণ ইয়েমেনকে সমাজবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থ যোগান দেয়।

১৯৯২ সালে হোটেল বোম্বিং-এর সূত্র ধরে ইয়েমেন কর্তৃপক্ষ একটি সশস্ত্র ব্রিগেড পাঠিয়েছিল আল-ফাদলিকে গ্রেপ্তার করতে তার ঘাঁটিতে। ঘাঁটি ছিল দুর্গের মত আদেনের কাছে মারাকাশা পর্বতমালায়। পরিস্থিতি এমন ছিল যে আন-ফাদ্‌লিকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এই বোম্বিং-এর সাথে আর একজন প্রবীণ যোদ্ধা জড়িত ছিল তার নাম জামাল আল-নাহ্‌দি। আল-নাহ্‌দি আল-ফাদ্‌লির ডানহাত-সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। পরবর্তীতে, ইয়েমেন সরকার এই দুজনের কেসটি ধামাচাপা দিয়ে দেয়-অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনই নেয়া হয়নি। উল্টো আল-ফাদলিকে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত নির্বাচিত কনসালটেটিভ কাউন্সিলের সদস্য করা হয় আর তার বোনের বিয়ে দেয়া হয় প্রেসিডেন্টের পরিবারের এক সদস্য জেনারেল আলী মুহসিন আল-আহমারের সাথে। অন্যদিকে আল্‌-নাহ্‌দি সানাতে ভালো ব্যবসা ফেঁদে বসে এবং পরে ইয়েমেনের শাসক দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য হয়।

এই হোটেল বোম্বিং-এর কারণে বিন লাদেনের সাথে আফগান-আরবদের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ হয় এবং তারা ইয়েমেনে সন্ত্রাসী কারবারের প্ল্যান করে। বিন লাদেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার অভিযোগ মতে ১৯৯২ থেকে বিন লাদেনের আল-

কায়দা গ্রুপ যেসব 'ফতোয়া' জারি করেছিল তাতে বলা হয় ইয়েমেনে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিগুলোকে টারগেট করে আক্রমণ করতে।

১৯৯০-র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইয়েমেনে রাজনৈতিক অঙ্গানে যে ঠেলাঠেলি চলে তাতে আফগান-আরবদের অবস্থান মজবুত হয়। ১৯৯০ পর্যন্ত ইয়েমেন দুই দেশে বিভক্ত ছিল—উত্তরে ইয়েমেন আরব রিপাবলিক, আর দক্ষিণ দিকে ছিল মার্ক্সিস্ট পিউপল্স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন (রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধ হল : যে দেশে সরকারে 'Peoples' এবং 'Democracy' দুটোই যুক্ত থাকে তার অর্থ হল-'জনগণ' ও 'গণতন্ত্র' এই দুটোরই বারোটা বাজে-অর্থাৎ পদদলিত হয়)। ১৯৯০ সালের পর অবস্থা বেশ সহজ ছিল না দুই ইয়েমেনের মধ্যে, ১৯৯৪ সালে উত্তর ইয়েমেন সমাজবাদী দক্ষিণ ইয়েমেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেখ আবদুল মজিদ আল জিন্দানি, ইসলামী পণ্ডিত এবং ইসলামিস্ট ইসলাহ পার্টির ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠাতা এবং আফগান জেহাদের জন্য সবচেয়ে বেশি জেহাদি মানুষের যোগানদার (বিল লাদেনের মিত্র বলে পরিচিত) আফগান-আরবদের দক্ষিণ ইয়েমেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করেন এই বলে যে দক্ষিণ ইয়েমেন সমাজবাদী, খোদাদ্রোহী। এই গৃহযুদ্ধে (একরকম গৃহযুদ্ধ বলা যায়, কেননা একদল মুসলিম আর আর দল মুসলমানের হত্যাকারী) দশ হাজার সিভিলিয়ান মারা পড়ে এবং যখন আফগান-আরবরা দক্ষিণ ইয়েমেনে ঢুকে পড়ে, তখন সেখানকার একমাত্র বিয়ার (Beer) কারখানা জ্বালিয়ে খাক করে দেয়। বিজয়ী উত্তর ইয়েমেন সরকার ধর্মযোদ্ধাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের সংযুক্ত নতুন দেশের সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত করে।

যুদ্ধের পর আফগান-আরবদের নেতারা—যেমন শেখ মাল-জান্দানী এবং তারিক আল-ফাদ্‌লি প্রেসিডেন্ট সালিহ্‌র সংযুক্ত জাতীয় সরকারি অফিসে জমায়েত হয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সাইদ আবিত, সাংবাদিক ও শেখ জান্দানীর মুখপাত্র আরাবিয়ান পেনিসুলাতে আমেরিকার সামরিক সমাবেশকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে। বিন লাদেনের সাথে সে ব্যাখ্যার একটু পার্থক্য আছে। আবিতের প্রশ্ন ছিল আমেরিকানরা কি মক্কাতে ঢুকেছে? যদি না ঢুকে, তাহলে সমস্যা কোথায়? আরব দেশে মাত্র পবিত্র স্থান—মক্কা ও মদিনা। আবিত আরো বলে যে ইসলা্‌হ পার্টি গণতন্ত্রের প্রবক্তা। এই বক্তব্যে, আফগান-আরব ও ইসলামিস্ট দলের কাছে সে জনপ্রিয়তা হারায়। আমরা তার অফিসের দিকে হেঁটে যেতে দেখলাম বেপর্দা যুবতী তার অফিসের মধ্যে কাজে ব্যস্ত—এতে আমার মনে হল যে ইসলাহ মৌলবাদী ও জেহাদি দল থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

ইস্‌লাহ দলের ধারণাকে আরো মজবুত করছিল আব্দুল ওহাব আল-আনেসি। তিনি ইয়েমেনের সাবেক ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার। তার সাথে আমার পার্টির অফিসেই দেখা হয়েছিল। ঘরের মেঝেতে লাল কুশন পাতা ছিল আর হেলান দেয়ার জন্য ছিল বালিশ। আল-আনেসি ধূসর বর্ণের ওভার কোট পরেছিলেন, সাদা

আলখিল্লার ওপর। তার ব্যবহার ছিল চিন্তাযুক্ত কারণ তিনি ইসলাহ শব্দের ব্যাখ্যা দিচ্ছেলেন। তিনি বলেন 'ইসলাহ' শব্দের অর্থ সংস্কার এবং এর সাথে 'ইসলাম' শব্দ জোড়া নেই। ইয়েমেন মুসলিম দেশ ও জাতি এবং একে (এ দেশকে ও জাতিকে) কেউ একক ইসলামী পার্টি দিয়ে দাবি করতে পারবে না। 'ইসলাহ' ইয়েমেনে বহু দলের সমন্বয়ে সরকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়বন্ধ; তিনি বলেন 'ডিমোক্র্যাসি'–ই হলো ইয়েমেনের সুরক্ষিত কাঠামো।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত যখন কিছু ইয়েমেনি জেহাদি ধর্মযুদ্ধ বন্ধ রাখে, তখন আফগান–আরবের এক অংশ গাঁইগুঁই করছিল। কেননা তাদের মন থেকে আফগানিস্তানে ধর্মযুদ্ধের ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে ওঠে নি। ১৯৯৯ সালে জুলি সার্স, পেন্টাগনের একজন সাবেক সংবাদ বিশ্লেষক কয়েকজন যুদ্ধবন্দির সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। এরা তালিবান গোত্রভুক্ত। এই বন্দিদের মধ্যে দুজন ছিল ইয়েমেনি। এই ইয়েমেনিরা স্বতঃপ্রবৃত হয়েই যুদ্ধে গিয়েছিল আমেরিকানদের হত্যা করার জন্য। ১৯৯৮–এ যখন যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেনের পূর্বাঞ্চলীয় ক্যাম্প আক্রমণ করে, তখনই মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন ইমেমেনিকে শনাক্ত করা হয়।

১৯৯৭ সালে, বিন লাদেন তীব্রভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল আফগানিস্তান থেকে তার অপারেশনের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে তার পূর্বপুরুষের দেশে (অর্থাৎ ইয়েমেনে) আসবে। এই মর্মে যে তার দূত প্রেরণ করে ইয়েমেনের কয়েকজন উপজাতি সর্দারের কাছে পরিকল্পনা আঁটতে। আল কুদস্ আল–আরবি পত্রিকাকে তাই সে বলেছিল যে সশস্ত্র ইয়েমেনি উপজাতিরা পার্বত্য অঞ্চলে বিধর্মীমুক্ত করবে যেখানে তোমরা মুক্ত বাতাসে মর্যাদাসহ শ্বাস গ্রহণ করতে পারবে, অপমানিত বোধ করবে না। এই জন্যেই আমার আফগানিস্থানে থেকে ইয়েমেনে উঠে আসার পরিকল্পনা। বিন লাদেনের এই প্রস্তাব যেসব উপজাতি সর্দারের, কাছে এসেছিল সেই নেতাদের মধ্যে ছিলেন শেখ বিন আল–শাজেয়া যার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আমি ইয়েমেনে এসেছি।

পথে হাইজ্যাকার ও অপহরণকারীদের সাথে আমাদের দলের টক্কর হওয়ার পর আমাদের গাড়ি বিন শাজেয়ার দুর্গে প্রবেশ করলো। আমাদের পর্বতসঙ্কুল পথ আর থাকলো না দুর্গের মধ্যে সমতল হল। শুধু মরু অঞ্চল এখন কমলা রং–এর মত হল। শেষে আমরা বিন শাজেয়ার কম্পাউন্ডে ঢুকে গেলাম। এই কম্পাউন্ডে বেশ কয়েকটি ভিলাসহ একটি মস্‌জিদ। ভিলাগুলো শেখের বিভিন্ন স্ত্রী–র জন্য। তার স্ত্রীদের সংযোগে শেখের বিশজন পুত্র ও বিশজন কন্যা। আলাপ আলোচনার পূর্বে খাওয়া–দাওয়ার পালা। ভেড়া, মুরগি, সালাদ, স্যুপ, ইয়েমেনি মধু (যৌন উত্তেজক) ইত্যাদি বহু খাদ্য–সম্ভার দ্বারা আমার খাবার প্লেট স্তূপীকৃত। আমাদের সাথে বসেছে শেখের বিশজনের মত রিটেনার ও দেহরক্ষী, সুসজ্জিত। রমজান মাস বলে আমাদের সান্ধ্যভোজনের আয়োজন ছিল উল্লেখযোগ্য।

খাওয়া পর্ব চুকিয়ে আমরা মিটিং রুমে শেখের সাথে বসলাম। মিটিং রুম বিশাল, ফুটবল মাঠের মত। শেখ প্রথমেই পরিচয় দিলেন। বললেন আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আর সানাতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন প্রেসিডেন্ট। বিন শাজেয়া এমন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যে তিনি তার নিজস্ব যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালনা করতে পারেন, যেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই। আমাদের মিটিং সময়কালে শেখের সাথে আর এক উপজাতি সর্দারের আঠারো মাস ধরে যুদ্ধ চলছিল-এ বিবাদ একমাত্র নিষ্পত্তি হয় মর্টার, রকেট ও বিভিন্ন ধরনের কামানের গোলার দ্বারা। এর মধ্যে আশি জনের প্রাণ গেছে।

শেখ আমাকে বললেন, তিনি বিন লাদেনের সাথে সৌদি আরবে কয়েকবার দেখা করেছেন, যতদিন পর্যন্ত না তাকে ১৯৯১ সালে সুদানে পালাতে না হয়। শেখ বললেন বিন লাদেনকে তিনি 'ধর্মীয় পণ্ডিত' বলে সম্মান করেন এবং সৌদি বিরুদ্ধ মানুষ হিসেবেও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বললেন : বিন লাদেনের ধর্মযুদ্ধের ডাকের প্রতি তার ধৈর্য বেশ কম-। এই বলে তিনি আমার হাতটি তার হাতে নিয়ে একটু মৃদু চাপ দিলেন।

বিন শাজেয়া বুঝিয়ে বললেন যে বিশজন উপজাতি সর্দারদের মধ্যে তিনি একজন। তারাও বিন লাদেনের দূতের সাথে সানাতে মিলিত হয়েছে ১৯৯৭-এর শুরুতে।

বিন লাদেনের দূতদের সাথে যে মিটিং হয় তাতে দু'জন সৌদি ও দু'জন ইয়েমেনি ধর্মীয় পণ্ডিত ছিল। মিটিং তিন ঘণ্টা স্থায়ী হয়। ধর্মীয় নেতারা বলেন বিন লাদেনের জন্য নিরাপত্তাসহ এক সুরক্ষিত স্থান প্রয়োজন যেখান থেকে বিন লাদেন তার অপারেশন চালাতে পারে। সৌদি আরবের বর্ডারে উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলে স্থান নির্বাচন হলেই ভালো। তার এই ডিলের জন্য কোন ক্যাশ টাকার প্রস্তাব ছিল না। (কথা বলার সময় শেখের হাত আমার হাতেই ছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে চাপ দিচ্ছিলেন)।

মিটিং-এ বিন লাদেনের দূতদের শেখের জবাব ছিল 'তোমাকে আমরা ইয়েমেনি মনে করি, আমরা তোমাকে অস্বীকার করি না; কিন্তু আমরা তোমাকে বলবো এখানে এসে তুমি কোন রাজনৈতিক বা সামরিক কর্মকাণ্ড অন্য দেশের বিরুদ্ধে চালাতে পারবে না।' একথার পর বিন শাজেয়া আমাকে বললেন আর দ্বিতীয়বার বিন লাদেন তার দূত বা এনভয় আমাদের কাছে পাঠায় নি।

বিন শাজেয়ার অন্যের বিশ্বাসের প্রতি সহনশীলতা সত্ত্বেও, ইয়েমেনে আমেরিকার বিরুদ্ধ সেন্টিমেন্ট, আবেগপ্রবণতা অঙ্কুরিত হতে বাধাপ্রাপ্ত হল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৮ সালে ডিসেম্বর মাসে আদেনের কাছে ষোলজন পশ্চিমা টুরিস্ট অপহৃত হল। ভিকটিমদের মধ্যে ১২ জন ব্রিটিশ, দুইজন অস্ট্রেলিয়ান এবং দু'জন আমেরিকান নার্স, একজন পোস্টাল কর্মচারী কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং জেরক্স কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী ছিল। সকলেই ক্রিস্টমাস ছুটিতে বেড়াতে এসেছিল।

ইয়েমেনে অপহরণ একপ্রকার কুটির শিল্প বলা যায়। এর প্রসার ঘটে ১৯৯৬ ও ২০০০ সালের মধ্যে। অপহরণকারীরা এর মধ্যে ১৫০ জন হোস্টেজ ধরেছে। তার মধ্যে ১২২ জন বিদেশী। অপহরণ সাধারণ ক্যাশ কামাবার জন্য কিম্বা স্থানীয় অভাব-অভিযোগ মোচনের জন্য; কিন্তু অপহৃত ব্যক্তিদের ওপর কোন প্রকার দুর্বব্যহার বা অত্যাচার করা হয়নি। কিন্তু ১৯৯৮ সালে এই পরিস্থিতি অন্য রকম মোড় নেয়, অহিংস পন্ধতি সংহিসতে রূপান্তরিত হল আর এর জন্য দায়ী আদেনের ইসলামিক আর্মি (আইএএ), যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল আল-কায়েদা; তাই দুই ঘণ্টা ধরে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধের পর চারজন হোস্টেজ ও তিনজন অপহরণকারী প্রাণ হারায়।

আইএএ'র (ইসলামিক আর্মি অব আদেন) বাহিনী বেশ চমকপ্রদ। ইয়েমেনের জেহাদি গ্রুপের সম্পর্ক শুধু ইয়েমেনের বিদায়ী কর্মকর্তাদের সাথে নয় বাইরের জঙ্গিদের সাথেও সম্পর্ক রয়েছে। এ যেন গিলবার্ট ও সুলিভানের মধ্যে ফার্সের (Farce) সাথে সেক্সপেরিয়ান ট্রাজেডি সাথে কাফকার সংমিশ্রণ। এ সম্পর্কে উষ্ণ-ঝাল-মিষ্টি কোন টাই বাদ নেই।

প্রথমে দলের ভিলেনের কথা ধরা যাক। যে লোকটা অপহরণের অপকর্মটি পরিচালনা করে তার নাম জয়েন আল-আবদায়েন আল-মিহদার। তবে আবু হাসান নামেই সুপরিচিত। বয়স বত্রিশ। (খালিদ আল-মিহদার আবু হাসান গোত্রের এক সদস্য, সম্ভবত আত্মীয়, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে)। আবু হাসান বিন লাদেনের সাথে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে এবং পরে ইয়েমেনে এসে ১৯৯৭ সালে ইসলামিক আর্মি অব আদেন (আইএএ) প্রতিষ্ঠা করে। আইএএ যখন আর্মির মত ছিল না, সে সময় ১৯৯৮ সালে আফ্রিকায় ইউএস এম্বেসি বোম্বিং সম্বন্ধে প্রশংসা করে সংবাদ প্রচার করতে থাকে। বিদেশী পশ্চিমা টুরিস্টদের অপহরণ করার অপরাধে যখন পরিশেষে তার বিচার শুরু হয়। আবু হাসান তার হোস্টেজদের 'শূকর ও বানরের নাতি" বলে উল্লেখ করে বলে যদি তার পিস্তলটি 'জ্যাম' হয়ে না যেতো তাহলে আরো বেশি হোস্টেজ হত্যা করতে পারতো।

অন্য আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হল মিশরীয় আবু হামজা যাকে ইয়েমেনি সরকার আইএএ'র তকমা বলে অভিহিত করত। যদি সত্যি এটা সেক্সপিয়ার হয়, তাহলে আবু হামজা হবে বোকারাম যে নাটকের ভেতরে ও বাইরে ঘোরাঘুরি করে মন্তব্য করে—যা অর্থপূর্ণও হয় আবার অর্থহীনও হয়। ইয়েমেনি সরকার বলে যে, আইএএ'র মাস্টার মাইন্ড, কিন্তু আবু হামজা নিজেকে শুধু 'মিডয়া-উপদেষ্টা' বলে পরিচয় দেন। তাকে ইয়েমেনে দেখা যায় না, দেখা যাবে লন্ডনে হাজার মাইল দূরে ফিনস্‌বেরি পার্কের মসজিদে। সেখানে তিনি ইমামতি করেন। এই মসজিদ লন্ডনের বিখ্যাত ফুটবল টিম আর্সেনাল স্টেডিয়ামের রাস্তার ওপর অবস্থিত। আরব কট্টর বিরুদ্ধবাদীরাও আবু হাসানকে একজন রসিক ব্যক্তি বলে মনে করতো, কেননা তিনি ইসলামী পণ্ডিতও ছিলেন না

কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তার রসালাপগুলো সময় সময় মারাত্মক আকার ধারণ করতো।

আমি ১৯৯৯-এর নভেম্বর মাসে আবু হাসানের সাথে দেখা করি তার আধুনিক মসজিদে, যদিও উনবিংশ শতাব্দির ভবনের একটি অংশ বলে মনে হত। হলের সামনে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে ছিল নামাজিদের কাছে চেচনিয়ার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। লেখা ছিল 'ভাইসব মুক্ত হস্তে দান করুন, কারণ রাশিয়ানরা আমাদের চেচনিয়া ভাইদের কেমিক্যাল বোমা বর্ষণ করে মেরে ফেলছে।' টেবিলের ওপর বিক্রির জন্য টেপের ক্যাসেট সাজানো থাকতো। কয়েকটির শিরোনাম ছিল 'জেহাদ কেন'? এবং 'দুষ্ট আমেরিকার জন্য দুঃখ করবেন না'–আবু হামজা ওয়াজকৃত।

রাজনৈতিকভাবে এটা মনে করা ভুল হবে না যে আজকাল চলচ্চিত্রে যেসব সন্ত্রাসী বোমা মেরে ঘরবাড়ি উড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে কি কোন আরব চরিত্র হলিউড চিত্র নাট্যকার চিত্রিত করছেন। যদি করেন, তাহলে আবু হামজা একটা চান্স দিতে পারেন। দেখতে ইয়া লাশ, বিরাট বপু, টিপিক্যাল আফগান সালোয়ার কামিজ পরনে, মাথার ব্রাউন উলের টুপি। তার দিকে চেয়ে দেখলে মনে হবে তার একটা চোখ অনড় এবং এ দিয়ে তিনি তার নিশানা ঠিক করতেন আফগানিস্তানে। দেখতে বন্ড ভিলেনের মত। চলচিত্রে পারফেক্ট ভিলেন চরিত্র।

যেহেতু আমরা তার সাগরেদ বেষ্টিত ছিলাম, সেই কারণে ইংল্যান্ডে এসে লন্ডনে সোহো রেড লাইট এলাকায় তার প্রথম ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি। আর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেয় কল্যাণ ভাতা তিনি গ্রহণ করেন কিনা সে কথাও জিজ্ঞাস করি নি। নিউইয়র্ক টাইমস রিপোর্টার জন বার্নাস এই মসজিদে ছ'মাস আগে এসেছিল এবং বেফাঁস কিছু বলার জন্য তার এক আলজিরিয়ান সাগরেদ তার দিকে বন্দুক তাক করে মারে আর কি; সেই কারণে আমি চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করি। কিন্তু আমি শুধু একটা প্রশ্ন করেছিলাম–তা হল তার জীবনী সম্বন্ধে। আবু হামজা ১৯৫৮ সালে মিশরে আলেক্সজান্দ্রিয়ায় মুস্তাফা কামাল এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে চলে আসেন ব্রাইটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন (তিনি ১৯৮৬-এ গ্রাজুয়েট হন)। ছাত্রাবস্থায় তিনি শেখ ওমর আবদেল রহমানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শেখ ওমর মিশরের জেহাদি আন্দোলনের আধ্যাত্মিক নেতা।

আবু হামজা সেই অন্ধ শেখ ওমর আবদেল রহমানের চরিত্রের প্রতীক রূপে নিজেকে উপস্থাপন করে। অন্ধ শেখ এখন যুক্তরাষ্ট্রের জেলে আবদ্ধ নিউইয়র্ক সিটি ল্যান্ড মার্ক উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার জন্য। ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে আবু হামজা এক পশ্চিমা মহিলাকে শাদি করে। এখন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই যুগলের একটি সন্তান আছে নাম মোহাম্মদ। ১৯৮৭ সালে আবু হামজা, আফগান জেহাদের–প্রধান জেহাদি-নিয়োগকারী, আবদুল্লাহ

আজমের দেখা পান সৌদি আরাবিয়াতে হজ্জের সময়। আজমকে বর্তমান কালের জেহাদের মস্তবড় স্ফুলিঙ্গ বলে আখ্যায়িত করে।

আফগান ধর্মযুদ্ধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আবু হামজা ১৯৮৯ ও ১৯৯৩ মধ্যে বেশি সময় আফগানিস্তানে ছিলেন। সেখানে জালালাবাদের পূর্ব দিকের শহরে স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে নারানঘর প্রদেশে প্রধান প্রকৌশল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে থেকে বহু ঘরবাড়ি নির্মাণ করেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাইন উদ্ধার করে এলাকা মুক্ত করেন। ১৯৯৩ সালে, তিনি বলেন, আমার এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এইজন্য তিনি লন্ডনে ফিরে এসে মসজিদে শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং সেই সাথে সংস্থা গড়ে তোলেন। তার সংস্থার নাম সাপোর্টার অব শরিয়া (এসওএস)। তার সহযোগী ছিলেন আফগান যুদ্ধ ফেরতা বয়স্কা ধর্মযোদ্ধারা।

এসওএস প্রচার শুরু করে যে জেহাদ সবার জন্য ফরজ শুধু বৃদ্ধ, অন্ধ ও নারী ছাড়া। ওয়েবসাইটে আলোচনা করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়। এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করে—'আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য তালিবানের সাতে সাক্ষাৎ করা—তারপর জেহাদে যোগ দেয়া কিম্বা অন্তত সেই উদ্দেশ্যে ট্রেনিং গ্রহণ করা। তালিবানদের সাথে একবছর থেকে প্রশিক্ষণ নিতে আফগানিস্তানে কত মার্কিন ডলার খরচ হতে পারে?' এর জবাবে বলা হয়েছে পাকিস্তানে টুরিস্ট হিসেবে ভিসার জন্য দরখাস্ত কর যার মেয়াদ ৯০ দিন—এই ৯০ দিনের মধ্যে সেখানে একজন মুসলিম আরবকে ধরে আফগানিস্তানে ঢোকার চেষ্টা কর—আমি মনে করি না যে সব মিলিয়ে খরচ দু'হাজার ডলারের বেশি হবে। অর্থাৎ ২০০০ মার্কিন ডলার খরচ হতে পারে এইভাবে আফগানিস্তাকে প্রবেশ ও একবছর প্রশিক্ষণের খরচ। অন্য একটি সূত্রে বলা হয়, পাকিস্তানে এমন কতকগুলো ব্যাংক একাউন্টস আছে যেখানে অর্থ জমা দিতে হয় হরকত-উল-মুজাহিদিন-এর নামে। এরা বিন লাদেনের সাথে সংযুক্ত; ১৯৯৯ সালে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স্-এর বিমান ছিনতাই করেছিল এই দল। এদের নামে অর্থ জমা হলে তারা পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে যাবার বন্দোবস্ত করে দেবে।

নর্থ লন্ডনের মসজিদে তার অফিসে বসে আবু হামজা আমাকে বলেছিলেন যে, ১৯৯০-এর মধ্যভাগে তিনি বসনিয়া যাওয়া আসা করেছেন দুস্থ মুসলিমদের সাহায্য করতে। মধ্য বসনিয়ার জেনিকাতে তিনি বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন শত শত আরবদের জেহাদ ঘাঁটি তৈরি করার জন্য। বসনিয়াতে সার্বরা হাজার হাজার মুসলিম নিধন করেছিল দেশটাকে নিষ্কটক খাঁটি যুগোস্লোভিয়া সৃষ্টি করার জন্য।

নব্বই দশকের শেষের দিকে আবু হামজা দৃষ্টি দেন ইয়েমেনের দিকে। তিনি বললেন আমি ইয়েমেনে ইসলামিস্টদের জন্য আওয়াজ জোরদার করার চেষ্টা করি। আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসা মুজাহিদিনদের সাথে যোগাযোগ করি যারা উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনে বাস করছিল। এদিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে তাদের সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার চেষ্টা করছিল। এই সময়ে আবু হামজা

সেটেলাইট চ্যানেলে আবির্ভূত হয়ে সারা মধ্যপ্রাচ্যে বাণী প্রচার করে ইয়েমেনে সব অমুসলিমদের হত্যা করার জন্য আহ্বান জানান। এই কেসসূত্রের কারণে ইয়েমেনি জঙ্গিরা আবু হাসানসহ আবু হামাজার ডাকে সাড়া দিয়ে আইএএ প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য ইয়েমেনি সরকারি আবু হামজাকে আইএএ'র (ইসলামিক আর্মি অব আদেন) মাস্টার মাইন্ড বলে।

১৯৯৮-এর শেষের দিকে ইংল্যান্ডে বসবাসরত এশিয়ান ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিবারে প্রজন্মের একটি দল-ব্রিটিশ মুসলিম-ইয়েমেনে এসে পৌঁছল। এই দলের সাথে আবু হামজার বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। আবু হামজার পুত্র মোহাম্মদ, এক জামাতা এবং তার এসওএস গ্রুপের প্রেস অফিসার—এরাও ইয়েমেনে এলো। এই দলের সকলের বয়স ১৭ থেকে ৩৩-এর মধ্যে এবং লন্ডনে মিডল্যান্ড এলাকায় বড় হয়েছে। এদের কারোর সামরিক ট্রেনিং ছিল না, কেউ স্কুলে, কম্পিউটারে, একাউন্টিং, ইন্সুরেন্স ইত্যাদিতে কাজ করতো। এই দলে আটজন সদস্য ছিল, ইয়েমেনে এসেছিল ছুটি কাটাতে, কিম্বা আরবি ভাষা শিখতে।

কিন্তু ১৯৯৮ সালে ২৪ ডিসেম্বর ট্রাফিক পুলিশ আদেনের কাছে একটি গাড়ি থামালে মজার খবর বেরিয়ে পড়ে। এই গাড়িতে ঐ আটজনের তিনজন ছিল, তারা ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে পালাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের ফলে ধৃত ব্যক্তিদের বাড়ি তল্লাশি করে টুরিস্টদের কোন সামানা পাওয়া যায় না, বদলে পাওয়া গেল মাইন, রকেট লঞ্চার, কম্পিউটার, এনক্রিপটেড কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট এবং বিভিন্ন ধরনের অডিও ক্যাসেট এবং ভিডিও। এসব দ্রব্যাদি আবু হামজার এসওএস সংস্থার। ইয়েমেনি সরকার প্রমাণ পেল যে এইসব ব্রিটেনবাসীর সাথে আবু হাসানের আইএএ'র গূঢ় সম্পর্ক আছে; এবং এদের মধ্যে কয়েকজন পরিকল্পনা করেছে, ক্রিস্টমাস উৎসবে আদেনে এংগ্লিক্যান চার্চ, ব্রিটিশ কনসুলেট, আমেরিকান ডি-মাইনিং টিম এবং মোভেনপিক হোটেলে বোমা আক্রমণ চালাবে। (ছ'বছর আগে মোভেনপিক হোটেল বিন লাদেন গ্রুপ বোমা আক্রমণ করেছিল)। একজন পশ্চিম দেশীয় ডিপ্লোম্যাট ইয়েমেনে আমাকে বলেছিলেন যে 'ব্রিটেনবাসীদের মধ্যে তাদের গ্রেপ্তারের পূর্বে আবু হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। আরবি শিক্ষক বেছে নিয়েছিল বটে!'

আদেনে আটজন ব্রিটিশ নাগরিক সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের বক্তব্য যে, তাদের মধ্যে পাঁচজন যারা তিন থেকে সাত বছরের মেয়াদে ইয়েমেনে জেল খাটছে, তারা ন্যায্য ও ন্যায় বিচার পায়নি, কেননা প্রসিডিংসের পূর্বেই ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট তাদের দোষী সাব্যস্ত করে ঘোষণা দেন। ঐ আটজনের ডিফেন্স ল'ইয়ার বলেন যে এদের মধ্যে অনেককেই জবরদস্তি ও জুলুম করে মিথ্যা স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা যা-ই হোক ক্রিস্টমাসের পূর্বে এই ব্রিটিশ নাগরিকদের গ্রেপ্তার পরবর্তীতে ফল ভাল হবে না, বলে অনুমান করা হয়।

সোমবার ২৯ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নের একটু পূর্বে একটা ঘটনা ঘটল। পশ্চিমা টুরিস্টদের একটি দল ইয়েমেনের পাহাড় অঞ্চলে মরু এলাকায় গাড়িতে যাচ্ছিল, সেই সময় একদল অপহরণকারী বাকুজা, আরপিজি ও কালাশনিকভ রাইফেলে সজ্জিত হয়ে এই টুরিস্টদের কিডন্যাপ করতে এলো। কারণ সরকার তাদের জঙ্গি ভাইদের জেলে পুরেছে। অপহরণকারীরা দলে বিশজন ছিল। তারা দেখলো যে, কয়েকটা রোভার ল্যান্ড ক্রুজারে চড়ে আদেনের দিকে বিদেশীরা যাত্রা করেছে। প্যাসেঞ্জাররা সকলেই কাফের, বিধর্মী এবং তারা প্রার্থনা করলো যেন ঐ পশ্চিমারা আমেরিকান হয়। তাহলে তাদের নেতা আবু হাসান এদের হোস্টেজ করে তার ব্রিটিশ কমরেডদের মুক্ত করতে পারে।

একটা ল্যান্ড ক্রুজারে নিউইয়র্ক রচেস্টারের জেরক্স কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট মেরি কুইন ছিলেন; তিনি এসেছিলেন এই মধ্যযুগীয় শহর ইয়েমেন ভিজিট করতে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন 'আমাদের প্রায় তিনশো কিলোমিটারের মত মরুর মধ্য দিয়ে যাত্রা করার কথা ছিল। আমরা পাঁচটি চার–চাকা চালিত (ফোর হুইল ড্রাইভ) টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজারে মরু পথ বেয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। তখন একটা পিক–আপ ট্রাক আমাদের গাড়ি আটকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথমে সঙ্কেত পেলাম বন্দুকের আওয়াজে। আমি ভেবেছিলাম আজকে বোধ করি দিনটি ভাল যাবে না। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝে ওঠার আগে বন্দুকধারীরা আমাদের গাড়ি ঘিরে ফেললো এবং আমাদের মরুর মধ্য দিয়ে নিয়ে গেল। আমরা প্রায় বিশ মিনিট গাড়ি ড্রাইভ করে গভীর, সংকীর্ণ উপত্যকায় (ravine) এসে পৌঁছিলাম।

মেরি কুইন মেটিরিয়াল সায়েন্সে পিএইচডি, ভালো বিজিনেস এক্সিকিউটিভ। তিনি দেখেন যে অপহরণকারীরা সংখ্যায় আঠারো জন, সকলের টান টান অবস্থা, এই মারে তো সেই মারে। একজনের হাতে একটা সেটেলাইট টেলিফোনও ছিল। দলকে দেখে মনে হয় সবাই গ্রাম্য স্থানীয়। তাদের মধ্যে কেবল একজনই ইংরেজি বলতে পারে। মেরি কুইন বললেন সেই ইংরেজি জানা সন্ত্রাসী আমাকে জানাল যে আমাদের অপহরণ করা হচ্ছে, কেননা ইয়েমেনি সরকার তাদের কয়েকজন ইংলিশ কমরেডকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা আরও বললো, যে এর পূর্বে যখন ১৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে চারশোর বেশি ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করে এবং ছয়শো বোমাবর্ষণ করে অপারেশন ডেজার্ট ফক্সের নামে, তখন তারা তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। মেরি কুইনকে আরো জানানো হয় যে তারা ইরাকে বোমাবর্ষণের জন্য দায়ী নয়। তাদের সরকার দায়ী। মেরি কুইন তাই আমাদের বলেছিলেন যে সন্ত্রাসীরা আমাদের গ্রুপকে হোস্টেজ করে কিডন্যাপ করে যেহেতু সেই গ্রুপে দু'জন আমেরিকান ছিল। তিনি আরও জানান যে আমাদের কিডন্যাপ করার পর চব্বিশ ঘণ্টা পার হলে আমাদের খেয়াল হল যে আমাদের উদ্ধার করা হচ্ছে। তখন একটা হট্টগোল অবস্থা, বন্দুকযুদ্ধ চলছে দু'তরফ থেকে। গ্রেনেড ফাটছে। দুঘণ্টা ধরে এ অবস্থা চলল। তিনি বিজ্ঞান

বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়ায় এবং তার অভিজ্ঞতায়, তিনি অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে শান্ত অবস্থায় থাকলেন। আমাদের মানব-ঢাল করা হল। একজন সন্ত্রাসী আহত হলে, আমি তার একে-৪৭ রাইফেলের নল চেপে ধরে এবং টানাটানি করতে করতে তার হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিই। কুইন মূলত নিউ ইংল্যান্ডের মেয়ে, ছেলেবেলায় মারপিট করার অভ্যাস ছিল। তাই আহত সন্ত্রাসীকে লাথি মেরে ফেলে বন্দুকের বাঁট দিয়ে এক গোঁত্তা মারে তার মাথায়।

ইয়েমেনি সরকার এর পূর্বে একজন কিডন্যাপারের হাত থেকে হোস্টেজ উদ্ধারে লিপ্ত হয়নি, তাই ইয়েমেনে ডিপ্লোম্যাটদের তাদের উদ্ধার পরিকল্পনার কথা অবহিত করতে ভুলে গিয়েছিল। জানালে হয়তো বিদেশী ডিপ্লোম্যাটরা তাদের এ উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দিত না, কেননা ইয়েমেনি আর্মিদের সে বিশেষত্ব নেই। কিন্তু ইয়েমেনি সরকার জানায় যে কিডন্যাপাররা প্রথমে গুলি চালায়, কিন্তু সেটা সত্য ছিল না।

সুটিং চলার সময়, আবু হাসান তার সহযোগী ও সামা আল-মাসরিকে (মিশরের জেহাদি গ্রুপের সদস্য এবং আল-কায়েদার অংশ) বলেছিল, মেয়ে হলেও ছাড়বি না, গুলি করে দিবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আল-মাসারি এই যুদ্ধে মারা যায়, তাই তদন্তকারীরা মিশরের জেহাদি গ্রুপ ও বিন লাদেনের সাথে তার সূত্র সন্ধান করতে পারে নি। এই দুই দলই পূর্বে যৌথভাবে ঘোষণা দেয়-'আমেরিকান ধর, আর মারো।'

এই উদ্ধার-কর্মে (রেসকুউ অপারেশন) তিনজন ব্রিটেন ও একজন অস্ট্রেলিয়ান (নারী পুরুষ মিলে) মারা পড়ে। এতে ছিলেন ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রভাষক ডক্টর পিটার রাও। তার স্ত্রী ক্লারা মার্সটনও মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি ইউনিভারসিটি টিচার। রুথ উইলিয়ামসন, স্কটিশ স্বাস্থ্য-কর্মীকে এক সন্ত্রাসী মেরে ফেলে; আরও মারা যায় মার্গারেট হোয়াইট-হাউস, ইংলিশ প্রাইমারি স্কুল টিচার। তাকে মানব-ঢাল করা হয়েছিল, সে স্বামীর সামনেই মারা যায়।

১৯৯৯-এর জানুয়ারি মাসে আবু হাসান ও আরও দু'জনের বিচার শুরু হয়। আবু হাসান তার অপরাধ অস্বীকার করে নি। আবু হাসান বলেছিল অপহরণের পর তার সেনাদল আদেনের ব্রিটিশ ও আমেরিকান টারগেট আক্রমণ করার প্ল্যান করেছিল, তাছাড়া চার্চেও আক্রমণ হত, কেননা আরব পেনিনসুলাতে চার্চের ঘণ্টা আর মসজিদে আজান দুই ধর্মের দুই রকম প্রার্থনার ডাক থাকতে পারে না। তার এই স্বীকৃতি ইয়েমেনের জেলখানায় যে ক'জন ব্রিটিশ মুসলিম আটক ছিল, তার পক্ষে কোন সহায়তা করতে পারে নি।

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়। আবু হাসানের সাথে ইয়েমেনি সরকারের ইসলামিস্ট এলিমেন্টদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা? কিডন্যাপিং ট্রায়ালের সময় এই সম্পর্কের কিছুটা সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল সেই ড্রাইভারের সাক্ষ্যে যাকে টুর কোম্পানি নিয়োগ করেছিল। সে সাক্ষ্য দিল যে আবু হাসান জেনারেল আলী মুহসিন আল-আহমেরকে সেটেলাইট ফোন থেকে 'কল' করেছিল। এই জেনারেল

প্রেসিডেন্ট সালিহ্‌র আত্মীয়, শোনা যায় যে তিনি ১৯৮০ দশকে আফগানিস্তানে বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রশ্ন হল কেন আবু হাসান তার অপহরণ প্রচেষ্টার সময় প্রেসিডেন্টের পরিবার-সদস্যের সাথে ফোনে কথা বলার সময় করে নেবে? আর একজন ড্রাইভারের বক্তব্য হল আবু হাসান একজন অজ্ঞাতনামা লোকের সাথে সেটেলাইট ফোনে কথা বলেছিল, সম্ভবত অপারেশনের মূল-গায়েনকে সংবাদ দিতে যে 'আমেরিকা ও ব্রিটিশ মার্কা ষোলশো কার্টুন, যার ওয়ার্ডার দেয়া হয়েছিল মাল পাওয়া গেছে।'-এটা ষোলজন ট্যুরিস্টকে ইঙ্গিত করে। এবং একজন স্থানীয় উপজাতি সর্দারও সাক্ষ্য দেয় যে অপহরণকারীরা তাকে বলেছিল 'আমাদের উঁচু মহলের সাথে সম্বন্ধ আছে।' আবু হাসান লন্ডনে আবু হামজাকেও 'কল' করে বলেছিল যে সে মনে করে না যে ইয়েমেনি সরকার এই হোস্টেজদের ব্যাপারে তেমন ব্যবহার করবে না, যেমন অন্য হোস্টেজ-এর ব্যাপারে করে থাকে। এই রহস্যের কোন কিনারা হয়নি কেননা তার সাথেই ইয়েমেনি সরকার ইউএসএস কোলে বোম্বিং-এর ঠিক এক বছর পূর্বে আবু হাসানের মৃত্যুদণ্ড দেয়।

এটা কাকতালীয় ঘটনা বলা যেতে পারে যে ১৯৯৮সালে ডিসেম্বরে সুদীর্ঘ আলোচনা ও মিটিং-এর পর ইয়েমেনি সরকার ইউএস ওয়ারশিপকে আদেনে তেল নেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করে। এমন কি, মোহাম্মদ আল-ওয়ালি, যে ১৯৯৮-এর আগস্ট মাসে কেনিয়াতে ইসএস এম্বেসি বোম্বিং-এ জড়িত ছিল, সে ইউএস তদন্তকারীদের আগেই বলেছিল যে বিন লাদেন গ্রুপ পরবর্তীতে ইয়েমেনে আমেরিকান জাহাজ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। আল-ওয়ালির এই সতর্কবাণীর পর আবু হাসানের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ ও ডিসিপ্লিনড ইসলামী জঙ্গিদল ১৯৯০-এ আদেনে জড়ো হলো। তারা আবু হাসানের টুরিস্ট দল আক্রমণের চেয়ে বড় কিছু একটা করার জন্য জোর প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

এই দলের সর্দার বা নেতা ছিল মোহাম্মদ ওমর আল-হাজারী, একজন আফগান যোদ্ধা। বিন লাদেনের মত সেও ইয়েমেনি গোত্রযুক্ত, কিন্তু জন্ম হয় সৌদি আরবে। একজন ইউএস তদন্তকারী একই ইয়েমেনি সাসপেক্টকে জেরা করে নিঃসন্দেহ হয় যে নাইবোরিতে ইউএস এম্বেসি বোম্বিং-এর পর, আল-হাজারী ইয়েমেন সেলের সদস্যদের জানিয়েছিল যে তাদের পরবর্তী টার্গেট হচ্ছে ইয়েমেনের ইউএস নেভি ওয়ারশিপ।

তদন্তকারীরা আরও জানতে পারে যে এই জঙ্গিরা প্রথমে পরিকল্পনা করেছিল রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড দিয়ে আক্রমণ চালাতে, কিন্তু এ পরিকল্পনা ত্যাগ করে কারণ 'আরপিজি' তেমন ফল দিবে না যে ফল তারা চায়। তাই আরপিজি ছেড়ে বোমা ভর্তি নৌকা দিয়ে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা নেয়। বোমাবুরা সি ৪ প্রয়োগ করেছিল—কারণ সি উচ্চমান সম্পন্ন বিস্ফোরক বোমা যা খুব কম দেশই তৈরি করে, তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান অন্যতম। একজন সাবেক ইউএস

ইনটেলিজেন্স অফিসার বলেন যে ওয়াটার প্রুফ সি-৪, যা কোলেতে আক্রমণ করা হয়েছিল সেটা তৈরি করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসিতে ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনের সাথে দাপ্তরিকভাবে আদেনে জাহাজ রি-ফুয়েলিং করার পূর্ব থেকেই সমঝোতার মাধ্যমে তাদের যুদ্ধ জাহাজে তেল ভরতে পারতো। এই সুযোগে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ ইয়েমেনিদের অনেক আগে থেকেই তার কাঠামো সম্বন্ধে সার্ভে করার সুযোগ পেয়েছিল এবং জাহাজের চারদিকে ছোট ছোট মাছ ধরার নৌকা অনবরত ঘুরে বেড়াতো, এতে নাবিকদের কেউ ছোট নৌকাদের সন্দেহের চোখে দেখতো না।

কোলে যুদ্ধজাহাজকে সাফল্যজনকভাবে বোম্বিং করার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বুঝতে হলে আদেন বন্দরের ভৌগোলিক অবস্থানটা জানা দরকার। আদেন বন্দর পৃথিবীর স্বাভাবিক বন্দরের মধ্যে একটি, যার বেলাভূমি থেকে গভীর সমুদ্রে চলে যাওয়া যায়। তাই বন্দরের কাছাকাছি বড় বড় তেলের ট্যাঙ্ক নোঙর করা থাকে। দু'টো উপসাগরের সমন্বয়ে গলদা চিংড়ির দাঁড়ের মতো আদেন বন্দরকে আলিঙ্গন করে আছে। বন্দরের আশেপাশে পরিচ্ছন্নভাবে গৃহ নির্মাণ করা আছে। এদের মধ্যে অনেকগুলো ব্রিটিশ সরকার তৈরি করেছিল। যখন তারা এই বন্দর ১৯৩৮-এ দখল করে। এটা ব্রিটিশ সরকার ছেড়ে দেয় ১৯৬৭ সালে। উপসাগরের, অন্য দিকে আদেনের প্রধান বন্দর, যাকে ব্রিটিশরা বলত 'স্টিমার পয়েন্ট।'

বোমারুরা ছোট আদেন বন্দরের নির্জন অনিয়মিত পথটি ব্যবহার করেছিল এবং সেইভাবে তাদের মোটর বোটে বোমা ভর্তি করে ব্যবহারের উপযুক্ত করে। তারা ঐ নির্জন স্থানটিতে পনের ফিট উঁচু কারোগেটেড টিন দিয়ে দেয়াল খাড়া করে, নৌকা প্রস্তুত করে লোকচক্ষুর আড়ালে।

স্টিমার পয়েন্ট উপসাগরে তারা অন্য একটি বাড়ি ভাড়া করেছিল টিলার ওপর যেখান থেকে তারা বেশ ভাল করে আমেরিকান জাহাজগুলোকে তেল ভরতে দেখতে পেত। ছোট আদেন বন্দরের কাছে তাদের বোমা তৈরির কাজ চলতো সেখানে থেকে স্টিমার পয়েন্টে বিন লাদেনের পরিবারের নির্মাণ ব্যবসার কোম্পানি অবস্থিত। উপরে বড় করে সাইন বোর্ড দেয়া 'বিন লাদেন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।' বোমারু দল ছোট আদেন থেকে এই কোম্পানিতে যাওয়া আসা করতো। বিন লাদেন পরিবার আদেন বিমানবন্দর পুনঃনির্মাণ করেছিল, যা গৃহযুদ্ধের সময়, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৯৯৪ সালে। সুতরাং এই নির্মাণ কোম্পানির সাথে বোমরুদের যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

একটি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজকে ডুবিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয় ৩ জানুয়ারি ২০০০-এ অর্থাৎ রমজানের পবিত্র দিনে সবে কদরের রাতে যখন কোরান নাজেল হয়েছিল। এই পবিত্র দিনে যদি বোমাবাজরা তাদের প্রচেষ্টায় মারা যেতো তার ধর্মীয় গুরুত্ব ছিল অনেক, কিন্তু তা হয় নি। কেউ মারা যায় নি। যে নৌকাটি বোমা বোঝাই করে ছোট আদেনের বিচ থেকে ছাড়া হয়েছিল তা

সাথে সাথেই ডুবে যায়। যদিও বোমবাজরা প্রতিবেশীদের মাছের কারবারি বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু বোটের মাল কি করে বিতরণ করা হবে তা জানতো না। তাদের টার্গেট ছিল ইউএসএস ডেস্ট্রয়ার সুলিভানস্–ক্রুরা জনাতো না যে পলকের জন্য তারা বিপদ এড়িয়ে গেছে।

ইউএস–এর কাউন্টার–টেরোরিজম–এর জাতীয় সমন্বয়কারী রিচার্ড ক্লার্ক ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছিলেন যে 'সুলিভানেস'–এর ওপর আক্রমণের সময় একই সাথে জর্ডনের জঙ্গিদের প্ল্যান মাফিক আম্মানের 'রেডিশন' হোটেল–এ বোমা মারার কথা ছিল। ঐ হোটেলে তখন আমেরিকান টুরিস্ট দল জর্ডান নদী এলাকা পরিদর্শনে যায়। এই নদীর সাথে সাধু জনের (যিনি ক্রাইস্টদেরকে ব্যাপ্টাইজ করেছিলেন)সাথে যোগাযোগ ছিল। এদিক দিয়ে এ স্থান ও নদী পবিত্র বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই প্ল্যানও কার্যকর হয়নি।

এই সময়, যখন এই সন্ত্রাসী কারবার সাফল্য লাভ করলো না, তখন ওসামা বিন লাদেন ও দলের অন্য নেতারা আফগানিস্তানের কান্দাহারে এক ধর্মীয় স্কুলে (মাদ্রাসা) জড়ো হয়। তাদের মিটিং জেহাদ মিডিয়া দ্বারা ভিডিও টেপ করা হয়, এবং এই টেপটি ইউএস তদন্তকারীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বেশ কতকগুলো কারণে।

প্রথমত, বিন লাদেনকে বয়স্ক মনে হচ্ছে, দাড়ির কিয়দংশ পাকা এবং একটা জাম্বিয়া পরনে ডজন খানের ছবির–মধ্যে বিন লাদেনকে এর পূর্বে কখনো ইয়েমেনি খঞ্জরসহ দেখা যায় নি। দ্বিতীয়ত, তার প্রধান পরামর্শদাতা ও ডানহাত, আইমান আল–জাওহারি, মিশরীয় জেহাদি গ্রুপে নেতা, বলেছেন অনেক কথা বলা হয়েছে, আলোচনাও হয়েছে এখন সময় এসেছে অবিশ্বাসীদের (আমেরিকান) বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেয়ার কারণ আমেরিকা মিশরে, ইয়েমেনে ও সৌদি আরবে সেনা সমাবেশ করেছে। আর শেষ কারণ হল, ঠিক এই সময় বিন লাদেনের চতুর্থ স্ত্রী ইয়েমেনের আবায়ান প্রদেশ থেকে আসে। এই সব ঘটনা নিশ্চয়ই বিন লাদেনকে খোশ করেছে।

টেপে বিন লাদেন বলেছে এই পবিত্র রাতে আমাদের শপথ...ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পবিত্র ভূমি (আরাবিয়ান পেনিনসুলা) থেকে উৎখাত করা। এত মনে হয় যে এই মিটিং ও ভিডিও টেপ ৩ জানুয়ারি ২০০০–এ ধারণ করা হয়।

বিন লাদেন ক্যালেন্ডার দেখে তার প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক করে। ১৯৯৮–এর মে মাসে, সে আফগানিস্তানে একটি প্রেস কনফারেন্স করেছিল এবং সেখানে বলে যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুভ সংবাদ এসে পৌঁছবে। নয় সপ্তাহ পর, আফ্রিকাতে ইউএস এম্বেসিতে বোমা ফাটানো হয়।

জানুয়ারি (২০০০) যখন কোন ফলাফল ছাড়া নৌকাটা ডুবে গেল, বোমাবাজরা তড়িঘড়ি শহর পরিত্যাগ করে তাদের কার্যালয়ে নতুন পরিকল্পনা শুরু করে। এবার যেন বিফল না হয়। মোহাম্মদ ওমর আল হারাজি 'কোলে' আক্রমণের পূর্বে আদেনে যায় অর্থ ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। তারপর, এক

ইয়েমেনি সিনিয়র অফিসিয়েলের মতে, সে ইয়েমেন ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে যায় সফল আক্রমণের পর। এম্বাসাডার মাইকেল শিহান বলেন ঠিক একই সময়ে বহু সংখ্যক লোক ইয়েমেন ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে যায়।

আদেনে মাত্র দুইজন আত্মঘাতী বোমাবাজ রয়ে যায়। প্রথমজন আবদুল্লাহ আল-মুসাবি নাম ধরে একটা নকল আইডেনটিটি কার্ড গ্রহণ করে ১৯৯৭ সালে আদেনের ইসলামিস্ট ঘাঁটি লাহেজ থেকে। তার আসল নাম ছিল হাসান সাইদ আওয়াদ আল-খামরি এবং সে ছিল ইয়েমেনি। তার বয়স ২৫/২৬-এর মতো এবং বিন লাদেনের মতো সে হাদ্রামাতের লোক। একটি ফটোগ্রাফে খামরি তার চোখে চশমা ছিল আর ছিল ভারি দাড়ি সারা মুখে। অন্য আত্মঘাতী বোমারুকে শনাক্ত করা হয়নি তবে ইয়েমেনি বলে সন্দেহ করা হয়, কিন্তু বাস করতো সৌদি আরবে।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আরও লোক ছিল। জামাল আল-বাদাউ নিজেই স্বীকার করেছিল যে সে আফগানিস্তানে বিন লাদেনের ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, সে ইয়েমেনে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতো এবং বোমাবাজদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রও সরঞ্জাম কিনতো। অনুরূপভাবে, ফহদ আল-কোসোর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, সে স্টিমার পয়েন্টে এক অবজারভেশন হাউসে '১০১০১০' কোড ধারণ করে, কোলে বোম্বিং-এ ভিডিও টেপ করার দায়িত্বে ছিল; কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সূত্র হারিয়ে ফেলে।

যেসব নাবিক ঐ বিস্ফোরণে মারা যায় তারা অধিকাংশ আমেরিকার ছোট শহরের বাসিন্দা যেমন, উডলিফ, নর্থ ক্যারোলিনা, রেক্স, জর্জিয়া, কিংসভিল, Texas; এবং পোর্টল্যান্ড, নর্থ ডাকোটা। সবচেয়ে বেশি বয়সী নাবিক ছিল ৩৫ বছরের এবং অনেকে ছিল টিন এজার। মার্ক নিটো উইনকনসিনের ফন্ড ডু ল্যাক থেকে; বয়স ২৪ বছর। সে কোলের বিশাল ইঞ্জিনরুমে কাজ করতো; সে মারা যায়। চাকরি হয়েছিল নেভিতে প্রায় ছয় বছর এবং আর মেয়ে বন্ধুর সাথে বিয়ে পাকাপাকি হয়েছিল। তার মেয়ে বন্ধুর নাম জামি দ্য গুজম্যান। সেও কোলের নাবিক ছিল। নিটোর মা বলেছিল তার পুত্রের আকাশচুম্বি উচ্চাশা ছিল এবং সেখানে সে পৌঁছতে পারত। মাত্র সে জীবন আরম্ভ করেছিল।

কোলে যেখানে নোঙর করা ছিল সেখান থেকে আধ মাইল দূরে আব্দুল আজিজ হাকিমের বই-এর দোকান ছিল—এ দোকান তার পরিবারের সদস্যরা চালু করে ১৯৪৬ সালে। ১৯৬০ সালে যখন পৃথিবীর মধ্যে ব্যস্ততম বন্দর ছিল ব্রিটিশ আমলে তখন এই বই দোকান বিভিন্ন ধরনের পুস্তক ও মেগাজিনে ঠাঁসা ছিল। কোলেতে বিস্ফোরণের পর এই দোকানের সলিড পাথরের ভিক্টোরিয়ান বিল্ডিং-এর জানালাগুলো উড়ে যায়। দুই মাইল দূরে শহরের মালা অঞ্চলের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার বলেছিল যে, এই আওয়াজ ও কম্পনে সে ভেবেছিল ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

১৯৯৩ তে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে এবং ১৯৯৫-এ ওকলাহামা সিটি ফেডারেল বিল্ডিং-এ যে আক্রমণ হয় সকলে ভেবেছিল এটা দুর্ঘটনা। তেমনি 'কোলে'-র

ঘটনাকেও দুর্ঘটনা ভাবা হয়েছিল। ইয়েমেনি সরকার পরস্পর বিরুদ্ধ রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে অনেক দিন ধরে স্বীকার করেনি যে 'কোলে'-র ঘটনা সন্ত্রাসীদের কাণ্ড। অন্যদিকে ওয়াশিংটনে ইউএস কর্মকর্তারা ভোরে উঠে যখন বেসরকারিভাবে এই ঘটনার সংবাদ পেল, তখন অনেকেই এই বিস্ফোরণের প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দিহান ছিল।

চারদিনের মধ্যে বিষয়টিকে নিউইয়র্ক অফিসের এফবিআই-এর কাছে ট্রান্সফার করা হয়, কেননা এর মধ্যে তারা যে ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার ও আফ্রিকান এম্বেসির ঘটনার তদন্ত করে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং তারা ইসলামিস্ট সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল। এফবিআই এজেন্টস্ এতদিন ধরে যারা বিন লাদেনের পেছনে বছরের পর বছর ঘুরছে, তাদের কয়েক জনকে ইয়েমেনে পাঠানো হল। বিস্ফোরণের কয়েক মাস পর যখন আমি আদেনে গেলাম, উঠলাম গোল্ড মোহর হোটেলে, যে হোটেলটি আট বছর আগে বিন লাদনের অনুচর দ্বারা আক্রান্ত হয় বোমা ফাটিয়ে, সেই বোম্বিংয়ে হোটেলের পাঁচতল ধসে যায় এবং এখন গোল্ড মোহরকে দৃষ্টিনন্দন করে মেরামত করা হয়েছে। হোটেলটি আদেন উপসাগরে অবস্থিত। হোটেলে প্রবেশ করতেই দু'জন নিরাপত্তা প্রহরী আমার ট্যাক্সিক্যাব তল্লাশি করলো। বুঝলাম যে আমেরিকান অফিসিয়ালরা তদন্তে নিযুক্ত বলেই এই তল্লাশি। হোটেলের লবিতে এক আমেরিকান যুবতী মাথায় বেস বল ক্যাপ চড়িয়ে এক মধ্য-বয়সী মোটা-সোটা ভদ্রলোকের সাথে বাতচিত করছে—চেহেরায় মনে হল ভদ্রলোকটি এফবিআই এজেন্ট। ভুল করে অন্য ফ্লোরে লিফ্ট থেকে নামলে একজন উর্দিপরা নাবিক আমাকে স্বাগত জানাল।

হোটেল গোল্ড মোহর আমেরিকা তদন্তকারীদের দুর্গ বলে চিহ্নিত হল, এতে আশঙ্কা জাগল হয়ত ইয়েমেনি জঙ্গিরা কোন দিন বোমা মারে। তদন্তের কাজ ঢিমাতেতালে শুরু হল এবং এফবিআই এজেন্টের সাথে ইয়েমেনি পুলিশের সংস্কৃতিগত পার্থক্য নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত দেখা দেয়। ইউএস কর্মকর্তারা ভেবেছিল ইয়েমেন তাদের ইচ্ছামত তদন্ত করতে কোন বাধার সৃষ্টি করবে না। এতে মূলগত ভুলবোঝাবুঝি দেখা দেয় উভয় পক্ষের কর্মপদ্ধতিতে। ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে ইয়েমেনের উত্তর দিকে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি স্থাপনার পর, সৌদি আরবে সন্ত্রাসীরা বোমা মারে, ফলে চব্বিশজন আমেরিকান সেনা মারা যায়। এত সৌদি আরব তড়িঘড়ি করে সন্দেহের বশে চারজনের শিরশ্ছেদ করে এবং ১৯৯৬ সালে সৌদি আরব আমেরিকান তন্তকারীদের সাথে ভালোভাবে সহযোগিতা করেনি। ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট সালিহকে রাজনৈতিকভাবে ইসলাহ্ পার্টির সাথে বোঝাপড়া করতে হবে কারণ এই পার্টি পার্লামেন্টে ২০% আসন অধিকার করে। তাছাড়া অনেক ইয়েমেনি তাদের দেশে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর অবস্থানের বিরুদ্ধে। উপরন্তু সাবেক ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আল-আনেসির প্রতিক্রিয়া অন্যান্য ইয়েমেনির মত। তিনি বলেন কোলে বোম্বিং-এর অবশ্য কোন ন্যায্য কারণ নেই এবং আমি এতে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু এই ঘটনার জন্য

যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট দায়িত্ব বহন করা উচিত মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আচরণের জন্য। এটা প্যালেস্টাইন নয় এবং ইসরাইলের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের ব্যাপার নয়, এটা যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক নীতির ব্যাপার। আমেরিকার এখানে সামরিক অবস্থান অনেকেই পছন্দ করে না...যেহেতু আমেরিকা তাদের এই নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এ ধরনের ঘটনা তাদের আরও দেখতে হতে পারে।

কোলে বোম্বিং-এর এক সপ্তাহ পর, লুই ফ্রিচ, ইলিয়টনেসের মত এফবিআই ডাইরেক্টর, ইয়েমেনে এসে ইয়েমেনিদের সহযোগিতার জন্য খুব তারিফ করলেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে কোলে বিস্ফোরণের ঘটনাটা ঘটেছে একটা নৌকায় বিস্ফোরক দ্রব্য ফেটে যাওয়ার ফলে। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করে বসলো আপনি বলতে চান—নৌকাতে বোমা ? এ প্রশ্নে সকলে হেসে উঠলো।

প্রথমে ইউএস এজেন্ট দুর্বল অনুবাদ ও কড়াভাবে ছাঁট-কাট করা প্রায় ষাট জনের মত সন্দেহভাজন ব্যক্তির জবানবন্দি এবং একশো জনের অধিক সাক্ষীর লিস্ট ইয়েমেনি পুলিশের নিকট থেকে পেলো। নভেম্বরের শেষের দিকে দুই সরকার মিলে একটা চুক্তি সই করলো—যেখানে বলা হল সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরার সময় আমেরিকার এজেন্টরা উপস্থিত থাকতে পারবে এবং প্রশ্নও রাখতে পারবে। এটাই আশা করা হয়েছিল, কিন্তু ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। সাত মাস পর ২০০১ সালে জুন মাসে, ইয়েমেন থেকে এফবিআই এজেন্টরা দেশে ফিরে গেল, শুধু সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে নয়, তদন্ত পর্যায়ে ইয়েমেনিদের সাথে লাগাতার বিরোধের জন্য অর্থাৎ ইয়েমেন সরকার কোন সহযোগিতা করেনি।

ইউএস সরকার কেমন করে এই বিষয়টি তাদের হাত করলো ? ইয়েমেনে যে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ তেল নেবে সে চুক্তি আমেরিকা সরকার দাপ্তরিকভাবে ইয়েমেন সরকারের সাথে সই করলো তাদের যুদ্ধজাহাজ যে আক্রান্ত হবে সে সংবাদ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়ার অনেক পর। এটা জেনেও কেন তারা এমন চুক্তিতে সই করলো।

১৯৯৯-এ এপ্রিল মাসে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের বাৎসরিক 'প্যাটার্নস অব গ্লোবাল টেরোরিজম রিপোর্ট' ইস্যু করেছিল। ইয়েমেনের ওপর যে অনুচ্ছেদটি ছিল তা বেশ উপদেশমূলক। স্বীকার করা হয়েছিল যে ইয়েমেন সরকার তাদের দেশ হতে বিদেশী কট্টরবাদীদের ও সন্ত্রাসীদের ইয়েমেন ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, তবে আদেনের ইসলামিক আর্মি ও অধুনা বিদেশী অপহৃতের ঘটনার উল্লেখ ছিল। একবছর পরে পরবর্তী 'প্যাটার্নস' রিপোর্টে ইয়েমেনি সরকারের গীত গাইলো এই বলে যে এ সরকার কতকগুলো আন্তর্জাতিক এন্টি-টেরোরিস্ট কনভেনশন সই করেছে এবং বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ও ভ্রমণের কাগজপাতির ব্যাপারে বেশ কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে ইয়েমেন সরকারে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও অস্থিতিশীল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসী কারবারকে কাবুতে আনতে পারেনি অর্থাৎ প্রত্যন্ত

পাহাড়ি এলাকায় সরকারের শিথিল নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রয়েছে। ঐ পাহাড়ি এলাকায় যেসব দল কাজ করছে তার মধ্যে মিশরের জেহাদি দলও আছে এবং নিউইয়র্কের অভিযোগ মতে এই দল ১৯৯৮ সালে বিন লাদেন গ্রুপের সাথে মিশে গেছে।

স্পষ্টত দেখা যায় যে পেন্টাগন কর্মকর্তারা এবং ইয়েমেনে আমেরিকান 'এনভয়' বারবারা বোডিন, সাবেক কাউন্টার টেরিজম কর্মকর্তা যিনি আদেনের তেল নেয়ার চুক্তি সই করেছিলেন, তারা বিন লাদেন সম্পর্কে নিউইয়র্কের এই অভিযোগ সম্বন্ধে অজানা ছিলেন না। তারা স্টেট ডিপার্টমেন্টের টেরোরিজম রিপোর্ট সম্বন্ধেও জানতেন। তাই ন্যায্যভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে তারা এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ?

এ সম্বন্ধে তাদের পক্ষে বক্তব্য হল প্রথমত, একটি অসাধারণ প্রাকৃতিক বন্দর, শত শত মাইল ধরে এর বেড় (রেডিয়াস)। লোহিত সাগরের অবস্থান হওয়ার জন্য সুয়েজ খাল ব্রিটিশ সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছ শতাব্দি ধরে। ১৯৭০ এবং আশির দশকে, যখন দক্ষিণ ইয়েমেন সমাজতন্ত্র দেশ হল, তখন সোভিয়েতরা তাদের জাহাজে এখান থেকে তেল ভরতো। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র আশা করছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইয়েমেনের সাহায্য ও সহযোগিতা পাবে এবং আমেরিকার মুঠিতে এসে গেলে আর ইরাককে সাহায্য করতে পারবে না।

'কোলে'র বিস্ফোরণের পর মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার ইউএস ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল এন্থান জিন্নিকে মার্কিন কংগ্রেসে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি আদেনে জাহাজে তেল চুক্তির সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেন। আমি যখন তার ভার্জিনিয়ার বাসাতে গিয়ে দেখা করি, তাকে এক আদর্শ ভদ্রলোক বলে মনে হল। তিনি বললেন : আমাদের সেখানে 'রি-ফুয়েলিং' করা জরুরি ছিল। এর বিকল্প ছিল না। আদেনের নিরাপত্তা অবস্থা বিচার করে এবং জেদ্দা ও জিবুতির মত আদেনকে সমস্যা জড়িত না ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাদের যথেষ্ট ওয়েল ট্যাঙ্কার ছিল, রি-ফুয়েলিং করার জন্য, তাই বন্দরের প্রয়োজন পড়ে।

আদেনে রি-ফুয়েলিং সিদ্ধান্ত ১৭ জন আমেরিকান যুবকের প্রাণ কেড়ে নেয়। ইউএস নেভির অতি উন্নত ডেস্ট্রয়ারের যে ক্ষতি সাধন হয় তার পরিমাণ ২৪০ মিলিয়ন ডলারের মত এবং প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের গুরুত্ব ছোট করে দেয় তাদের ভাষায় ডেভিড গুলতির পাথর ছুড়ে গলিয়াতকে মেরেছে। এক সাবেক সিআইএ কর্মকর্তার ভাষ্য মতে আমাদের রি-ফুয়েলিং সিদ্ধান্ত একটা রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ, এবং স্পষ্টভাবেই অসময়োচিত। ইউএস ইয়েমেন সরকারকে ৮০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তির মুলো দেখিয়ে সই করেছে। কিন্তু আদেন ছিল তলাহীন নিরাপত্তায় রক্ষিত। কারণ তার চারদিকে সন্ত্রাসীদের আনাগোনা। তাদের জন্য দেখেশুনে প্ল্যান করা সহজ ছিল। ঘনঘন ইউএস জাহাজ সেখানে ভিড়তো, সুরক্ষার বন্দোবস্ত কমই ছিল। অন্য একজন সাবেক ইউএস ইনটেলিজেন্স কর্মকর্তা, যিনি আদেন দেখে এসেছেন, তিনি বললেন আমি মনে করি ইউএস সরকার

ইয়েমেনিদের সাথে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এ চুক্তি করেছিল। আইডিয়াটা ভালোই ছিল, একটা শত্রুদেশকে বন্ধুতে পরিণত করা।

একথা সত্য যে ইয়েমেন সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য এবং আদেন বন্দর সুরক্ষিত ছিল না, কিন্তু কারা এই বোম্বিং-এর জন্য কলকাঠি নেড়েছে, তাদের তো চিহ্নিত করা দরকার। যারা এই আক্রমণ চালিয়েছে, বিন লাদেনের মত নিশ্চয় তারা বিশ্বাস করে পবিত্র আরব পেনিনসুলাতে বিধর্মীদের অবস্থান আল্লার বিরুদ্ধে অপরাধ। আমেরিকান কর্মকর্তারা হয়ত মনে করতে পারে যে এ জন্য হয়ত সৌদি আরব বিরূপ হতে পারে, অন্যদের কথা ভাবেনি। কিন্তু, জেদি জঙ্গিরা যে ইয়েমেনকে আরব উপসাগরের পবিত্র ভূমি মনে করে, এটা তারা বুঝতে পারেনি। জেহাদিদের কাছে আরব উপসাগরের এক ইঞ্চি জমিও পবিত্র।

ইয়েমেন তার পাহাড়ি এলাকার জন্য জঙ্গিদের প্রশিক্ষণের সুরক্ষিত স্থান বলেই এখানে এই কারবার চলবে, যদি ইয়েমেনি সরকার শক্ত না হয়। মনে হয় সরকারের নড়বড়ে অবস্থা সন্ত্রাসীদের ঠেকাতে পারবে না। আমি কিছু ধর্মীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি, যাকে ইউএস কর্মকর্তারা ট্রেনিং সেন্টার মনে করেন। বিদ্যালয়টি দাম্মাজ গ্রামে সাহাদা শহর থেকে কয়েক মাইল উত্তরে। রমজান মাসের সকাল বেলা; সেখানে সব ছাত্র ও স্টাফ শেষ রাতের খাবার খাওয়ার পর তখনও ঘুমিয়ে। এই অবসরে আমি ত্বরিত পদচারণা করে চারদিক ঘুরে দেখলাম, কোন বাধা পেলাম না। আমার ইয়েমেনি দোভাষী ও ড্রাইভার ভয় পেয়ে আমার সাথে এলো না, তারা গাড়িতেই বসে রইলো।

দাম্মাজ তার নিজস্ব ভুবনে ছোট্ট একটি গ্রাম। এই ভুবনটির চারদিক ঘিরে একটা অডিটোরিয়াম, নামাজ ও লেকচার হল। সেখান থেকে একতলা ভবন দেয়ালের মত ঘুরে গেছে, যেখানে তালিব-এ ইলম (ছাত্র)রা বাস করে। ছাত্রাবাস, এখানে সারা দুনিয়া থেকে ছাত্র আসে লেখাপড়া শিখতে। ব্রিটেনের (বার্মিংহাম) প্রায় তিরিশ জন ছাত্র আছে, কিছু আছে যুক্তরাষ্ট্র, আর আছে জার্মানি, ফ্রান্স, আলজিরিয়া, লিবিয়া টার্কি, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া ও ইন্ডিয়া থেকে আসা। এছাড়া হাজার হাজার ইয়েমেনি আছে। এখানকার শিক্ষা কোর্স ছয় মাস থেকে সাত বছর পর্যন্ত বর্ধিত। ছাত্র সংখ্যা ওঠানামা করে সাতশো থেকে আট হাজার পর্যন্ত।

শেখ মকবুল আল-ওয়াদাই, সত্তর বছরের মাওলানা, দাম্মাজের সর্বেসর্বা, কট্টর মৌলবাদী আফগানিস্তানের তালিবানদের মত। এরা টেলিভিশন, রেডিও, মেয়েদের কাজ করা এবং গণতন্ত্র বিরুদ্ধ। তিনি প্রচার বিমুখ। কেবলমাত্র একবার ২০০০ সালে তিনি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা 'ইয়েমেন টাইমস্'-এ ইন্টারভিউ দেন এবং বলেন আমরা অন্য কোন ধর্মের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নই। শেখ সাহেব অস্বীকার করেন যে, এখান থেকে কোন গ্রাজুয়েট আফগান জেহাদে যোগ দিয়েছে। কাশ্মিরে ও চেচনিয়াতেও যায়নি, আর এখানে কোন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেয়া হয় না।

মকবুল ইয়েমেনের টাইমস্-এ ইন্টারভিউ দেয়ার কিছু আগেই এক ষোল বছরের ব্রিটিশ ছাত্র হোশিয়া ওয়াকার দাম্মাজে গুলিতে প্রাণ হারায় এবং একে

দুর্ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৯৮ সালে, শেখ সাহেব যখন সানার মসজিদে খোতবা দিতেছিলেন এক বোমাতে দুইজন লোক মারা যায় এবং শেখ সাহেবের কয়েকজন অনুসারী আহত হয়, তার মধ্যে দু'জন আমেরিকান ও একজন কানাডিয়ান ছিল। ঐ সময়ের মধ্যেই শেখের একজন দেহরক্ষীকে খুন করা হয়। তবুও তিনি শান্তির বাণী প্রচার করেন। কিন্তু ২০০০ সালে মার্চ মাসে ইন্দোনেশিয়ায় কট্টর জেহাদি গ্রুপের লস্কর জেহাদ-এর কাছে দেয় শান্তি রক্ষার ফতোয়ার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে খ্রিস্টানরা বিরোধে আগুনে বাতাস দিয়েছিল ৫ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে, তাই তিনি ইন্দোনেশিয়ার লস্কর জেহাদকে ফতোয়া দেন এই মুসলিম হত্যাযজ্ঞের কারণে, হে বিশ্বাসী বন্ধুগণ, তোমরা সর্বাত্মক জেহাদের ডাক দাও এবং আল্লাহর শত্রুদের দেশ থেকে উৎখাত কর। তাছাড়া ইয়েমেনি সূত্র থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যায় যে দাম্মাজে সকলের কাছেই বন্দুক বা রাইফেল আছে। ইয়েমেন টাইমস্-এর কাছে সাক্ষাৎকারে, শেখ সাহেব স্বীকার করেছিলেন যে—'ছাত্রদের কাছে তাদের নিজস্ব বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যক্তিগণভাবে থাকতে পারে এতে ধর্মীয় বিদ্যালয় প্রশাসনের বলার কিছুই নেই।'

ইউএসএস 'কোলে' আক্রমণের তদন্ত ২০০১ সালে গ্রীষ্মের সময় বন্ধ হয়ে গেল। ইয়েমেন সরকার তার দায়িত্বে অর্ধ-ডজনের মত লোক গ্রেপ্তার করে যারা এতে সরাসরি যুক্ত ছিল। এফবিআই, অন্যদিকে, তদন্তকাজ ইয়েমেনি সরকারের সদস্যসহ চালিয়ে যেতে চেয়েছিল—ইসলাহ পার্টির একজন নেতা ও প্রেসিডেন্ট সালিহ-র আর্মির এক জেনারেলকে নিয়ে। বিস্ময়ের কিছু নয়। এ লম্বা তদন্তে ইয়েমেনি সরকারের কোন আগ্রহ ছিল না। একটি ইয়েমেনি সংবাদপত্রের সম্পাদক মন্তব্য করেন শুরু থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল যে, সংশ্লিষ্ট সকলের এই আক্রমণে জড়িত থাকার জন্য বিচার হবে এবং বিচার মত শাস্তিও হবে; কিন্তু ইয়েমেনের লোকজন যারা এ ব্যাপারে অর্থ যোগান দিয়েছিল এবং একে সফল করার জন্য ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল, তাদের কখনও ধরা সম্ভব নয় শাস্তি দেয়া তো দূরের কথা।

এটা এখনও পরিষ্কার নয়, এই আক্রমণে বিল লাদেনের কি ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই সফল আক্রমণের পর বিন লাদেনের যে সন্তুষ্টি ও উল্লাস প্রকাশ পায়, তাকে অস্বীকার করা যায় না। ২০০১ সালে জানুয়ারি মাসে আফগানিস্তানে, বিন লাদেনের পুত্রের বিবাহকালে, সে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সম্মুখে 'কোলে' সম্বন্ধে এক শাবাশী কবিতা পাঠ করে অতিথিদের উল্লসিত করেছিল। কবিতাটি এইরূপ

"একটি ডেস্ট্রয়ারকে, অতি সাহসীরাও ভয় করে।
ইহা বন্দরে ও সাগরের বুকে ত্রাসের সঞ্চার করে।
উন্মত্তবাচি মালার বুকে নাবিক-যোদ্ধা পরিবেষ্টিত হয়ে
সে ভীম দর্শনে এগিয়ে যায়।
কিন্তু ধীরে, অতি ধীরে, মায়া ও ভ্রান্তি জালে
জড়িয়ে যাবে;

এবং অপেক্ষা করবে একটু সামান্য ডিঙির
তরঙ্গের তলে তলিয়ে যাবার জন্য।”

আমি আমার হায়দ্রামাত ভ্রমণের কাহিনী কিছু বিস্তারিতভাবে বলেছিলাম। সে অঞ্চল দেখলে বোঝা যায় সেখানকার অতি রক্ষণশীল সংস্কৃতি, যা ওমর পিতা তার কনিষ্ঠ পুত্রকে দান করে গেছেন। বিন লাদেনের পূর্বপুরুষের গ্রামে পৌঁছানোর জন্য, আমি ওয়াদি দোয়ানের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছিলাম। ওয়াদি দোয়ান প্রায় একশো মাইল জুড়ে লম্বা পাথর বিছানো বন্ধুর পথ। এমন কি সত্তর বছর পর মোহাম্মদ বিন লাদেন (বিন লাদেনের পিতা) এই উপত্যকা ছেড়ে সৌদ আরবে ভাগ্যের সন্ধানে গেলেও, সেখানকার মেয়েরা কালো বোরখার মধ্যে নিজেদের মুখ ঢেকে চলাফেরা করে বিদেশীদের দৃষ্টি এড়িয়ে। গ্রামের বাইরে জমিতে কাজ করার সময়ও ফসল তোলে বোরখা পরে ও মাথায় খড়ের তৈরি টুপি পরে। আমি ঐ নারীদের ফটো তুলতে গেল আমার গাড়ির ড্রাইভার (স্থানীয় লোক) আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠলো যে, আমি ক্যামেরা বন্ধ করতে পথ পেলাম না।

বিন লাদেনদের গ্রামটি মধু রং-এর উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় ছায়াতে ঘেরা-এর উপত্যকা ভূমি থেকে প্রায় কয়েক হাজার ফুট উঁচু। গ্রামটি মানুষে ও শিশুদের কলকাকলিতে পরিপূর্ণ। শিশুরা কাদা ইটের তৈরি বাড়ির দেয়াল ঘেরা রাস্তায় খেলাধুলা করে। এই গ্রামের নাম আল-রুবাত বা'শেন, এক সুফি সাধুর নামের অনুকরণে—যার নাম ছিল সাঈদ মোহাম্মদ বা'শেন। তার সমাধিও শহরের উপরে পাহাড়ের গায়ে। মজার ব্যাপার হল এই গ্রামটি সুফিবাদে প্রভাবিত এবং এই মতবাদে দীক্ষিত, তাই সুফি সাধুদের মাজারের এখানে পুজা হয়। যা বিন লাদেন নিজেই ঘৃণা করে এবং মাজার পূজার ঘোর বিরোধী। কিন্তু আল-রুবাতের বাসিন্দারা, চরম দরিদ্র ও রক্ষণশীল জীবনধারার মাঝে বিল লাদেনের কট্টর মৌলবাদিত্ব স্বীকার করে না।

বিন লাদেন যখন 'কোলে' বিস্ফোরণের ওপর খুশি হয়ে কবিতা লিখে পাঠ করে, আল-রুবাতের মোল্লা, যে প্রাচীন বিন লাদেন পরিবারের কম্পাউন্ডের মধ্যে স্কুল পরিচালনা করে—আমাকে বলেছিল—আমরা কিন্তু ধর্মযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করি। 'কোলে' আক্রমণ করে ইয়েমেনের সম্মান ও সুনাম আমেরিকার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। আমরা আমেরিকান বালক-বালিকাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করি। তারা আমাদের অতিথি। সে তার বক্তব্য শেষ করে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আর তা হল 'শান্তির পথে এসো'—'Come to Islam'।

মোল্লার শেষ বাক্যটি বিন লাদেনের পরিবারের কোন সদস্যের গ্রহণ করা উচিত যারা এখনো এই গ্রামে বাস করছে। খালেদ আল-ওমেরি বিন লাদেনের কাজিন। বয়স তিরিশ বছর। বিন লাদেন রাস্তার ওপর তার একটি খাবার দোকান আছে। আল-ওমেরি তার বিখ্যাত আত্মীয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো, কিন্তু যখন তাকে প্রশ্ন করা হল জেহাদ সম্বন্ধে যার অর্থ শুধু যুদ্ধ নয়, যে কোন ধর্মীয় সংগ্রাম, যেমন শুভপ্রচেষ্টা—সে গর্বভরে তার তিন বছরের পুত্র সন্তানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে করে জবাব দিল—'এই আমার জেহাদ'।

অধ্যায়—দশ

বিশ্ব নেটওয়ার্ক : বিশ্বব্যাপী আশিটি জেহাদ

(The Global Network : Around the World in Eighty Jihads)

We talk about the bin Laden organization, but it is really a bin Laden alliance. It is unusual to find Palestinians and Yemenis, Sudanese and East Asians in the same allince. He is the glue between groups that have little in common with each other, for instance the Kashmiris and Egypt's Islamic Jihad.

Us official, Washington, 1998

লস এঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমা নিক্ষেপকারী, আহমদ রেশাম যখন কানাডার ফেরি পার হয়ে ওয়াশিংটনের পোর্ট এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে অবতরণ করলো তখন ১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে এক ঝোড়ো হাওয়ার দিন। তাকে ধরলো কাস্টমস্-এর সদা-সতর্ক এজেন্টরা। ইউএস তদন্তকারীরা তখন চিন্তাই করতে পারেনি যে এই গ্রেপ্তারি লোকটির কাছ থেকে আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া যাবে যা তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আল-কায়েদার নেটওয়ার্ক তিনটি মহাদেশে ডজনের চেয়ে বেশি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তারা জানতে পারলো যে আল-কায়েদা ২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্ল্যান গ্রহণ করেছে। শুধু LAX-এর ওপর আক্রমণ নয়। জর্ডনে টুরিস্ট অঞ্চলে ও ইয়েমেনে ইউএস যুদ্ধজাহাজেও হতে পারে। ভালো পুলিশি তৎপরতার জন্য এবং পরিকল্পনাকারীদের অযোগ্যতার কারণে তখন প্লটগুলো সফলকাম হয়নি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা আল-কায়েদার কর্মকর্তাদের ধরে ফেললো ইংল্যান্ডে, স্পেনে, জার্মানিতে, ইতালিতে ও সিরিয়াতে। কিন্তু, এই সব সফলতার মাঝেও নতুন মিলেনিয়ামের সন্ধিক্ষণে আল-কায়েদার বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে একেবার স্তব্ধ করতে পারেনি।

অধুনা বিশ্বায়ন সম্পর্কে একটি পুস্তকে বিশ্বনাগরিক সচেতনা জাগিয়ে তুললো—তারা হল 'কসমোক্র্যাট'-তারা নিজের দেশ আয়ার ও নাইজিরিয়ায়

যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তেমনি লন্ডন ও হংকং-এ করতে পারে। আপনি ভ্রমণকালে হয় এই জাতীয় 'কসমোক্র্যাট' নাগরিকের সন্ধান পেয়ে থাকবেন। একজন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা যিনি বাকুতে মিটিং করতে যাওয়ার কথা চিন্তা করছেন এবং পরের দিন হয়তো অক্সফোর্ডে কোন বিয়ের দাওয়াতে যেতে পারেন, কিংবা এক ইংলিশ বিশ্বব্যাংক নির্বাহী কর্মকর্তা, তার রাশিয়ান স্ত্রী নিয়ে, বছরে ছমাস পোল্যান্ড ও কলম্বিয়ার মধ্যে যাতায়াত করে পার করে দিলেন। এই কসমোক্র্যাটরা একাডেমিক বিদ্যায় পারদর্শী এবং প্রায়ই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন। এতে পারিবারিক মর্যাদা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। দেখা হয় কার ট্যালেন্ট ও ড্রাইভ বেশি আকর্ষণীয়।

এখানে বিন লাদেনের সংস্থার সাথে বিশ্বায়নের একটা ইন্টারেটিং সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে যখন আন্তর্জাতিকভাবে দুই দেশ-সোভিয়েত ও আফগানিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে পরেক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে পাকিস্তান, আমেরিকান ও সৌদিরা; এর সাথে সারা বিশ্বের মুসলিমরাও জড়িয়ে যায় ধর্মযুদ্ধ ভেবে। ইসলামী নেতারা সর্বদাই উম্মার ধারণায় সচেতন, যাকে বলা হয় বিশ্ব মুসলিম কমিউনিটি। এই বিশ্বজনীন ধারণাটা এর কাউন্টারপার্ট 'খ্রিস্টানডম' থেকে বেশি জোরদার, কেননা 'খ্রিস্টানডম'-এর চেতনা অষ্টম হেনরির দ্বিতীয় বিয়ের জন্য দুর্বল হয়ে গেছে।

বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক, প্রযুক্তির দিক থেকে এবং বিশেষ স্থান অধিকার করেছে বলেই এখানে 'কসমোক্র্যাট'দের সমাবেশ হয়েছে। একটু দৃষ্টি দিলেই 'কসমোক্র্যাট' প্রকৃতিটা চোখে পড়বে, কারণ এই সংস্থার মূল ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং গড়ে উঠেছে অপারেশনের ক্ষেত্র যেমন—এর সাথে জড়িয়ে গেছে সুদান, মিশর, সৌদি আরব, ইয়েমেন, সোমালিয়া, লেবানন, ফিলিপিন্স, তাজিকিস্তান, আজারবাইজান, আলজিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, আলবেনিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, কাশ্মির (ভারত), চেচনিয়া (রাশিয়া), তিউনিশিয়া ইত্যাদি। আল-কায়েদা যুক্তরাষ্ট্র থেকেও তার অনুসারী টেনে আনছে, যেমন—নিউইয়র্ক, বোস্টন, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, ভার্জিনিয়া এবং ক্যালিফোরনিয়া। যুক্তরাজ্য থেকেও জেহাদিরা এসেছে, যেমন—লন্ডন ও মাঞ্চেস্টার। বিন লাদেনের অনুসারীরা গ্রেপ্তার হয়েছে বিভিন্ন স্থানে যেমন—জর্ডান, সিয়েটেল, ফ্রান্স, উরুগুয়ে এবং অস্ট্রেলিয়াতে।

আফ্রিকান ইউএস এম্বেসি আক্রমণের পরের মাসে, ইউএস ইন্টেলিজেন্স বিন লাদেনের অনুগামীদের শনাক্ত করেছে যারা আলবেনিয়া, তাজিকিস্তান, আজারবাইজান, উগান্ডা, আইভরি কোস্ট, সেনেগাল, মোজাম্বিক, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, টোগো এবং ঘানাতে ইউএস এম্বেসিগুলোতে টারগেট করেছিল। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিপ্লোমেটিক নিরাপত্তা অফিসের প্রধান ডিভিড কার্পেন্টার কংগ্রেসের সম্মুখে সত্যায়িত করেছিলেন যে এম্বেসি বোম্বিং-এর ছ'মাসের মধ্যে

পৃথিবীর অন্যান্য আমেরিকান ডিপ্লোমেটিক ফেসিলিটির ওপর সম্ভাব্য হামলার হুমকি বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক থেকে ৬৫০টি বার্তা পেয়েছিল। ইউএস কাউন্টার টেরোরিজম কর্মকর্তার মতে 'আসন্ন হুমকি' পাওয়া গিয়েছিল এম্বেসির ভিডিও টেপের মাধ্যমে, টেলিফোনের মাধ্যমে, কোন একটি নির্দিষ্ট শহরে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি অথবা কেউ অফিসে কোন চিঠিপত্রের মাধ্যমে হুমকি দিয়ে গেছে।

২০০১ সালে আল-কায়েদা ইয়েমেন ও ইন্ডিয়াতে আমেরিকান এম্বেসি আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল। ইন্ডিয়াতে আক্রমণের মূল হোতা ছিল মোহাম্মদ ওমর আল-হাজারী, যে ইউএসএস কোলে আক্রমণের নেতা ছিল। ২০০১-এ জুলাই মাসে, ইন্ডিয়ান পুলিশ দু'জন লোককে গ্রেপ্তার করে নিউ দিল্লিতে—যাদের কাছে উচ্চমাত্রার বিস্ফোরক RDX পাওয়া গিয়েছিল ছয় কিলো। তারা স্বীকার করেছিল যে, কয়েক মাস ধরে তারা প্ল্যান করেছিল আমেরিকান এম্বেসির ভিসা অফিসটি উড়িয়ে দেবে এবং তারা বিন লাদেনের সহকারী আবদুল রহমান আল-সাফানীর সরাসরি নির্দেশে। এই আল-সাফানীই হল আল-হাজারী। আগস্ট মাসের শেষের দিকে ইন্ডিয়ান পুলিশ বিন লাদেন ও অন্য পাঁচজনকে (আল সাফানীসহ) চার্জ করে আমেরিকান এম্বেসি উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করার জন্য। এই ষড়যন্ত্র চলছিল দু'বছর ধরে।

আল-কায়েদা সদস্যরা বৈধভাবে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। ১৯৯০ দশকে এদের মধ্য সবচেয়ে বেশি বিশ্ব-ভ্রমণ করেছে মামদুহ মাহমুদ সলিম। সে তার্কি, দুবাই, আজারাইজান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সুদান, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স এবং চীন এইসব দেশ সার্ভে করেছে। ১৯৯৮-এ যখন তাকে ব্রুনেক শহরে (বেভেরিয়া) গ্রেপ্তার করা হয়, সে বলেছিল সে জার্মানি গিয়েছিল গাড়ি খরিদ করতে। লেবানিজ-আমেরিকান ওয়াদি এল-হাজে বুসিয়ানা, নিউইয়র্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৮০-র দশকে সাট্‌লের মতো যাওয়া-আসা করেছে। ১৯৯০-র দশকে, সে বাস করেছে আরিজোনাতে, সুদানে, কেনিয়াতে এবং টেক্সাসে, তারপর সাইড ট্রিপ মেরেছে আফগানিস্তান, জার্মানি ও স্লোভাকিয়ায়। আল-কায়েদার বিশ্ব-জোড়া নেটওয়ার্ক-এর ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয় বিন লাদেনের সেটেলাইট ফোন দিয়ে। দু'বছরের মধ্যে, এই ফোনের মাধ্যমে শত শত 'কল' করা হয়েছে লন্ডনে, সুদানে, ইরানে ও ইয়েমেনে, আর ডজন ডজন 'কল' করা হয়েছে আজারবাইজান, পাকিস্তান, সৌদি আরাবিয়া ও কেনিয়াতে।

আল-কায়েদা দুনিয়ার সব দেশে, সব স্থানে তাদের অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে—সে সব দেশের নাম ও স্থানে পূর্ণভাবে একটি পুস্তকে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি কয়েকটি বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরীক্ষা করতে চাই। এই দেশগুলোর মধ্যে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান করে নিয়েছে মিশর। এই মিশর বিন লাদেনের সংস্থার কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে। এ দেশটি এতো বেশি সজাগ ও প্রভাবশালী যে আমার অধুনা এ সংস্থা সম্বন্ধে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা ও যাত্রা বাইরে বিমানবন্দরে এসে থেমে গেল।

কায়রো বিমানবন্দরে আমার ব্যাগ থেকে এক টুকরো আরবি লেখা কাগজ টেনে বের করে কাস্টম ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করল 'এটা কি ?'

আমি সত্যি কথাই বললাম, কারণ একজন মিশরীয় আরবি ভাষা বলতে ও পড়তে পারে। অতি স্বাভাবিক স্বরে বললাম ওটা ওসামা বিন লাদেনের আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রচারপত্র। আমি আরও বলতে গেলাম যে আমি এ বিষয় একটা গবেষণাধর্মী গ্রন্থ লিখছি এটা তাই আমার সংগ্রহে রাখা দরকার এছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই; কপি করে আমি অন্য কাউকে বিতরণও করবো না যারা বিন লাদেনের অনুচর। ইন্সপেক্টর বেশ রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করলো এটা পেলে কোথায় ? এটা কি ইয়াসির আল-সিরি থেকে পেয়েছ ?

আমি অথৈ পানিতে পড়লাম। ইয়াসির আল-সিরি হল লন্ডনে অবস্থিত মিশরীয় সন্ত্রাসী দল, ১৯৯৩ সালে মিশরের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মারা যায় এক যুবতী মেয়ে। এই দলের কেউ ধরা পড়লে নিজের পক্ষে তার পাঁচশ বছর জেল, এমন কি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। বললাম না, এটা ইয়াসির আল-সিরি থেকে নয়।

এরপর ইন্সপেক্টর আমাকে তার অফিসে নিয়ে এলো। সেখানে, একজন সাদা-পোশাক পুলিশ—নিরাপত্তা পুলিশ হবে, আমাকে বেশ কড়াভাবে প্রশ্ন করলো তুমি কি কখনো ইয়াসির আল-সিরি গেছ ? তার সাথে কথা বলেছ ? এটা আমার জন্য বেশ ভালো প্রশ্ন, কারণ এর ওপরে আমি কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি ওদিকে না গিয়ে অন্য লাইন ধরলাম। বললাম আমি তার সাথে ফোনে কথা বলেছি।

নিরাপত্তা অফিসার কিছুক্ষণ আপনমনে বিড়বিড় করলো, তারপর আমার কথায় তার বিশ্বাস হল। তারপর সে বললো এখন তুমি যেতে পারো। বলে আমার সাথে করমর্দনও করলো।

আমার অবাক লাগছে এরা আল-সিরি নিয়ে পড়লো কেন ? সে দো-হারা কাঠামোর মানুষ, মাথার সামনের দিকে চুল নেই—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। ইসলামিক অবজারভেশন সেন্টার নামে একটা অফিস চালায়, যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রেস নোট মিশর সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে যা বেশিরভাগ চলে যায় ইসলামিস্ট জঙ্গিদের কাছে। এটা একটা ছোটখাটো অফিস, আল-সিরির কোন অনুসারী মিশরের বাইরে বা ভেতরে নেই। এখন আমার মনে পড়ল, মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক কোন সমালোচনা সইতে পারেন না, তাই আল-সিরি তার কাছে মস্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।

মিশর সরকার ইসলামী জঙ্গিদের ব্যাপারে ভীষণ সচেতন, সদা-সতর্ক। গত ২৫ বছর ধরে মিশরের জেহাদি গ্রুপ দেশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯০-র দশকের শুরু থেকে এই দল বিন লাদেনের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং

একযোগে কাজও করছে। ইউএস সরকারের অভিযোগ হল যে বিন লাদেনের আল-কায়েদা ১৯৯৮ সাল থেকে এই জেহাদি গ্রুপের সাথে একীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু এ ধারণ একটু ভ্রান্তিমূলক, কেননা মিশরীয় দল আল-কায়েদা থেকে সংগঠনের ও 'টেকনিক্যাল নো-হাও'-এর দিক থেকে অনেক উন্নত। বিন-লাদেন নামটাই শুধু প্রচার বেশি হয়েছে জনসাধারণের কাছে, কারণ সে সব অর্থ যোগান দিচ্ছে, কি ব্রেন, প্ল্যান ও আদর্শগত কৌশল সব জোগাচ্ছে মিশরীয়রা এবং গোটা আল-কায়েদা কর্মধারা পরিচালিত হচ্ছে মিশরীয় মডেলে। আল-কায়েদার প্রভাবশালী নেতা ও সদস্য প্রায় সকলেই মিশরের। বলতে গেলে, ইজিপ্টসিয়ান জেহাদিস্টরাই আল-কায়েদা দখল করে নিয়েছে অর্থাৎ আল-কায়েদা মিশরের জেহাদি দলের সাথে মিশেছে, জেহাদি দল নয়। বিন লাদেন শুধু অর্থ জোগানদার।

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নয়। আদর্শ ও কৌশল আল-কায়েদার আছে, তা সবই মিশর থেকেই আসছে। কারণ আরব বিশ্বে সংস্কৃতির দিক দিয়ে মিশরের ঐতিহ্য আছে। কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় শতাব্দি ধরে ইসলামী চিন্তাধারায় নেতৃত্ব দিচ্ছে—কেন্দ্রভূমি। ১৯৫০ ও ১৯৬০ দশকে প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের বর্তমান প্যান-আরবিজম-এর নেতৃত্ব দেন। মিশরীয় জেহাদি দলের যে মূল হোতা সাইদ কুতুব কাইরোর টিচার ট্রেনিং কলেজের গ্রাজুয়েট।

জেহাদি গ্রুপ ও বিন লাদেনের ওপর সাইদ কুতুবের কি পাহাড় প্রমাণ প্রভাব তার সীমা পরিসীমা নেই। কুতুব একজন সাংবাদিক এবং সমালোচক, ১৯৪৮ ও ১৯৫১ সালের মধ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন এবং বর্ণ বৈষম্য ও অবাধ যৌনাচার দেখে মর্মাহত হন। তিনি মিশরে ফিরে এসে পশ্চিমাদের সব কর্মকাণ্ডের প্রতি আপোসহীণ ঘৃণায় দ্রুত যোগদান করেন ইসলামী মুসলিম ব্রাদারহুড-এ। ১৯৪০ দশকে এর পাঁচ লক্ষ সদস্য গণআন্দোলন শুরু করে এবং ১৯৫২ সালে ক্যু-এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের দক্ষতা দখল করলে ব্রাদারহুড দল এই সরকারের বিরোধিতা করে। ব্রাদারহুডের স্লোগান দ্ব্যর্থহীন—'কোরানই সংবিধান এবং প্রফেট আমাদের গাইড। আল্লাহর জন্য প্রাণ দান আমাদের মহান উচ্চাশা।'

১৯৫৪ এবং ১৯৬৬ সালের সাইদ কুতুবের মৃত্যুদণ্ড সময়কালের মধ্যে তিনি নাসের সরকারের নরকসম জেলখানায় আবদ্ধ ছিলেন। জেলে থাকার সময় তিনি 'সাইন পোস্টস্' পুস্তিকা রচনা করেন যা নাসের সরকার উৎখাতের নীলনক্সা, কেননা এই সরকারকে তিনি অনৈসলামিক মনে করতেন। নাসেরের সরকার কুতুবের কাছে জাহিলিয়ান যুগ ছিল। কেন ? কারণ নাসের এমন সমাজ তৈরি করেন যেখানে ইসলাম ছিল না। ছিল কুফরী। কুতুব জেহাদকে বিবেকের বিরুদ্ধে বা আত্মরক্ষার্থে সংগ্রামের চেয়ে, আল্লাহর রাজ্য ও শাসনকে প্রতিষ্ঠা করে মানুষের শাসনকে উৎখাত করতে চান। কিন্তু 'আল্লাহর শাসন ও রাজ্য' কারা পরিচালনা করবে তার ব্যাখ্যা দেন নি। কুতুবের মৃত্যুদণ্ড তাকে শহীদের মর্যাদা এনে দেয়; তার লিখিত বক্তব্যগুলো ইসলামী জঙ্গিরা হজম করে এখন মানুষের রাজ্যকে খতম

করে আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। সৌদি বিদ্রোহী সাদ আল-ফাগিহ কুতুবের লেখাগুলোকে 'অতি প্রয়োজনী' বলে মনে করেন জঙ্গি ইসলামিস্ট আন্দোলনের জন্য।

কুতুবের লেখার বক্তব্যের মূল কথা খুবই স্পষ্ট। মিশরের কর্মকর্তারা বিধর্মী-ইনফাইডেল। তাদের তাড়াবার একমাত্র পন্থা কাজ, কথা নয়। ঠিক এই লজিক-ই হল বিন লাদেনের; কাজ দিয়ে সৌদি রাজ্যকে উৎখাত কর। (এই ধরনের লজিক অনুসরণ করার আগে কিছু ইসলামী মূল কেতাব পড়া প্রয়োজন। প্রফেট মোহাম্মদ নিজেই বলেছেন—'একজন মুসলিম ভাইকে অপমান করা পাপ, তাকে খুন করা অবিশ্বাসীদের কর্ম।)

মিশরীয় জঙ্গি দলের ইতিহাস যা কুতুকের নীলনক্সায় বাস্তবায়িত হয়েছে জেহাদিদের জন্য তা বেশ দুর্বোধ্য, জটিল ও সমস্যা জড়িত। এতে হত্যা হয়, 'আল্লাহর রাজ্য' প্রতিষ্ঠা হয় না। কারণ, এ দলের মধ্যে ক্ষমতা ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব বাধে, এক কট্টর দল থেকে আর কট্টরতম দলে নেতাদের দলবদল হয়। আমি এর কিছুটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করবো। ১৯৭০-র দশকে এবং ১৯৮০-র দশকে, আল-গাসামা ইসলামিয়া অন্য একটি ইসলামী দল, মিশরের সমাজে দুর্নীতিবাজ লোকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং ভিডিও স্টোর জ্বালিয়ে দেয়, খ্রিস্টান কপটদের সোনার গয়নার দোকান-জুয়েলারি শপ লুটপাট করে এবং পর্যটকদের খুন করে তাদের টাকাকড়ি মূল্যবান দ্রব্য হাতিয়ে নেয়।

১৯৭৩ সালে আইমান আল-জাওহারি তখন মেডিক্যাল ছাত্র। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ও সামরিক অফিসার নিয়ে আর একটি ইসলামী দল গঠন করেন। এটাই হল জেহাদি দল। এই জেহাদি দল মিশর সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টায় সরকারি ভবন ও কর্মকর্তাদের আক্রমণ করা শুরু করে। ইসলামী গ্রুপ কিছুটা লোক দেখিয়ে কাজ করত যেমন মসজিদ থেকে চাঁদা তোলা এবং গরিবদের দান করা, কিন্তু জেহাদি গ্রুপের কাজ ছিল গোপনে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

১৯৮১ সালের গোড়ার দিকে ইসলামী দল ও জেহাদি দল যৌথভাবে জোট বেঁধে সাফল্যজনকভাবে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে। এই জঙ্গিরা আগেই সাদাতকে বিধর্মী বলে আখ্যা দেয়, কিন্তু যখন সাদাত ইসরাইলি সরকারের সাথে চুক্তি করে প্রধানমন্ত্রী মেনেচেম বেনিন-এর সাথে ১৯৭৯-এ হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সম্মুখে করমর্দন করেন, তখনই তিনি তার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করলেন। এই ঐতিহাসিক যুগকে সারা পৃথিবীব্যাপী নন্দিত করলেও, মিশরীয় জঙ্গিদের কাছে নিন্দিত হন এবং শেখ ওমর আবদেল রহমান, যিনি জেহাদি ও ইসলামী গ্রুপের আধ্যাত্মিক নেতা বলে পরিচিত ছিলেন—সাদাতের হত্যা পরিকল্পনায় তার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। ১৯৮১ সালে ৬ অক্টোবর এক ২৪ বছরের আর্মি লেফটেনেন্ট খালিদ ইসলাম বৌলি এক মিলিটারি প্যারেড পরিদর্শনকালে সাদাতের বুকে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। ইসলাম

বৌলি তারপর গর্ব করে বলে—'আমি মিশরের ফেরাউনকে বধ করেছি এবং আমার মৃত্যুভয় নেই।'

প্রেসিডেন্ট সাদাতের হত্যার পর শ'খানেক জঙ্গির বিচার হয়েছে এই প্লটের জন্য এবং সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কর্মকণ্ডের জন্য। শেখ রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু পরে মুক্ত করে দেয় যখন দেখা গেল জিজ্ঞাসাবাদকালে তার ওপর ভীষণ নির্যাতন করা হয়েছে। আল-জাওহারিকে তিন বছরের জেল দেয়া হয়। জেহাদিদের বিরুদ্ধে তদন্তে দেখা গেল যে সরকারের অচলাবস্থা সৃষ্টি করার জন্য এই জেহাদিরা যথেষ্ট শিক্ষা ও ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে উঠেছে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সম্বন্ধে ঠিক আল-কায়েদার অপারশনের মত।

জেল থেকে বের হয়েই আল-জাওহারি পুরোদমে তার জেহাদি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮০-র মাঝামাঝি আল-জাওহারি সাথে অনেক মিশরীয় জঙ্গি নিয়ে পাকিস্তানে চলে আসেন আফগান মুজাহিদিনদের সাহায্য করার জন্য। এই জেহাদের কারণে সোভিয়েত বাহিনীর প্রত্যাহার পর্যন্ত মিশরে জঙ্গিদের উৎপাত অল্পই ছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর দিকে এই জেহাদি জঙ্গিরা দেশে (মিশরে) ফিরে আসায় তৎপরতা শুরু করে।

আশ্চর্য লাগে আল-জাওহারি কিভাবে ১৯৯০-র দশকে দু'বার যুক্তরাষ্ট্রে গমন করে জেহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে আনেন। তার সফর সঙ্গী ছিল আলী মোহাম্মদ সাবেক ইউএস আর্মি সার্জেন্ট। আলী মোহাম্মদ ছিল আল-কায়েদার সামরিক উপদেষ্টা।

এই জেহাদি দল ১৯৯৩-এ মিশরের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীকে এবং ১৯৯৫ সালে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতে সফলতা লাভ করতে পারেনি। এরা সফল হয় ট্রাক-বোমা প্লটিং-এ যাতে ১৯৯৫ সালে ইসলামাবাদে মিশরীয় দূতাবাস ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯৯০ দশকের শুরুতে, মিশরীয় জঙ্গিরা কিছু পুলিশ অফিসার, কপ্‌ট ও পর্যটক খুন করে যার মোটামুটি সংখ্যা ১২০০ জন। এই সন্ত্রাসবাদ তুঙ্গে ওঠে ১৯৯৭-এ যখন লাক্সরে বিখ্যাত ফ্যারোনিক মনুমেন্ট চত্বরে ৫৮ জন পর্যটক ও চারজন মিশরীয়কে ম্যাসাকার করা হয়। এই সন্ত্রাসীরা তাদের শিকারকে কুকুরের মত তাড়া করে গুলি করে, ছুরি মারে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদ করে দেয়। তাদের এই তাণ্ডবলীলায় তারা নর্তন কুর্দন করেছে এবং এরই মাধ্যমে 'আল্লাহর রাজ্য' কায়েমের প্রচেষ্টা চলে। লক্সর ম্যাসাকারের হৃদয়হীন কর্মকাণ্ডে মিশরের জনসাধারণ জেহাদিদের ওপর থেকে তাদের সমর্থন তুলে নিয়ে কঠোর নিন্দাবাদ জানায়। এতে ইসলামী গ্রুপের নেতারা জনসমর্থন হারানোর আশঙ্কায় ১৯৯৮ সালে সরকারের সাথে সন্ধিবন্ধ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে—কিন্তু আল-জাওহারি এ ঘোষণা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এখানেই জেহাদিদের সাথে ইসলামী গ্রুপের মতদ্বৈততা দেখা যায়।

বিন লাদেনের ওপর আল–জাওহারির প্রবল প্রভাব দিন দিন প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। এতে অনেকেই মন্তব্য করে যে এই অজ্ঞাত ডাক্তার আল–কায়েদাতে বিন লাদেনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আবদুল্লাহ আজমও আল–জাওহারির একনিষ্ঠ সঙ্গী ছিল, কিন্তু তার মৃত্যুর পর বিন লাদেনকে আল–জাওহারি প্রভাব খাটিয়ে আরো বেশি উগ্রবাদী করে তুলেছেন। বিন লাদেন যে ক'বার জনসম্মুখে দেখা দিয়েছে, আল–জাওহারিকে তার পাশে বসে থাকা অবস্থায় দেখা গেছে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স বড় ফ্রেমের চশমা দিয়ে মুখ ঢাকা, একমুখ দাড়ি ও সাদা পাগড়িঅলা মানুষ। তিনি ভালো ইংরেজি বলেন এবং সব সময় বিন লাদেনের দো–ভাষীর কাজও করেন।

আল–জাওহারিকে গভীরভাবে জানার জন্য আমি একজন নামকরা মিশরীয় সমাজবিদ সাদ এডিন ইব্রাহিমের কাছে গিয়েছিলাম।

১৯৭০–র দশকে তিনি ইসলামী জঙ্গিদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে পড়াশোনা করেন। তিনি বলেন—আল–জাওহারির সাথে তার দেখা হয়, যখন আল–জাওহারি যুবক ছিলেন এবং মাত্র জেহাদি জীবন শুরু করেন। ইব্রাহিম বলেন—আল–জাওহারি অতি বুদ্ধিমান ও অতি শান্ত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, মিশরীয় কদিমী ঘরানার সাথে জড়িত। তার বাবাও নামকরা ডাক্তার ছিলেন।

এরপর আমি আল–জাওহারি সূত্র আবিষ্কারে মোন্তাসের আল–জাইয়াত–এর সাথে মিলিত হবার চেষ্টা করি। আল–জাইয়াত ইসলামিক দলের মুখপত্র ছিলেন। তিনি অসুস্থ থাকায় আমার এপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়, কিন্তু আমি তার অতিথি বা ভিজিটর রুমে বসে এক মহিলার সঙ্গ লাভের অভিজ্ঞতা লাভ করি। মহিলার শুধু আপাদ–মস্তক মোটা বোরখায় ঢাকা নয়। হাতে কালো দস্তানা—উগ্র মৌলবাদী। বিকালে কোন কাজ না থাকায়, আমি ঠিক করলাম কায়রোতে ইহুদি ও খ্রিস্টান কপ্‌টদের অবস্থা সরজমিনে দেখবো, যারা আল–জায়াতের মক্কেলদের আক্রমণের শিকার, ধর্মীয় কর্তব্য। আল–জায়াতের থেকে বের হয়ে বিল্ডিং–এর কোনটা ঘুরেই শার হা শামাইম–এর আট নুভেয়্যু সিনেগগ অবস্থিত। ভবনটি তৈরি হয় ১৯০৫ সালে, হাল আমলে সিনেগগটির সেই আদি–সৌন্দর্য নেই, কালচক্রের ঘর্ষণে ক্ষয়ে গেছে। সিনেগগটির সেই আদি সৌন্দর্য নেই। কালচক্রের ঘর্ষণে ক্ষয়ে গেছে। সিনেগগটি পুলিশ প্রহরায় রক্ষিত হলেও আবাদি নেই, এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখলাম। কায়রোতে এখন দুই থেকে তিনি শোর মত ইহুদি বাস করে। বৃদ্ধ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই রাতে কোন সাবাত হবে কিনা, জবাবে তিনি বললেন : না, কারণ কোন রাব্বি নেই সুতরাং কোন সার্ভিসও নেই। কায়রোতে কপ্‌টিক অঞ্চলে মধ্যযুগের চার্চগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে, ইহুদি সিনেগগের চেয়ে ভালো অবস্থায় টিকে রয়েছে। ভেতরে সেন্ট জর্জ–এর মূর্তির নিচে মোমবাতি জ্বলছে। পুরাতন কর্মী কিছু চার্চ পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত। মাঝে মাঝে পুরোহিত আসেন তখন সার্ভিস হয়।

আল জায়াতের কাছে আমার পরবর্তী ভিজিটে দেখলাম তিনি সর্দিতে কাতর, তবুও কথা বলতে রাজি হলেন জঙ্গি দলের ইতিহাস বয়ান করতে। আল-জায়াতের ভারি দেহ, চল্লিশের শেষের দিকে বয়স গড়িয়ে গেছে, সারা মুখে দাড়ির জঙ্গল। তার অতীত বিগত ইসলামী জঙ্গি জীবন মিশরীয় সমাজের কিছু লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, তাই তার গাড়িতে বোমা বিস্ফোরিত হলে তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। তিনি মনে করেন যে তার টেলিফোনে সব কথাবার্তা কেউ হয়তো রেকর্ড করছে।

আল জায়াত ইসলামিক গ্রুপ-এ ছিলেন। তিনি প্রথমে আমাকে ব্যাখ্যা করে বললেন যে ১৯৯৮ সালে যে 'যুদ্ধবিরতি চুক্তি' হয়, তা আসলে সন্ধি-চুক্তি ছিল না, শুধু বন্দুকযুদ্ধ অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ ছিল। ১৯৯৭-এ জুলাই মাসে, লাক্সর ম্যাসাকারের পূর্বে, ইসলামিক গ্রুপের নেতারা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনুমোদন করে, যাকে র‍্যাক্টিফাই করে ১৯৯৮ সালে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত গ্রুপের শুরা কাউন্সিল। আল-জাওহারি ও রিফিয়া আহমদ উভয়েই এতে বাধা দেন, কেননা তারা তখনো বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন দিয়ে চলছিল। এই কারণে তারা জেহাদি ও ইসলামিক গ্রুপের নেতাদের, যারা যুদ্ধবিরতি অনুমোদন করে, তাদের ইস্তফা দিতে নির্দেশ দেন।

বললাম আল-জাওহারি নিজে বললেন ইস্তফা দিতে ? আল-জায়াত মৃদু হেসে জবাব দিলেন : তিনি খুবই চতুর সার্জেন, খুব তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে কাটেন, টের পাবে না। তার সাথে দেখা করলে মনে হবে না, এই নিরীহ, ধীর স্বল্পবাক মানুষটি কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। তিনি গভীর চিন্তা করেন। তবুও এই নিরীহ ব্যক্তিটির কথার ধার খুব বেশি। আল-জায়াত আরও বললেন আফগান যুদ্ধের সময় মুজাহিদিনদের চিকিৎসা করার সময় তিনি কয়েকজন ধনী ব্যক্তিকে সামান্য অর্থদাতা থেকে ধর্মযোদ্ধায় পরিণত করেছেন। আল-জায়াত জোরের সাথে বললেন যে আল-জাওহারি লাদেনের অন্তঃকরণ, বিবেকরক্ষক-কনসেন্সকিপার।

আল-জায়াতের এই মন্তব্য বহু সূত্র থেকে সমর্থিত। সূত্র বলতে হামিদ মীর, পাকিস্তানি সাংবাদিক। হামিদ মীর উর্দু ভাষায় বিন লাদেন ও আবদেল বারি আতওয়ান, সম্পাদক, আলকুদস্ আল-আরাবি-র উভয়ের জীবনী লিখেছে। আবদেল বারি আতওয়ান বলেছিল যে বিন লাদেনকে আল-জাওহারিই সন্ত্রাসবাদকে আলিঙ্গানের দীক্ষা দিয়েছে।

২০০২ সালের গ্রীষ্মে আল-কায়েদার যে রিক্রুটমেন্ট টেপ প্রচার করা হয়, তাতে আল-জাওহারি একবার বলেছিলেন আমেরিকার অপরাধগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, সে নিজেকে গণতন্ত্র ও ধর্মের রক্ষক বলে দাবি করে। আমরা আরব বিশ্বে ইসলামের অনুসরণ করিনি। মিশরে বহু লোককে জেলে পোরা হয়েছে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে এবং মিশরের জেলখানায় বহু মানুষকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। এই সবই ঘটেছে আমেরিকার তদারকিতে।

আল-জাওহারি একমাত্র মিশরীয় ব্যক্তি নন যিনি আল-কায়েদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আরও একজন ব্যক্তি আছেন গ্রুপের সামরিক কমান্ডার, সাবেক মিশরীয় আর্মি অফিসার-আবু হাফ্‌স। আবু হাফ্‌সের একটি কন্যাকে ২০০১ সালে শুরুতে বিন লাদেন পুত্র মোহাম্মদ বিয়ে করে। ১৯৯০-এর প্রথম দিকে এবং মাঝামাঝিতে, বিন লাদেনের দক্ষিণ হস্তরূপে ছিল সাবেক মিশরীয় পুলিশ অফিসার আবু উবাইদা আল-বানশিরি। আর একজন ছিল আল-কায়েদার সামরিক উপদেষ্টা। মিশরীয় আমেরিকান সৈন্য আলী মোহাম্মদ-বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে জেলবন্দি। মোহাম্মদ শৌকি ইসলাম বৌলি, সাদাতের হত্যাকারীর ভ্রাতা, আল-কায়েদার একটি অংশ। ঠিক তেমনি বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ ছিল মিশরীয় সালেহ। সে আফ্রিকাতে আমেরিকার দুটি এম্বেসিতে আক্রমণের জন্য বোমা বানিয়েছিল এবং অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এছাড়া ছিল রিফিয়া আহমদ তাহা যে বিন লাদেনের ফতোয়ার সহ-স্বাক্ষরকারী। এই ফতোয়ায় বলা হয়েছিল আমেরিকানদের ধর আর মারো। তখন ১৯৯৮ সাল। মিশরের ইসলামিক গ্রুপের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ ওমর আবদেল রহমানের দুই পুত্র আল-কায়েদার প্রভাবশালী সদস্য। বিন লাদেন যখন সুদানে ছিল ১৯৯০ দশকের শুরুতে, তখন অন্যান্য আল-কায়েদার সদস্যরা অভিযোগ উত্থাপন করেছিল এই মর্মে যে মিশরীয়দের বেশি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়।

১৯৯৯-এর ৩ ফেব্রুয়ারি একশোর মত ইসলামিক জঙ্গি সন্ত্রাসের অভিযোগে কায়রোতে ধৃত হলে তাদের ট্রায়াল হয়। এর মধ্যে আল-জাওহারি ও ইয়াসির আল-সিরি-র বিচার হয় তাদের অবর্তমানে। আল-জাওহারির ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এবং আল-কায়েদার আলী মোহাম্মদের ভাই মোস্তফার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনয়ন করা হয়। আলী মোহাম্মদের পাঁচ বছর জেল হয়েছিল, কিন্তু জাওহারি ও তার ছোট ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে আল-সিরি ব্রিটেনে বাস করেন এবং সেখানেই আমার বিশ্ব পরিভ্রমণের পরবর্তী যাত্রা। অধুনা যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ মতে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এদের মধ্যে অনেক আরব-জঙ্গি যারা নিজের দেশে জেল কিংবা মৃত্যু শাস্তি পাওয়ার আশংকা করে, সকলেই লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে আছে আবদেল আবদেল-বারি, একজন আইনজীবী যে মিশরে জেহাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং আল-জাওহারির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল। ১৯৯১ সালে আবদেল বারি এল সাইদ নোসাইর-এর পক্ষে ওকালতি করে। নোসাইর নিউইয়র্কের সন্ত্রাসী গ্রুপের শীর্ষ নেতা ছিল ১৯৮০-র দশকে এবং ১৯৯০-র দশকের প্রথম দিকে এবং রাবিব মের কাহানেকে ম্যানহাটানে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের জড়িত ছিল। ১৯৯৯-এর জুলাই মাসে আবদেল বারিকে গ্রেপ্তার করা হয় আমেরিকানদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রে এবং বিন লাদেনের অনুচর হিসেবে। মিশরীয় ইব্রাহীম এদারুসকেও গ্রেপ্তার করা হয়। আমেরিকান প্রসিকিউটারদের মতে ইব্রাহীম ১৯৯৭ সালে আজারবাইজান থেকে লন্ডনে এসে

পৌঁছে জিহাদিদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। আবদেল বারি ও ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে চার্জ ছিল আফ্রিকাতে এম্বেসি বোম্বিং-এ ফ্যাক্স পাঠানোর দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য—যে চার্জ প্রমাণের অভাবে, ক্রিমিনাল বলে মনে হয়নি।

খালেদ আল-ফাওয়াজ, যে বিন লাদেনের সাথে আমাদের ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করেছিল, তাকেও ১৯৯৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ পুলিশ ধরে জেলে পুরে দেয়। আমি খালেদকে টেলিফোন করি যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু তার সাথে কথা হয়নি। যখন তার বাসায় গেলাম, এক ফরেনসিক টেকনিশিয়ানের সাথে দেখা হল, যাকে চিনতে পারলাম না, কেননা সে এস্ট্রেনিটের মতো রূপালি স্যুট পরে ছিল ও মাথায় হেলমেট ছিল।

খালেদের প্রতি আমার সহানুভূতি জেগে উঠলো এবং তার গ্রেপ্তারের জন্য বিচলিত হলাম, সে স্বীকার করেছিল যে বিন লাদেন তার বন্ধু ছিল এবং তারা দু'জনে মিলে Advice and Reform Committee নামে সৌদি-বিরোধী কমিটি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সে বিন লাদেনের আমেরিকানদের ওপর আক্রমণের চিন্তা পছন্দ করতো না, নিন্দাবাদ করতো। সে আরো বলেছিল যে নিরীহ সিভিলিয়ানদের আক্রমণ করে মারা অনৈসলামিক। একথা সে আমার সম্মুখে ও অন্য সাংবাদিকদের বলেছিল।

এটা সত্য যে আমেরিকানরা তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করেছিলো। ফোন রেকর্ড প্রমাণ করে যে বিন লাদেনের আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য ডাক দিত ফোন কল করে আর সেসব কল খালেদ মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করত। ১৯৯০-এর মাঝামাঝি, খালেদ কেনিয়াতে একটা গাড়ি আমদানি ব্যবসা খুলেছিল, সেখানে বসতো আবু ওবাইদুল্লাহ আল-বানশিরি, আল-কায়েদার সামরিক কমান্ডার। কেনিয়াতে খালেদকে আল-কায়েদা সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৩ সালে যখন আলী মোহাম্মদ নাইরোবিতে আমেরিকান এম্বেসি আক্রমণে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং বিভিন্ন ফটোগ্রাফ তুলে কাজে লাগাতো, খালেদ সে-সব ফটোগ্রাফ ও অন্য সব খরচাদি বহন করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে খালেদ যে তার চার্জের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে; আল-কায়েদার সাথে তার যোগাযোগ এই কারণে যে সে বিন লাদেনের মিডিয়া মুখপাত্র ছিল, তবে একজন বার্তাবাহককে অভিযুক্ত করা এবং শাস্তি দেয়া পিচ্ছিল ব্যাপার। খালেদের কেনিয়াতে কার ব্যবসা বেশিদিন টেকেনি, লোকসানের কারণে বন্ধ হয়েছিল। নাইরোবিতে আলী মোহাম্মদের খরচপাতি যোগান দেয়ার ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য নেই। যে আমেরিকান সরকারকে বলেছিল যে খালেদ আল-কায়েদার সদস্য, তা হয়তো আন্দাজের ওপরে। এম্বেসি বোম্বিং ট্রায়ালের সময় প্রধান প্রসিকিউটর, প্যাট্রিক ফিটজারেল্ড আফগানিস্তানে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প চালানোর জন্য সনাক্ত করেন, কিন্তু খালেদ আমাকে বলেছে যে সে কখনো আফগানিস্তানে যায়নি, তার ভাই গিয়েছিল।

অবশ্য, এইসব সরল বক্তব্য সত্য হলেও, আমেরিকান ষড়যন্ত্র আইন এমন বিস্তৃতভাবে বিধৃত যে সেখান থেকে বের হয়ে আসা বেশ মুস্কিল, তাই খালেদ আমেরিকান হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে দোষী প্রমাণিত হতে পারে। এই মুহূর্তে সে, ইব্রাহীম এবং আবদেল বারি ব্রিটিশ জেলে আছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে হস্তান্তর হতে পারে, নাও পারে।

তেমনি, আল-কায়েদার সদস্য আনাস আল-লিবি ব্রিটেনে আছে। এর আগে সে মাঞ্চেস্টারে ছিল, ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ পুলিশ তার বাড়ি হামলা করলে সে মাঞ্চেস্টার ছেড়ে পালায়, তবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে। আল-লিবি একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, সে অনেক আল-কায়েদা সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ১৯৯০-র দশকে আফগানিস্তানে। ১৯৯০-এর মধ্যভাগে আল-লিবি সুদানে আল-কায়েদার কম্পিউটার-প্রয়োজন সম্পন্ন করে। ১৯৯৩-এ সে এবং আলী মোহাম্মদ নাইরোবিতে এবং আল-কায়েদার এপার্টমেন্টে বসবাস করে আমেরিকান এম্বেসির সার্ভিলেন্স ছবিগুলো উন্নত করে আক্রমণের প্রাথমিক কর্ম সম্পন্ন করে। পুলিশ যখন তার বাসা তল্লাশি করে, তারা ১৮০ পাতার একটি হ্যান্ডবুক উদ্ধার করেছিল। এই হ্যান্ডবুকটির নাম 'মিলিটারি স্টাডিজ ইন দি জেহাদ এগেন্স্ট দ্য টাইরান্ট'। এই ম্যানুয়েলে কিভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হবে, কিভাবে নকল-মুদ্রা তৈরি করতে হবে এবং কিভাবে নিরাপদ ভবন সংগঠন করতে হবে—সেসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছিল।

গত দশ বছরে লন্ডনে অনেক ইসলামিস্ট জঙ্গি এসে আড্ডা জমিয়েছে, এদের মধ্যে অনেকেই লাদেনের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে গলাবাজ ছিল শেখ ওমর বকরি মুহাম্মদ। এর দেশ সিরিয়াতে এবং নিজেকে একজন শরিয়া আদালতের জজ বলে দাবি করে। ২০০০ সালে এপ্রিল মাসের একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি ওয়াল থামস্টো সড়কে একটি হল খোঁজাখুঁজি করছিলাম যেখানে শেখ বকরির এক কনফারেন্সে বক্তৃতা করার কথা। কনফারেন্সের বিষয়বস্তু ছিল—'ওসামা বিন লাদেন ও সন্ত্রাস।' এমন সময় একটা ব্যানার আমার চোখে পড়লো লেখা আছে—'*Jehad Against the pirate state of Israel*।'

একটা সাধারণ হলে মিটিং হচ্ছিল, গিয়ে দেখলাম একদল লোক নামাজ পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছিল যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত সেনারা প্রার্থনা করছে—কাফেয়া ও কমব্যাট জ্যাকেট পরে, মাথায় টুপি চড়িয়ে অভিজ্ঞ আফগান ধর্মযুদ্ধ সেরে আর একটি ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শ্রোতাদের অধিকাংশ, সাধারণ ছাত্র, ভবঘুরে এবং ক্ষুদ্রব্যবসায়ী। গুনে দেখলাম ২৫০ জনের মতো মানুষ তার মধ্যে একশোর বেশি মহিলা। এদের মধ্যে অল্প কিছু বোরখাবৃত্ত অন্যদের মাথায় শুধু স্কার্ফ। এখানে আরব, আফগান ও এশিয়ানদের একদল মানুষ ভিডিও লাগিয়ে চেচনিয়াতে বোমাবর্ষণ দেখালো। একটি যুবক আমাকে কতকগুলো প্যাম্ফলেট দেখালো যাতে

লেখা আছে 'আমেরিকার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ' *'Jihad in America'*। হলের দেয়ালে পোস্টার সাঁটা— লেখা আছে *'Clinton : the most wanted terrorist and Jewish occupies; kill them when you see them.'*

শেখ বকরি হলে ঢোকার সাথে সাথে সকলের ফিসফিসানি শুরু হল। শেখ তার লাঠি ও কালো জোব্বাতে সেজে লম্বা পা ফেলে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল। ডায়াসে উঠেই বলতে শুরু করলো—আমরা এখানে ওসামা বিন লাদেনের গীত গাইতে আসিনি, যদিও তাকে আমরা সমর্থন করি। তবে সে উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন রাখলো; 'সন্ত্রাসী কে ? যে বিচার করবে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ ?' শ্রোতাদের মুখে কথা নেই, নির্বাক হয়ে শুনছে শেখের প্রশ্ন। তারপর শেখ আবার বললো—'আমরা বিন লাদেনের নেতৃত্ব স্বীকার করি, যদিও আমরা তাকে দেখিনি...এই লোকটি ইসলামের কারণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে...একজন লোক যে মাল্টি-মিলিয়নিয়ার।'

শেখের পরে আর একজন বক্তা উঠলেন। লম্বা ইয়া গোঁফ। ইয়ংম্যান, গায়ে টি-সার্ট আর পরনে সৈন্যদের মত ক্যামাফ্লেজ প্যান্ট। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিয়ে বললো—সে শেখ বকরির সংস্থার নিরাপত্তা পরিচালক। তার ইংরেজিতে ব্রিটেনের কক্‌নি উচ্চারণ প্রকট। বলল—দেখুন, ব্রিটেনে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করা অবৈধ নয়। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের, ঘটনার পর, যুক্তরাজ্যে আল-কায়েদার প্ল্যানে মুখ্য ভূমিকা পালনের জন্য একজন আলজিরীয় লত্‌ফি রাইসিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর বয়স তিরিশের কাছাকাছি, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, সে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণকারীদের মধ্যে চারজনকে সে বিমান চালনা শিক্ষা দিয়েছিল।

আফগানিস্তানে বিন লাদেনের খেল খতম হলেও বিশ্বব্যাপী অন্যান্য জেহাদি দলের সাথে তার শক্ত যোগাযোগ আছে। এদের মধ্যে পাকিস্তানের কাশ্মিরি দল অন্যতম। কাশ্মিরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার মধ্যে দু'বার যুদ্ধ হয়ে গেছে। উভয় দেশের নেতারা তাদের আণবিক অস্ত্র সামনে রেখে ময়দানে মালকোঁচা মেরে তাল ঠুকছে। সিআইএ'র হিসাব মতে এই কাশ্মির শিখণ্ডিকে নিয়ে আণবিক অস্ত্রের মহড়া দুনিয়ার যেকোন স্থানে হয়ে যেতে পারে। ১৯৯০-এর পর পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে এই সংঘাতে—আর প্রত্যেক দিন দুই দেশের বর্ডারে ফুটফাট চলছেই। ২০০১-এর জুলাই মাসে নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে মিটিং হলেও কোন সুরাহা হয়নি।

আল-কায়েদা ও কাশ্মির সন্ত্রাসী দল হরকতুল মুজাহিদিন (HUM) ঢলাঢলি স্পষ্টভাবে দেখা গেছে ১৯৯৮ সালে, যখন আমেরিকা আফগানিস্তানে আল-কায়েদার সামরিক ঘাঁটিগুলোতে ক্রুজ মিসাইল বর্ষণ করে। তখন অধিকাংশ বিন লাদেনের অনুচর এবং অনুসারী মিসাইল আঘাতের পূর্বেই ক্যাম্প ছেড়ে দেয়, কিন্তু বিশজনের মতো জঙ্গি মারা পড়ে; এই বিশজনের মধ্যে নয়জন ছিল হরকতের সদস্য। কাশ্মির থেকে ইন্ডিয়ানদের তাড়াবার জন্য প্রায় ডজন খানেক পাকিস্তানি

কাশ্মিরি দল আছে। হরকতুল মুজাহিদিন তার মধ্যে একটি। হরকত দলের এক শাখা ৬জন পশ্চিমা পর্যটককে অপহরণ করে কাশ্মিরে। তখন ১৯৯৫ সাল। একজন টুরিস্ট পালাতে সক্ষম হয়। অন্যজনকে স্কন্দ-কাটা করা হয়, বাকি চারজনের কোন সন্ধান নেই, মেরে ফেলা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয়। এই গ্রন্থ রচনার সময়ও আফগানিস্তানের ট্রেনিং ক্যাম্পে হরকত-সদস্যদের প্রশিক্ষণ চলছিল।

১৯৯৯-এর ডিসেম্বর মাসে, হরকত দলের সন্ত্রাস কৌশলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করি, কেননা এই সময় আমি ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন জেট হাইজ্যাকিং-এর ঘটনাকে 'কভার' করি। প্লেনটাকে দখলে আনা হয় কাঠমণ্ডুতে, নেপালে। তারপর এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের ঘোরাঘুরি করে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, দুবাই হয়ে শেষে কান্দাহারে অবতরণ করে। কান্দাহারে হাইজ্যাকাররা আলোচনা শুরু করে দাবি জানায় যে কাশ্মিরি জঙ্গিদের ও পাকিস্তানি মোল্লা মাওলানা মাসুদ আজহারকে ছেড়ে দিতে হবে। যারা ইন্ডিয়ার জেলখানায় বন্দী। উল্লেখ্য যে হরকত-শাখা, যারা পর্যটকদের অপহরণ করেছিল ১৯৯৫-এ, তারাও মোল্লা আজহারের মুক্তির দাবি জানিয়েছিল।

হাইজ্যাক করা প্লেনের অবস্থান জানার পর আমি কাবুলে চলে যাই, বিন লাদেন সম্পর্কে এক তালিবান মন্ত্রীর ইন্টারভিউ নিতে। সিএনএন-এর একজন এ্যাসাইনমেন্ট সম্পাদক আমাকে বলেছিল কান্দাহারে ASAP পর্যন্ত যেতে। কাবুল থেকে গাড়িতে কান্দাহার যেতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগে। আমি যে গাড়ি ভাড়া করেছিলাম, তার চালক ছিল কালো-পাগড়িওয়ালা মোল্লা। এই ড্রাইভার তালিবানের প্রথম রিক্রুট, যারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এখন গাড়ি চালায়, আর ক্যাসেটে হিন্দি-গীত শোনে গাড়িতে লাগিয়ে। আমরা পার্বত্য অঞ্চল ও মরু প্রান্তর ধরে চলতে শুরু করি। কখনো কখনো গ্রামাঞ্চল দেখা যায়। সেখানে আধুনিক কালের একমাত্র প্রযুক্তি হল মসজিদের ছাদে লাগানো লাউডস্পিকার। যাত্রা শেষ করতে ষোল ঘণ্টা লাগলো, কিন্তু আমার পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে রাস্তায় ঝাঁকুনি খেয়ে। মধ্যে আধঘণ্টা বিরতি ছিল কারণ মোল্লা ড্রাইভার রোজা ছিল। পাশের এক রেস্টুরেন্টে গিয়ে সে সন্ধ্যায় রোজা খুলে এলো। ঐ রেস্টুরেন্টে প্রায় ৪০/৫০ জন মানুষকে দেখা গেল, কালো চাপদাড়ি, অধিকাংশ তালিবান যোদ্ধা পাহাড়ের গায়ে সূর্য ডোবার জন্য অপেক্ষা করছে। একটু পরেই সূর্য ডুবলে সকলেই বসে গেল এক একটা বড় প্লেটে তিনজন করে। প্রথমে খেজুর, তারপর বিরাট এক নানরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলো। ভেড়ার গোস্ত, দৈ, চালের কাবুলি পোলাও, কমলা লেবুর কোয়া ইত্যাদি। মোট কথা রাতের মত খাওয়া সারা হয়ে গেল। তিনজনের বিল এলো টিপস্ও কোকাকোলা পানীয়সহ দুই ডলার।

তারপর আমরা রাত্রি ভেঙে চলে গেলাম দক্ষিণ দিকে কান্দাহারের দিকে। ভোরের সময়, এয়ারপোর্টে যখন পৌছলাম আমার শিরদাঁড়ার অবস্থা সঙিন, উঠে দাঁড়াতে পারি না।

২৭ ডিসেম্বর। সারা এয়ারপোর্ট জুড়ে টানটান টেনশন, কারণ হাইজ্যাকাররা মাত্র তিন ঘণ্টা সময় দিয়েছে। একজন অধস্তন ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটের সাথে আলোচনা চলছিল, তার সাথে বানিবনা না হওয়ায় হাইজ্যাকাররা শীর্ষ শ্রেণীর আলোচকের দাবি করলো কথা বলার জন্য, নইলে ১৫৫ জন যাত্রীর মধ্যে কয়েকজনকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। তারা এর আগেই এক ইন্ডিয়ানকে চাকু মেরেছে, বেচারা সদ্য হানিমুন করে নেপাল থেকে ফিরছিল। আহত ব্যক্তির চিকিৎসার অভাবে নিজের সিটেই রক্তক্ষরণের ফলে মরে পড়ে রইলো।

সময় কাছিয়ে এলো, কোন ফয়সালা হল না। হাইজ্যাকাররা দুইজন পশ্চিমা যাত্রীকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। তালিবান বিদেশ মন্ত্রী ওয়াকিল আহমদ মুতাওয়াক্কিল রেডিও মাধ্যমে তাদের জানালেন যে দিল্লি থেকে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা আসছেন। এখন তারা কান্দাহারের পথে। তিনি সাবধান করে দিয়ে বললেন যদি এর মধ্যে কোন যাত্রীর ক্ষতি হয় তাহলে তিনি তার সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করবেন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার এক মিনিট পূর্বে প্রায় আশিজন তালিবান কমান্ডো ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জেট বিমান ঘিরে ফেললো। তারপর সময় শেষ, কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না।

প্লেনের মধ্যে ক্যালিফোরনিয়ার এক সাইকোথেরাপিস্ট ছিলেন জেন মুইর, পঞ্চাশের মত বয়স, অসুস্থ বাচ্চাদের চিকিৎসা করছিলেন, তিনি জানতেন না যে হাইজ্যাকাররা দু'জন পশ্চিমা যাত্রীকে খুন করবে, তবে ভদ্র মহিলা জানতেন যে হাইজ্যাকাররা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রকৃতির। একটু গোলযোগ শুরু হতেই তিনি হঠাৎ মাথায় বন্দুকের বাঁটের গোঁত্তা খেয়ে বসে পড়লেন, আর্তনাদ করে, তারপর দেখলেন একজন হাইজ্যাকার কয়েকজন যাত্রীকে মারধর করছে। তিনি পরে আমাকে বলেছিলেন যে তার মাথায় যে আঘাত লাগে তার শব্দ তিনি কোনদিনই ভুলবেন না।

এক সময়ের হাইজ্যাকাররা পশ্চিমা বিদেশী যাত্রীদের জড়ো করে একস্থানে রাখলো, (নেপালি ও ইন্ডিয়ানদের অন্যদিকে)। তারপর তাদের নিয়ে গেল ইকনোমি কেবিনের সম্মুখে। তারা যাত্রীদের সব পাসপোর্ট কেড়ে নিল। হাইজ্যাকাররা যেমন নিষ্ঠুর ছিল তেমনি ছিল বাক্য-প্রিয়, কথা বলছিল বেশি। মুইর এই ফাঁকে বারজার বলে এক ভদ্রলোকের সাথে ইংলিশ গ্রামার সিনট্যাক্স এমনকি মনিকা লিউনিস্কির কাহিনী জুড়ে দিল। তিনি যুক্তি দেখালেন যে-কোন ধরনের বাক্যালাপ সময় ক্ষেপণে সাহায্য করবে এরপর তিনি ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে গল্প-গুজব শুরু করলেন এবং তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুললেন।

কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বিদেশ মন্ত্রী মুতাওয়াক্কিল হাইজ্যাকারদের সাথে বিরতিহীন আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মঙ্গলবার তিনি হাইজাকারদের কিছু দাবি ছাড় দেবার জন্য বললেন এবং অনুরোধ করলেন যে জঙ্গিদের ইন্ডিয়াতে কবর দেয়া হয়েছে তাদের মৃতদেহ তোলা ও ২০০ মিলিয়ান ডলার দাবিও প্রত্যাহার করতে। তিনি যুক্তি দেখালেন যে এ সমস্ত দাবি ইসলামীর শরিয়তসম্মত নয়।

তালিবান সরকার একটা যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত চুক্তির জন্য হাইজ্যাকারদের ওপর মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করলো। কান্দাহারে প্রতি রাতে তাপমাত্রা মরু এলাকায় ফ্রিজিং পয়েন্টের নিচে চলে যাচ্ছে, ফলে জেট বিমানের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে তালিবান সৈন্যদের গা গরম করতে হয়।

আফগানিস্তানে জাতিসংঘের প্রতিনিধি এরিক ডি মুল লম্বা কোট গায়ে চড়িয়ে অনবরত সিগারেট ফুঁকে বিমানবন্দরে পায়চারি করছেন। তিনি একজন ডাচ; এখানে তালিবানদের উপদেষ্টা হিসেবে এসেছেন। তিনি সাংবাদিকদের জানালেন যে তালিবান সরকার বেশ ভালভাবেই হাইজ্যাকারদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে।

বিমানের মধ্যে মুর বাচ্চাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন গল্পগুজব করে। কেবিন অন্ধকার এবং যাত্রীরা সব সময়েই তাদের মাথা দুই পায়ের নিচে দিয়ে বসে আছে; অনেকের চোখ বাঁধা। চারদিন ধরে এমনি অবস্থা চলছে। এক মহিলা যাত্রীর এই অবস্থায় হার্টের সমস্যা দেখা দিল। জেন মুর তাকে নিয়ে সেবা করলেন। মহিলা যাত্রীর অবস্থা ভাল নয় যে-কোন সময় হার্টফেল হতে পারে, তাই মুর এম্বুলেন্সের জন্য অনুরোধ করলেন। মুর তাকে নিয়ে ককপিটে গিয়ে প্রথমবারের মত চারদিকে চেয়ে দেখলেন। বিমানের জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন অস্ত্রসজ্জিত তালিবান সৈন্য, সকলেই দাড়িঅলা আর কালো পাগড়ি— ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান।

মুর আমাকে বলেছিলেন—হাইজ্যাকারদের ওপর যে প্রচণ্ড চাপ ছিল তা আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। তারা আমাকে বলেছিল যে তারা মৃত্যুকে ভয় করে না। আমার মনে হচ্ছিল যেকোন সময়ে গ্রেনেড দিয়ে তারা বিমানটাকে উড়িয়ে দিতে পারে।

সারা বুধবার ধরে আলাপ চললো, আর এদিকে হোস্টেজদের অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করলো। পাঁচ দিন ধরে এক নাগালে এই অবস্থায় তারা সিটে বসে, খাওয়া হয় মাত্র এক টুকরো রুটি, ভাত আর সিম। প্লেনের বাথরুম ভর্তি হয়ে উপচে পড়ছে মলমূত্র—চারিদিকে দুর্গন্ধ। প্লেনের ইঞ্জিনকে চালু রাখা হয়েছিল, এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম—ফলে এয়ার কন্ডিশন বন্ধ হলে যাত্রীদের মরণাপন্ন অবস্থা।

বৃহস্পতিবার ৩০ ডিসেম্বর তালিবানরা আর এক দফা শক্তি প্রয়োগের কথা জানালো। এই সময় একটি সশস্ত্র সেনাদল গাড়ি নিয়ে টারমাকে ঢুকে পজিশন নিল, পাহাড়ের ওপর অনেকে পজিশন নিল। একটি কনভয় কমান্ডো দল বিমানটা ঘিরে ধরলো। মোট কথা সাজসাজ রব চারদিকে। প্লেনের মধ্যে, হাইজ্যাকাররা যাত্রীদের বলছিল—'কোন শব্দ করবে না, নড়াচড়াও করবে না'—একথা মুর আমাদের পরে জানিয়েছিল।

মুতাওয়াক্কিল তার সেনা দলকে এইভাবে সাজিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করে সাবধান বাণী ছাড়লেন। হাইজ্যাকারদের উদ্দেশে বললেন—তোমরা নিরাপদে

বের হয়ে এসো, নইলো আমরা প্লেন আক্রমণ করবো। এর অর্থ এই যে সকলেই মারা পড়বে—কারণ তালিবানদের ইউএস ডেল্টা ফোর্সের মত বা ব্রিটিশ এসএএস-এর মতো কোন ইউনিট ছিল না, যাতে করে 'সার্জিক্যাল' হোস্টেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে শেষ হল ঘটনা। ইন্ডিয়ান সরকার আজহার ও দু'জন জঙ্গিকে ছেড়ে দিতে রাজি হল। মুস্তাক আহমদ জাগার, আল-উমরের নেতা (কাশ্মির গ্রুপ) এবং ওমর শেখ, ব্রিটিশ নাগরিক। এরা দু'জন আটক জঙ্গি। ওমর শেখের পরিবার পাকিস্তানে থাকে এবং সে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস্-এর গ্র্যাজুয়েট বলে দাবি করে। আর আজহার হল—পাকিস্তানের মাওলানা মাসুদ আজহার, ধর্মনেতা। মুতাওয়াক্কিল রিপোর্টারদের ডেকে শুক্রবার সকালে বললেন যে—সমঝোতা হয়েগেছে, তবে যাত্রীদের মুক্ত করা এই অবস্থায় বেশ নাজুক ও বিপজ্জনক। (পরে আমি জানতে পারি যে তালিবান ও হরকতুল মুজাহিদিন (HUM) মধ্যে আলাপ-আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং হাইজ্যাকারদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল কিছু সুবিধা আদায় করে হোস্টেজদের ছেড়ে দিতে)।

ঐদিন বিকালে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী যশোবন্ত সিং একটি জেট বিমানে হাজির হলেন, সেই সাথে ভারতের জেল থেকে ছাড়াপ্রাপ্ত জঙ্গিরা বিমানবন্দরে অবতরণ করলো। এরপর হাইজ্যাকারদের নিশ্চিত করা হলো যে তাদের কমরেডরা ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে—তখন তারা হোস্টেজদের বিমান থেকে অবতরণের সুযোগ করে দেয়। যাত্রীদের চারটি বাসে উঠিয়ে অপেক্ষারত একটি জেট বিমান করে নিউ দিল্লিতে আনা হয়। জেন মুর সকলের শেষে বিমান থেকে অবতরণ করেন—তিনি বেশ দুর্বল ও ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় হুইল চেয়ারে করে নামানো হয়।

হোস্টেজদের মুক্তির পর ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রী যশোবন্ত সিং বিমানবন্দরের লাউঞ্জে প্রেস কনফারেন্স আহবান করেন। সিং মহাশয় তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানান যে ভারত সরকার সন্ত্রাসীদের কাছে নত হয়নি, মানবতার কারণে একটা সমঝোতা হয়েছে। একজন অস্ট্রেলিয়ার রিপোর্টার সিং মহাশয়ের এই উক্তিতে চ্যালেঞ্জ করলে, তিনি তার জবাব না দিয়েই সাঙ্গপাঙ্গসহ চলে যান। এটা সত্য যে, ভারত সরকার এতোগুলো যাত্রীর জীবনের বিনিময়ে একটা সমঝোতা করেছে।

এই সংকট উত্তরণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জনসমক্ষেই তার সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে এই হাইজ্যাকিং-এর পেছনে পাকিস্তান সরকার কলকাঠি নেড়েছে। ওদিকে পাকিস্তান মিডিয়া বলেছে যে এ ব্যাপারে ইন্ডিয়ান ইনটেলিজেন্সের 'গোপন হস্ত' নিহিত ছিল।

হাইজ্যাকারদের জন্য এই অপারেশন খুব সাফল্যজনক। শুধু তারা তাদের কমরেডদের ভারতের জেল থেকে মুক্ত করেনি, তালিবান সরকার তাদের দেশ

থেকে অন্যত্র চলে যেতে সাহায্য করেছে—নিশ্চিতভাবে বলা যায় তারা পাকিস্তানেই গেছে। একজন সিনিয়র ইউএস কর্মকর্তা এই হাইজ্যাকিংকে বলেছেন—'Successful murder-hijacking.'

* * *

হরকতুল মুহাজিদিন (HUM) এবং অন্য উগ্রবাদী কাশ্মিরি দলকে বেশি করে জানবার জন্য আমি মুজাফ্ফরাবাদ শহরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই শহরটি সেই বর্ডারের কাছে যা আজাদ কাশ্মির ও ইন্ডিয়ার কাশ্মিরকে আলাদা করেছে এবং এই শহর জঙ্গি দলগুলো হেড কোয়াটার হিসেবে পরিচিতি।

ইসলামাবাদ থেকে মুজাফফরবাদ যাত্রা করার জন্য আমি পঁচিশ বছরের এক পাকিস্তানি খ্রিস্টান যুবক ইলিয়াস ড্রাইভারকে ভাড়া করি। যাত্রা করার পূর্বে আমি ইনফরমেশন মিনিস্ট্রিতে গেলাম মুজাফ্ফরাবাদ যাওয়ার পাস সংগ্রহের জন্য। একজন অফিসার আমাকে প্রয়োজনীয় পাস দিলন। তিনি আমাকে বললেন—সেখানে এখন খরা চলছে এবং ঈদের ছুটিতে বৃষ্টির জন্য সকলেই দোয়া-দরুদ পড়ছে, হয়তো বৃষ্টি হতে পারে।

ইসলামাবাদ থেকে বের হয়ে আমরা মারী হয়ে পাহাড়ি পথ দিয়ে যাত্রা করলাম। এই মারী ব্রিটিশদের সময় গ্রীষ্ম-নিবাস ছিল। এখানে মেন রোডে যে ভিক্টোরিয়া হলি ট্রিনিটি চার্চ আছে তা সাসেক্সকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা জঙ্গল-ঘেরা পাহাড়ি পথ বেয়ে যখন উঠলাম। ময়ূরের ও পাহাড়ি সিংহের ডাক কানে এলো। ইলিয়াস তার স্টেরিও ছেড়ে র‍্যাপ মিউজিক শুনতে আরম্ভ করলো। ইলিয়াসের আচরণ আমার পছন্দ হল। সে যেমন ধীরস্থির, তেমনি দক্ষ চালক। এর মধ্যে আর এক শব্দ পাওয়া গেল—যা মনে করিয়ে দেয় এটা 'Landslide Area'। ইতোমধ্যে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল এবং আমাদের সম্মুখে পাহাড়ের গায়ে কুয়াশা জমতে লাগলো। আমরা যখন মারীতে পৌছলাম ক্রস-রোডে দাঁড়িয়ে থাকা একজন আমাদের জানালো যে, আমরা ৬৫০০ ফুট ওপরে উঠে গেছি। যে বৃষ্টি হচ্ছিল, তা বরফে পরিণত হল।

ইলিয়াস হঠাৎ বলে উঠলো, মিস্টার পিটার স্যার, আমি আগে বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়েছি, কিন্তু এমন বরফ-পড়া দেখিনি।

সে খুব দক্ষতার সাথে একটা পিক-আপ ট্রাক পাশ কাটিয়ে গেল, কিন্তু গাড়ির বাম্পার রক্ষা করতে পারলো না। ট্রাকটি ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ইলিয়াসকে চিন্তা করতে বারণ করলাম। বললাম : মেরামতি খরচ আমি দিয়ে দেব। এরপর আমরা মারী গলফ ক্লাব ছাড়িয়ে আঁকা-বাঁকা পথে এগিয়ে যেতে থাকলাম। পথের দু'পাশে ভাঙা গাড়ির সারি। সবই দুর্ঘটনা কবলিত। এই সংকীর্ণ পার্বত্য পথ ধরে যাওয়ার সময় ভিজে রাস্তায় আমাদের গাড়ি পিছলে একটি পাথর ঘেরা স্থানে টক্কর খেলো এবং পরবর্তীতে গাড়ি গিয়ে পড়লো মেটাল গার্ডরেল ও পাথুরে দেয়ালের মধ্যখানে। দু'ইঞ্চির জন্য আমরা বেঁচে গেলাম,

নইলে গাড়িসহ প্রায় একশো ফুট নিচে বরফ ঢাকা পাইন গাছের তলে গিয়ে পড়তে হত।

গাড়িকে সেখান থেকে টেনে তোলা মুস্কিল। ফেঁসে গেছে পাথরের দেয়াল আর লোহার রেল গার্ডের মধ্যে। এই সময় আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা এদিক–ওদিক সাহায্যের জন্য রাস্তার দু'দিকে চেয়ে বাস বা ট্রাকের অপেক্ষা করছি। এমনি সময় একটা বাস এলো এবং এক দল কাশ্মিরি লোক বাস থেকে লাফিয়ে নেমে আমাদের গাড়ি ঠেলে তুলে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এলো। ইলিয়াস হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলো বলল ঈশ্বর ও যীশু আজকে আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। আমি সায় দিয়ে বললাম : ঠিক বলেছো, নির্ঘাত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলাম। ইলিয়াস শুধু মাথা নাড়ল।

আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম আস্তে আস্তে বরফ ছড়ানো পাহাড়ি রাস্তার ওপর দিয়ে। একটু পরেই ছোট একটি গ্রাম্য শহর পার হলাম। এমনি ছোটছোট শহরের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হল, স্থানীয় লোকরা আমাদের গাড়ির ভাঙা–চোরা অবস্থা দেখে হাসলো আমাদের দুরবস্থা দেখে। এরপর আমরা পাহাড়ি রাস্তা ধরে নিচের দিকে নামতে থাকলাম মুজাফ্ফরাবাদের দিকে, অবরোহনের সাথে সাথে আবহাওয়ারও চেহারা বদলে গেল। আমরা একটি নদী পার হয়ে চেক পয়েন্টে এলাম, প্রহরী–সেনারা আমাদের পাস দেখল এবং যেতে দিল।

মুজাফ্ফরাবাদের মধ্য দিয়ে যাবার সময় মনে হল যে সারি সারি পাহাড়ের গায়ে এই শহরটির অবস্থান, কুয়াশায় ভিজা ভিজা–স্যাঁতসেঁতে। শহরের ব্যানার, নোটিশ টাঙানো সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কাশ্মিরি জঙ্গিদের স্বাগত জানিয়ে। চারিদিকে উল্লাসের বাতাস বইছে মুজাহিদিন নেতাদের মুক্ত করার পর। আমরা চট্ করে একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়ে নিলাম তারপর হরকাতুল মুজাহিদিনদের খোঁজে বের হলাম। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মুজাহিদিনদের অপারেশনের ঘাঁটি শহরের বাইরে একটি সাদা–দেয়াল ঘেরা ভিলার মধ্যে। ভিলার বাইরে কয়েকটি জিপ ও ট্রাক পার্ক করা আছে, ভেতরে আছে সম্ভবত ডজনখানেক যুবক, একে–৪৭ নিয়ে সদা প্রস্তুত। একজন আমাকে নিয়ে গেল সিনিয়র অফিসারের কাছে, কাঠখোট্টা মানুষ, তিরিশের কাছাকাছি বয়স। গায়ে ক্যামাফ্লেজড জ্যাকেট, মাথায় পশমি টুপি। লোকটি কোন পরিচয় না দিয়ে আমাকে একটি রুমে নিয়ে গেল। রুমটির দেয়ালের চারদিক ট্যাঙ্ক ও আরপিজি ছবি দিয়ে ঢাকা। সেখানে বসেই সে আমাদের শুরু থেকে কাশ্মিরি জঙ্গিদের লম্বা কাহিনী শোনালো—পুরো কাশ্মির সংঘাতের ইতিহাস।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় কাশ্মির উতাহ্–আকারের একটি অঞ্চল ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বি–খণ্ডিত। ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশ গোটা কাশ্মিরকে গেলার জন্য ১৯৪৭ সাল থেকে যুদ্ধ করছে। কাশ্মিরের অর্ধেক বর্ডারের অপর দিকে ভারতের অধিকারে, কিন্তু অধিকাংশ কাশ্মিরি মুসলিম এবং

সকলেই ইন্ডিয়ার হাত থেকে ছুটতে চায়, বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এই বিচ্ছিন্নবাদীদের অনুভূতিকে—সেন্টিমেন্টকে আরো উস্কে দিয়েছে ভারতীয় সেনাদের ঘনঘন মানবধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। পাঁচ দশকের মধ্যে এই দুই দেশ দুটো সর্বাত্মক লড়াই করেছে ১৯৪৭ সালে আর ১৯৬৫ সালে। ১৯৪৭ সালের যুদ্ধের পর, জাতিসংঘ দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতির (সিজ ফায়ার) সন্ধি-চুক্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং বর্ডার অংশ সৃষ্টি করে দুই দেশের মধ্যে কাশ্মিরকে ভাগ করে দেয়। পাকিস্তানের দিকে পড়ে 'আজাদ'-কাশ্মির আর অন্য দিকে ভারত অধিকৃত কাশ্মির। জাতিসংঘ ভবিষ্যতের জন্য একটা 'রেফারেন্ডাম'-এরও ব্যবস্থা করে কিন্তু ভারত সরকার স্পষ্ট কারণেই সে পথে পা দেয়নি কোন দিন; রেফারেন্ডাম এ পর্যন্ত ঘটেনি। কারণ কাশ্মিরে সব মানুষ স্বাধীনতার জন্য ভোট দান করবে।

১৯৮০-র দশকের দিকে দু'দেশের মধ্যে আবার আবহাওয়া তপ্ত হয়ে যায় কারণ দুটো। একটা হল ভারতীয় কাশ্মিরে নির্বাচনে ইন্ডিয়ানদের কারচুপি। যাতে কাশ্মির মুসলিমদের হতাশ করে। আর দ্বিতীয় কারণ হল আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতদের তাড়ানোর পর বসে থাকা ধর্মযোদ্ধারা আর একটা 'জেহাদ' বাধাতে চায়। হরকতুল মুজাহিদিন জলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৫ সালে একদল আফগান মুজাদিনদের নিয়ে এবং নাম দেয়া হয় হরকত-উল-আনসার। ১৯৯৭-এ যখন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট হরকত-উল-আনসার দলকে সন্ত্রাসী দলভুক্ত করে, তখন এর নাম পরিবর্তন করে নাম দেয়া হয় হরকত-উল-মুজাহিদিন (যে অফিসারের সাথে কথা বলছিলাম, সে জানাল যে নামের পরিবর্তন হয়েছিল অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে, আমেরিকান ব্ল্যাকলিস্ট ছিল কাকতালীয় ব্যাপার)।

১৯৯৯ সালে মে মাসে পাকিস্তান সেনা, কয়েক শত কাশ্মিরি জঙ্গি এবং HUM সদস্যসহ এক সম্মিলিত বাহিনী কারগিল এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ি স্থান দখল করে নেয় ভারতীয় কাশ্মির স্টেটের এবং দুই মাস ধরে ভারতীয় প্রতি আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে। অক্টোবর মাসে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ, যিনি কারগিল অপারেশনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর সরকারকে উল্‌টে দিয়ে নিজেই তখ্‌তে বসে যান, ফলে কারগিল থেকে মার খেয়ে সরে আসতে হয় পাকিস্তানি সম্মিলিত বাহিনীকে।

আমি যখন 'হাম' কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার দল ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন হাইজ্যাকিং-এ জড়িত ছিল কিনা। সে কোন সরাসরি জবাব দিল না, এড়িয়ে গেল। তবে তার এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রকটভাবে প্রকাশ পেল, বললো কাশ্মির পুনরুদ্ধারের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। সে বিন লাদেনের সাথে তার দলের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে—যা বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ, 'হামের' নেতা ফাজিল রহমান, এক বছর আগে, পাবলিকভাবে ঘোষণা করেছিল যে, 'হাম' যোদ্ধারা আফগানিস্তানে আমেরিকান ক্রুজ মিসাইল আক্রমণে বিন লাদেনের ক্যাম্পেই মারা গেছে। 'হাম' কর্মকর্তা দৃঢ়ভাবে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জানিয়ে বললো যে, তারা অধুনা 'ফিদাইন দল'—শহিদী দল গঠন করেছে, ভারতে আত্মঘাতী মিশন পাঠাবার জন্য।

'হাম' একমাত্র দল নয় যারা 'ফিদাইন স্কোয়াড' গঠন করেছে। আর একটি দলও করেছে সে দল হল 'তেহরিক-ই-জিহাদ', যার নেতা 'হাম'-এর হেড কোয়ার্টার থেকে বেশি দূরে থাকে না। মুজাফ্‌ফররাবাদ শহরের এক নির্জন এলাকায় এদের ক্ষেত্রভূমি। 'হাম' নেতার সাথে দেখা করার পর আমি কয়েক ঘণ্টা পর, 'তেহরিক-ই-জিহাদ'-এর নেতা সেলিম ওয়ানির সাথে দেখা করি। সেলিম ওয়ানির বয়স ৪০, তিন সন্তানের জনক এবং খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারে। 'হাম' কর্মকর্তার মত সে নিজের নাম গোপন করে না এবং সামরিক পোশাকও পরে না; সাদাসিদে একটা জঙ্গি স্যুট পরে শীত এড়ানোর জন্য গায়ে উলের চাদর জড়িয়ে রেখেছে। সে আমাকে একটা রুমে নিয়ে গেল, কার্পেট পাতা, কয়েকটি চেয়ার এদিক ওদিক ছড়ানো। চা ও কেক খেতে খেতে আমরা কথাবার্তা বললাম। সে গোটা কাহিনী বলে গেল কেমন করে সে একজন কাশ্মিরি জঙ্গি হয়েছে।

ভারত আধিকৃত কাশ্মিরে তার জন্ম, শ্রীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে অর্থনীতিতে, ছাত্রদের ভারত-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। সরকার এ আন্দোলনকে শক্ত হাতে দমন করে ছাত্রদের ধরপাকড় শুরু করলে ওয়ানি পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। সে বললো—আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়া হয়, আমার বাবাকে সাতবার ধরে ইন্টারোগেট করা হয়। এরপর আমার আর কোন পথ থাকে না, আমি অস্ত্র ধরতে বাধ্য হই। ওয়ানি প্রথমে একটা শিথিল জঙ্গি দলে যোগ দেয়-ইউনাইটেড জেহাদ কাউন্সিল-এ, ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত। সে বলল, প্রথমে এই আন্দোলন করে কোন কাজ হয়নি। কিন্তু ১৯৯৬-এর দিকে আমরা অস্ত্র ও কর্মী দিয়ে কিছু কাজের কাজ করেছি। ১৯৯৭ সালে ওয়ানি 'তেহরিক' গঠন করে। সে জানাল যে 'প্রথমে ভারতীয় আউট পোস্টগুলোতে অপারেশন শুরু করি, ফায়ার ক্র্যাকার ও পেট্রোল বোমা দিয়ে, তারপর আমরা ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র দখল করতে থাকি তাদের-ই পোশাক ও ইউনিফরম পরে। পরে তাদের কৌশলও আয়ত্ত করি।' চলে আসার আগে, ওয়ানি আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন ভার্জিনিয়ায় তার চাচার সাথে দেখা করি এবং তার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিই।

এখানে একটা মুখ্য প্রশ্ন উঠতে পারে। এই দুটি দলকে—'তেহরিক' ও 'হাম'—পাকিস্তান সরকার কি পরিমাণ সাহায্য দেয়। পশ্চিমা ডিপ্লোম্যাটরা বলেন এরা পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও অপারেশনাল সাহায্য সম্ভার আইএসআই-এর মাধ্যমে পেয়ে থাকে। 'হাম' কর্মকর্তা বলেছিল যে তার দল শুধু ডিপ্লোমেটিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন পায় পাকিস্তান থেকে। এটা সত্য যে, এদের কাজ কারবার ও অপারেশনে পাকিস্তান বাগ্‌ড়া দেয় না।

'লস্কর-এ-তাইবার কথা ধরা যাক। এই সংগঠন কাশ্মিরি জঙ্গিদের পাকিস্তানমূলক ঘাঁটি। এদের অফিস ছড়িয়ে আছে ইসলামাবাদে। অন্যান্য কাশ্মিরি দলের মত, লস্কর শত শত জঙ্গি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। লস্কর অফিসে পৌছলে সংগঠনের মুখপাত্র আবদুল্লাহ মোন্তাজের আমাকে স্বাগত জানায়। বেঁটে ছোটখাটো গাঁট্টা-গোট্টা দাড়িঅলা মানুষ বয়সের চেয়ে বুড়ো বুড়ো ঠেকে। আসল বয়স নাকি চব্বিশ। মোন্তজের জানাল যে লস্করের কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রধান কাজ হল পাকিস্তানি জনসাধারণকে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। বিরুদ্ধ মত তৈরি করা। এই দলের 'প্রচার কেন্দ্র' আছে ২২০০টি যেখান থেকে ভারতের হিংসাত্মক কার্যক্রমকে তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে সংহতি ও মতামত গঠনের চেষ্টা করা হয়। ভারতে মানবাধিকার লংঘন কি এবং কোথায় ঘটছে সেগুলোকে 'হাইলাইট' করে খবর ছড়ানো হয়। এই সংগঠনের বাৎসরিক র‍্যালিতে লাখ লাখ পাকিস্তানি যোগদান করে।

কিন্তু লস্করের যুদ্ধ বা সংগ্রাম আলঙ্কারিক (রেটোরিক্যাল) নয়। মোন্তাজের বলল : আঠারো বছর বয়সে সে এই দলে যোগ দেয়। তাকে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং কোর্সে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়। সেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সে এন্টিএয়ারক্র্যাফ্‌ট গান, একে-৪৭, পিস্তল এবং আরপিজি ব্যবহার করার কায়দা-কানুন শিখে নেয়। এরপর সে 'আজাদ' কাশ্মিরে তিন মাস 'গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং' সমাপ্ত করে। এই প্রশিক্ষণে ভবন আক্রমণ করা ও গাড়ি-ঘোড়া 'অ্যাম্বুশ' করা শিখে নেয়। মোন্তাজের এ ধরনের মাত্র একটা অপারেশনে অংশ নিয়েছিল, কিন্তু ভারতে খাদ্য সরবরাহকারী 'কনভয়ের' কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। সে অপারেশন বিফল হয়।

ভারতের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক পাকিস্তানের উর্বর ভূমিতে চারা গজিয়েছে, শুধু আজাদ কাশ্মিরে নয়। সারা দেশব্যাপী। মাওলানা মাসুদ আজহার, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন হাইজ্যাকিং-এর ফলশ্রুতিতে ভারতের জিন্দাখানা থেকে মুক্তি পেয়ে, এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানে আবির্ভূত হন এবং এক আজিমুশ্বান মিটিং-এ জনতার উদ্দেশে করাচির দক্ষিণে জ্বালময়ী বক্তৃতা দেন। এরপর তার নিজ শহর বাহাওয়ালপুরেও ভাষণ দেন। বন্দুকধারী দেহরক্ষী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে, তিনি কাশ্মিরের মুক্তির জন্য জেহাদের আহ্বান জানান। ২০০০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আজহার ঘোষণা দেন যে 'হাম'-এর আর একটি জঙ্গি-শাখা গঠন করা হয়েছে 'জোসে-মোহাম্মদ' নামে। এই 'জোসে' অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েকজন সিনিয়র ইন্ডিয়ান কর্মকর্তাকে হত্যা ও ভারতীয় কাশ্মিরে কয়েক স্থানে বোমা ফাটানোর চেষ্টা করা হয়। 'জোসে মোহাম্মদ' (JEM) কয়েক শত অস্ত্রধারী সমর্থক, পাকিস্তানি ও কাশ্মিরি ছাড়াও কিছু আফগানিও আছে। আমেরিকান কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন 'জেম' বিন লাদেনের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে।

কাশ্মির থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বিন লাদেন ক্যাথলিক দ্বীপপুঞ্জ ফিলিপিন্সে, পুরানো একটি ইসলামিস্ট বিদ্রোহী দলকেও সাহায্য করছে এবং সে দলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ফিলিপিন্সের লোকসংখ্যা ৫০ মিলিয়ান-এর মধ্যে পাঁচ শতাংশ মুসলিম, এদের অধিকাংশ মুসলিম বাস করে দ্বিতীয় বৃহৎ দ্বীপ মিনদানাও-এ। কিন্তু দক্ষিণ দিকে শত শত ক্ষুদ্র দ্বীপে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে। ১৯৭২ সালের পর থেকে বিভিন্ন ইসলামিক দল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীন রাষ্ট্রের নামে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল, ফলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

এদের মধ্যে দুটি বড় দল হচ্ছে শক্তিশালী মোরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টের সদস্যরা ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে আল-কায়েদায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং ২০০১ সালের গ্রীষ্মকালে ফিলিপিন্স সরকারের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করে এবং ১৯৯১ সালে আবু সায়েফের ছোট দলটি মোরো ফ্রন্ট থেকে আলাদা হয়ে যায়। মোরো দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিল আবদু রাজিক জানজালানি—যে আবু সায়েফ (তলোয়ারধারী) নাম গ্রহণ করে। এই নাম ধারণের কারণ হল বিন লাদেনের মিত্র রসুল সায়েফ-এর সাথে সংযোগ রাখা, কারণ রসুল সায়েফের সাথে একজোটে আবু সায়েফ আফগানিস্তানে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। আবু সায়েফের দলে প্রায় দুইশো যোদ্ধা আছে এবং এরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামিয়ে ফেলেছে ১৯৯৩ সাল থেকে অপহরণ (কিডন্যাপিং) ব্যবসা করে। পশ্চিমা টুরিস্টদের মধ্যে যারা কিডন্যাপ্ড হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল এক আমেরিকান—নাম ঘুইলারমো সুবেরো। সে ফিলিপিন্সে ড্রাইভিং ট্রিপে ছিল। ২০০১ সালে জুন মাসে, এই দল জানায় যে সুবেরোর শিরশ্ছেদ করা হয়েছে।

আল-কায়েদার আমেরিকান আক্রমণে ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা নিক্ষেপকারী রামজি ইউসুফ রসুল সায়েফের সাথে ট্রেনিং নিয়েছিল এবং পরে আবু সায়েফের সাথে মিলে সন্ত্রাসী প্ল্যানের পরিকল্পনা করে। সে এবং বিন লাদেনের পুরানো কর্মী-সহযোগী ওয়ালি খান আমিন শাহ ১৯৯৪ সালে আবু সায়েফের সাথে কোলাবোরেট করে ফিলিপিন্সে ভ্রমণকালে পোপ জন পল (২)সহ আরো দশজন যাত্রীবাহী জেট বিমান উড়িয়ে সবাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এই ষড়যন্ত্রগুলো নস্যাৎ হয় যখন রামজি ইউসুফের ম্যানিলা এপার্টমেন্টে বিস্ফোরক দ্রব্য পরীক্ষার সময় ব্যাক-ফায়ার করে। সে তার ল্যাপটপ ফেলে পালিয়ে যায় এবং ঐ ল্যাপটপে এই পরিকল্পনার বিস্তারিত অপারেশন পদ্ধতির কথা বিধৃত ছিল। ইউসুফের গ্রেপ্তারের পর, আবু সায়েফ তার মুক্তির জন্য বারবার দাবি জানিয়ে অপহরণ কর্মে লিপ্ত রয়েছে।

আবু সায়েফের আর একজন মিত্র হল জামিল খলিফা। জামিল খলিফা বিন লাদেনের বোনের জামাই। বিন লাদেনের দু'জন বোনের মধ্যে একজনকে সে বিবাহ করে এবং জর্ডনে বিন লাদেনের পাকিস্তানি অফিসে কাজের জন্য আফগান

যুদ্ধের সময় লোকজন রিক্রুট করেছিল। ১৯৯০-র দশকের গোড়ার দিকে, খলিফা ফিলিপিন্‌সে ফার্নিচারের কারখানা তৈরি করে, ফার্নিচারের ব্যবসা শুরু করে এবং তার চার স্ত্রীর কোটা পূরণের জন্য এক ফিলিপিনো মহিলাকে শাদি করে। সে আবু সায়েফকে অর্থ সাহায্য দিতে চেষ্টা করে এবং দিয়েছিলও। ১৯৯৪-এ জর্ডনের আদালত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে কনভিক্ট করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়, কিন্তু এর মধ্যে সে জেদ্দার আমেরিকান কনসুলেট থেকে ভিসা সংগ্রহ করে আমেরিকাতে পালিয়ে যায়, কিন্তু পরবর্তীতে সানফ্রান্সিকোতে গ্রেপ্তার হয়ে জর্ডনে প্রেরিত হয়, কিন্তু তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী চার্জ পরে খারিজ হয়ে যায়।

১৯৯৭-এ খলিফার আইনজীবী যুক্তরাষ্ট্রে আমাকে বলেছিল যে তার মক্কেল আবু সায়েফকে যে অর্থ সাহায্য করে, তা মানবতার কারণে—এ ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ আবু সায়েফের অপহরণ ব্যবসা ছাড়া আর বেশি কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছিল না, যেমন ছিল প্যালেস্টাইনের হামাস বা লেবাননের হেজবুল্লাহর। খলিফা এখন জেদ্দায় বাস করে তার শ্যালক আত্মীয়ের সম্বন্ধে বলে বিন লাদেন আমার বাইশজন শ্যালকের মধ্যে একজন এবং আমি তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে পছন্দ করি না। বলতে কি এখন লাদেন পরিবারের সকলেই খলিফার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছে।

বিন লাদেনের অনুসারীরা দক্ষিণ রাশিয়ায়ও বেশ তৎপর, কারণ ১৯৯৪ সালে চেচনিয়া বিচ্ছিন্নতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লে বিন লাদেন এখানে সমর্থন দিয়ে চলেছে। অবশ্য চেচনিয়া রাশিয়ার সাথে বিচ্ছিন্নতা-যুদ্ধে জড়িয়ে আছে ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে। লিও টলস্টয়, ককেশাস-এ আর্টিলারি রেজিমেন্টে চাকরি করেছেন। তিনি চেচেনদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তার পুস্তক 'The Cossacks'-এ। তিনি বলেছেন, রাশিয়ানদের জন্য একমাত্র চেচেন ছাড়া অন্য কেউ ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করেনি। দেড় শতাব্দি পরও সে অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। রাশিয়ানরা দু'বছর ধরে যুদ্ধ করে চেচেনদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত, ১৯৯৯-এ এবং এখনও চলছে।

চেচেনদের যুদ্ধে সেনাদের মধ্যে যে ব্যক্তিটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তার নাম খাত্তাব। আফগানিস্তানে সাভিয়েতদের বিরুদ্ধে যখন সে যুদ্ধে যোগ দেয়, তখন তার বয়স ছিল আঠারো। এই সময়ে বিন লাদেনের সাথে তার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সে সম্পর্ক ছিল 'পিতা-পুত্রের' সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কারণে মিডিয়াতে সে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ বলে পরিচিত ছিল। ইউএস সরকারের কর্মকর্তারা এবং সৌদি সরকার-বিরোধী সূত্রের মতে 'খাত্তাব' নামটি দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। খাত্তাব একজন সৌদি। ১৯৭০ সালের দিকে সৌদি আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে আল-খোবার এলাকায় এর জন্ম এবং তার পরিবারের নাম হল আল-সুওয়াইলেম। ফটোগ্রাফিতে তার যে মুখচ্ছবি দেখা যায়, তাতে তার রুদ্রমূর্তি ফুটে ওঠে। একজন পেশাদার গেরিলার মতো

যেমন কেমাফ্লেজ্‌ড পোশাক পরিধান করে তেমনি তার ঘন কালো দাড়ি মুখের আসল আদলকে লুকিয়ে রাখে।

আমরা জানি যে খাত্তাব তার যৌবনকাল নিবেদিতভাবে কেটে গেছে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে, তাজিকিস্তানে এবং এবং চেচনিয়াতে। এবং চেচেন কমান্ডারদের ইসলামের র‍্যাডিক্যাল ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ করেছে—যারা যুদ্ধের প্রথম দিকে শুধু নামেমাত্র মুসলিম ছিল।

১৯৯৯-এর আগস্ট মাসে, খাত্তাব এবং চেচেন কমান্ডার সায়েল বাসায়েভ প্রতিবেশী দেশ দাগেস্তানে রাশিয়ান সেনাদের আক্রমণ করে দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধের সূচনা করে। এই সময়ে একটি ভিডিও টেপে খাত্তাব বলেছিল—আমি জানি রাশিয়ান ট্রুপস্‌-এ কত সৈন্য আছে—প্রতিদিন সেনাবাহিনী আসতে থাকবে, অনেকেই মারা পড়বে, অনেকেই বন্দী হবে এবং অনেক রক্তক্ষয়ও হবে। ১৯৯৯-এ সেপ্টেম্বরে কয়েকটি বোমার আঘাতে রাশিয়ায় একটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিং উড়িয়ে দেয়ায় তিনশো লোক মারা যায় এবং কর্তৃপক্ষ তাকে ও তার সহযোগী বাসায়েভকে এর জন্য দায়ী করে এই ঘটনায়।

১৯৯৯ সালে খাত্তাব চেচেনদের গ্রাম সারজেনইউট-এ (Serzhenyrt) একটি ক্যাম্প গঠন করে যেখান থেকে চেচেন ও দাগেস্তানিদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার বন্দোবস্ত হত। ইউএস কর্মকর্তারা অবশ্য মনে করত, শুধু চেচেন ও দাগেস্তানি নয়, অন্যান্য দেশের ইসলমী জঙ্গিদেরও সেখানে ট্রেনিং দেয়া হত। খাত্তাব এখন এক হাজার সেনা দলের কমান্ডার, তার মধ্য থেকে দুইশো সেনা এসেছিল মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে।

এই পরিচ্ছেদের উপ-শিরোনাম হল 'Around the world in Eighty Jihad's' (দুনিয়া জুড়ে আশিটি ধর্মযুদ্ধ) এবং এটা পুরাতন প্রবচন যা ঘুরে ফিরে আসে (what goes around comes around)। আল-কায়েদার বিশ্ব-প্রকৃতি এবং এর উপদলগুলো, এখন বিশ্বমুকুরে প্রতিভাত হল ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরের ধ্বংসযজ্ঞে। দর্পিত গর্বে ফুলে ফেঁপে ওঠা যুক্তরাষ্ট্র এখন আগ্রহ সহকারে অন্য দেশের শক্তি ও সম্পদের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে সাহায্য ও সমর্থনের জন্য—যেমন, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরাবিয়া, জার্মানি ও রাশিয়া—যে সমস্ত দেশ ইসলামী জঙ্গি দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কারণ আছে, কেননা এই জঙ্গিদল তাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ। এই দেশগুলো প্রাথমিকভাবে খবরাখবর যোগাচ্ছে, কিন্তু সামরিক সাহায্যও দিতে হতে পারে। এটা অবশ্য বলা যায় যে বিন লাদেনের সারা বিশ্ব-জুড়ে যেমন শত-সহস্র মিত্র আছে, তেমনি শত্রুও আছে শত মিলিয়ন।

অতীতে আল-কায়েদা তার ধর্মযুদ্ধ চালিয়েছে আফগানিস্তানের ঘাঁটি থেকে বিশ্বজুড়ে; এখন সারা বিশ্ব আল-কায়েদার প্রতি সেই যুদ্ধকে ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

পরিশিষ্ট

শেষ খেলা বা তামাম শোধ

(The Endgame)

As to America, I say to it and its people a few words: I swear to God that America will not live in peace before peace reigns in Palestine, and before all the army of infidels depart the land of Muhammad, peace be upon him.

Osama bin Laden, in a videotaped statement
first aired on-October 2001

Shareef don't like it
Rock the Casbah
Rock the Casbah
from 'Rock the casbah' The Clash.

নতুন শতাব্দির শরুতে যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ সুরক্ষিত মনে হচ্ছিল, যখন আমি ২০০১ সালের আগস্ট মাসে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করলাম। যদি বিন লাদেন ও তার নেটওয়ার্ক সেই নিরাপত্তার হুমকির কারণ হয় তাহলে কি আমেরিকানরা নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমুতে পারবে! উৎপত্তিগতভাবে, লখিন্দরের মত তাদের সেই নিরাপত্তা ভেদ করে সাপে কামড়াতে পারে, যদি সন্ত্রাসীরা না পারে। শীতল যুদ্ধে এবং আণবিকভাবে নিশ্চিহ্নতার হুমকির আর আকাঙ্ক্ষা নেই। শুধু স্বপ্নে আছ; এবং আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামরিক শক্তির পরিব্যাপকতা যুক্তরাষ্ট্রকে রোমান সামাজ্যের স্বর্ণ–যুগে পৌঁছে দিয়েছে, গথ কিম্বা ভ্যান্ডালদের আর দৌরাত্ম্য নেই।

১১ সেপ্টেম্বরে সেই আত্মতুষ্টির বিস্ফোরণ ঘটলো। ভ্যান্ডালেরা এখন আমাদেরই মধ্যে যারা পাঁচ হাজার আমেরিকানের মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমেরিকার আকাশে বায়ুতরঙ্গ ত্বরিতগতিতে অগ্নিশিখা ও কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল এবং অনেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ধারণাকে অনুমান করে এই আক্রমণকে বললেন আমেরিকার জীবন ধারা—The American way of life। যারা এই ধারণায়

এমন বক্তব্য রাখে তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এতে আত্মতুষ্টি পায়, কিন্তু অন্যদিকে বিন লাদেন ও তার অনুসারীদের প্রণোদনের (motivations) ওপর যত বেশি আঁচ ফেলে, তত আলো ফেলে না।

যদি আপনারা এই পর্যন্ত Holy War, Inc. পড়ে থাকেন, তাহলে সম্ভবত যে প্রশ্নটা মনে উদয় হবে তা হচ্ছে বিন লাদেন কেন করছে এবং কি করছে ? এর জবাব খুঁজতে গেলে আমাদের তামাসা করার পরিবর্তে বিন লাদেনের স্টেটমেন্ট ও ভাষণের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবো কেন সে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। বিন লাদেন কোন AY-rab নয়, যে মেজাজ খাট্টা করে ভোরে ওঠে মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এই বলে যে আমেরিকা হল আসল শত্রু। যুক্তরাষ্ট্রকে ঘৃণা করার জন্য তার যুক্তি আছে, আমরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করবো ১১ই সেপ্টেম্বরের মত ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটাতে কি এমন বস্তু উস্কানি দিল।

বিন লাদেনের রেকর্ডকৃত শত সহস্র কথার মাঝে কিছু ফাঁক–ফোকর থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে, সে কি কোন দিন হলিউডি মুভি বা সিনেমার কুফলের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে, কিম্বা ম্যাডোনার অর্ধ নগ্ন নৃত্যের বিরুদ্ধে, কিম্বা আমেরিকার সংবিধানের সংরক্ষিত পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে, কিম্বা সে কি কোন দিন পশ্চিমা সংস্কৃতি ও এলকোহলের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে, নাকি সমকামিতার অনুমোদনের বিরুদ্ধে ? সে ঐসব বিষয়ে বিবেচনার ভার ছেড়ে দিয়েছিল খ্রিস্টান মৌলবাদী জেরি ফলওয়েলের ওপর, যিনি ১১ সেপ্টেম্বরের ধ্বংসকে আমেরিকানদের নারী বাদ ও সমকামিতার সমর্থক এক জাতির ওপর সেপ্টেম্বরের গজব বলে উল্লেখ করেছেন। (... God's Vengence on Americans for condoming feminism and homosexuality) যদি আমরা বিচার করে দেখি, তা হলে দেখবো; বিন লাদেন আমেরিকান সংস্কৃতির ব্যাপারে পরোক্ষ সরল ও সহজ সেটা হল মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আমেরিকার নীতি বা পলিসি। সংক্ষেপে সেই নীতি গুলো হল আরবে লাগাতার ইউএস মিলিটারি বা সামরিক অবস্থান; ইসরাইলের জন্য আমেরিকার একপেশে সমর্থন ; আমেরিকার ইরাকের ওপর বিরতিহীন বোমাবাজি এবং মিশর ও সৌদি আরাবিয়াকে সমর্থন ও লালন যে মুসলিম দেশ দুটোকে বিন লাদেন ইসলাম থেকে খারিজ বলে মনে করে। (... regards as apostates from Islam).

বিন লাদেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধরত কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে এটা রাজনৈতিক যুদ্ধ—a politied War। এই যুদ্ধ তার নিজের ব্যাখ্যাত ইসলাম ধর্মের ধারণার ওপর আমেরিকার রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। আমেরিকাতে যেসব হাইজ্যাকার এসেছিল তারা মদের কারখানা বা AOL-Time Warner বা কোকাকোলার প্রধান কারখানাগুলো আক্রমণ করতে আসেনি; তারা আসেনি আক্রমণ করতে লাস ভেগাস বা ম্যানহাটন ওয়েস্ট ভিলেজ

এমন কি সুপ্রিম কোর্ট। তারা আক্রমণ করেছিল পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, যা আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক এবং এরই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এর পূর্বে আল-কায়েদা আক্রমণ করেছিল ইউএস এম্বেসিগুলো, সামরিক ঘাঁটিগুলো এবং যুদ্ধজাহাজে।

এরপর, একথা বলা কি যথেষ্ট হবে না যে, এই সংঘর্ষ 'সভ্যতার সংঘর্ষ', যেমন হার্ভার্ড প্রফেসর স্যামুয়েল হানটিংটন ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন ? তিনি লেখেছিলেন যে সাংস্কৃতিক কমিউনিস্ট ঠাণ্ডাযুদ্ধ ব্লক-এর স্থান দখল করেছে এবং সভ্যতার মধ্যে ক্ষুদ্ররেখাগুলো বিশ্ব রাজনীতির সংঘাতে কেন্দ্রীয় রেখায় পরিণত হচ্ছে। হানটিংটনের মতে ইসলামের নীতির কাঠামো খ্রিস্টান ও হিন্দুধর্মের বিধিবিধান বিরুদ্ধ তো বটেই, খ্রিস্টান রাজ্যে অর্থোডক্স মতবাদ ও ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে লড়তে কসুর করবে না। এইসব সংঘর্ষ তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ইতিহাসকেও ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

হানটিংটন ইসলামী মৌলবাদকে আগামী বিশ্বের অন্ধশক্তি বলে মনে করেন। কারণ তার বিবেচনায় উগ্র সংঘর্ষের প্রতি মুসলিমের স্বাভাবিক প্রবণতায় এটাই প্রকাশ পাচ্ছে যে তাদের সমাজ দিনে দিনে সামরিকায়নের রূপ ধারণ করছে এবং এটাকে কিছু পশ্চিম দেশীয় লোক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ যুক্তি খাড়া করেছেন যে পশ্চিমের সাথে ইসলামের কোন সমস্যা নেই, কেবলমাত্র কট্টর মৌলবাদী উগ্র ইসলামিস্ট ছাড়া। চোদ্দশো বছরের ইতিহাস কিন্তু অন্যরকম। হানটিংটন আরও লিখেছেন Islam has bloody borders—ইসলামের ইতিহাস রক্তরঞ্জিত—এ অভিযোগ, আমি নিশ্চিত, বসনিয়ার মুসলিমরা সমর্থন করবে।

হানটিংটন নির্ভুলভাবে বিংশ শতাব্দির 'ইসলামিক পুণর্জাগরণ'-এর প্রতি নির্দিষ্ট করেছেন, কিন্তু তিনি ভ্রান্তভাবে এই পুনর্জাগরণকে উগ্রবাদের সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। এই মতবাদে তিনি ঐ আমেরিকান সাংবাদিকদের সমগোত্র, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে খ্রিস্টান মৌলবাদের পুনর্জাগরণকে নিন্দা করেন শুধু যুক্তরাষ্ট্রে ক্লিনিকে নিয়োজিত ঐসব ডাক্তারদের যারা এবরশনে শিশুহত্যা করে। কিন্তু খ্রিস্টান পুনর্জাগরণ মিলিয়ন মানুষের আন্দোলন, অন্যদিকে এবরশন বিরুদ্ধ মৌলবাদী খ্রিস্টান মুষ্টিমেয়।

বিন লাদেনকে মনে হয় সভ্যতার সংঘর্ষ-এর থিসিসে বিশ্বাসী। মোটকথা তার দৃষ্টি আমেরিকান টারগেটে নিবদ্ধ। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সে বেশি অগ্নিশর্মা সবচেয়ে রক্ষণশীল মুসলিম দেশ সৌদি আরবের ওপর। ইহুদিদের শাপ-শাপান্ত করলেও এ পর্যন্ত আল-কায়েদা কোন ইসরাইলি বা ইহুদি টারগেটে আক্রমণ করে নি।

তাছাড়া ইসলাম একশিলাস্তম্ভ হলেও সাধারণ আচরণে এর রূপান্তর ঘটেছে। খ্রিস্টানদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল রয়েছে, তেমনি ইসলামেও আছে। যেমন MIT তে মুসলিম ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্ররা তাদের নিজস্ব প্রার্থনাঘর খাড়া করেছে;

ইয়েমেনের ইমামরা নির্বাচনে অংশ নেয়; ইরানি নারীদের মধ্যে নারীবাদের চেতনা জেগেছে (ইসলামিক ফেমিনিজম), তবলিগ জামাত, অহিংস মুসলিম মিশনারি আন্দোলন শুধু পশ্চিমাদেশেই পরিচিত; তালিবান, আফগানিস্তানের ধর্মীয় যোদ্ধা যারা দেশের অতি প্রচীন বৌদ্ধমূর্তি আল্লাহর নামে ধ্বংস করেছে।

এমন কি সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় (হানটিংটনের প্রদশনী–তে) যেখানে ১৯৯০ দশকে অর্থোডক্স সার্ব বসনিয়ান মুসলিম, ক্যাথলিক ক্রোয়েট মিলে ২ লক্ষ মানুষ মারা গেছে হানটিংটনের বিশ্লেষণ কেবল একটি পয়েন্টে। তথ্যগতভাবে দেখা যায়, একজন মাইলোসেভিক–এর দরকার হয়েছিল যুগোস্লাভ যুদ্ধাকে প্রজ্বলিত করার জন্য, যেমন একজন হিটলারকে প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত সমাধানের জন্য। হ্যাঁ, একবার ঘটনা চালু হয়ে গেলে সাধারণ জার্মান ও সাধারণ সার্ব (এবং ক্রোয়েট ও মুসলিম) তাদের প্রতিবেশী বন্ধুদেরও হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু শতাব্দির শত্রুতা হত্যাযজ্ঞের ও যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। আসলে রাজনৈতিক পরিবর্তনই হল মূল কারণ। বিসমার্কের অধীনে জার্মানি ইহুদিদের জন্য মন্দ ছিল না, যেমন ছিল যুগোস্লাভিয়া টিটোর অধীনে মুসলিমদের জন্য।

সভ্যতার সংঘর্ষ যাই হোক, ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি প্রলুব্ধকর থিওরি। এই থিওরির মূল্যমান বিভিন্ন বিস্তৃত অবস্থায় প্রয়োগ করা হয় এবং হানটিংটন–এর অনেক উদাহরণ দিতে পারেন   সুদান এবং এর ইসলামিস্ট রাজ্যের মধ্যে রক্তস্নাত যুদ্ধ এবং এনিমিস্ট ও খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের; রাশিয়া ও চেচেনদের মধ্যে লাগাতার যুদ্ধ; ফিলিপিন্সে মুসলিম বিদ্রোহ; ইসরাইলে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে; এবং এখন, সম্ভবত ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ও তার জের।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী যে অসংখ্য সংঘর্ষ চলছে একে অন্যের বিরুদ্ধে। হানটিংটন বলেছেন ১৯৯০ দশকের মধ্যে ভয়াবহ রক্তক্ষরা জেনোসাইড হয়েছে তা সভ্যতার মধ্যে নয়, উপজাতি দলের মধ্যে; মধ্য এশিয়ায় হুতুস ও তুটসিস (Tutsis)-এর মধ্যে। এই যুদ্ধে আট লক্ষ মানুষ মারা গেছে। সোমালিয়াতে ১৯৯২ সালে মানবতার কারণে পশ্চিম দেশীয় হস্তক্ষেপ ছিল একটা পার্শ্বচিত্র যেমন এক দশক ধরে যে পাশবিক গোত্রযুদ্ধ হয় তা অধিকাংশ মুসলিম জাতির মধ্যে। এই গোত্রযুদ্ধে প্রাণহানির সংখ্যা গণনাতীত ভয়াবহ। কলাম্বিয়াতে যে গৃহযুদ্ধ চলছে তাতে হাজার হাজার প্রাণহানির সাথে মিলিয়ন সংখ্যক লোক গৃহহীন হয়েছে। এই গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে ডান ও বাম দলের মধ্যে কোকেন ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য।

১৯৮০–র দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ হয়েছে হানটিংটন একেই তার থিসিসের মূল দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। একেই তিনি সভ্যতার যুদ্ধ বলে ব্যক্ত করেছেন, কারণ বিশ্ব মুসলিম একে সেইভাবে গ্রহণ করেছে এবং সেখানে সব দেশের মুসলিম জড়ো হয়ে যুদ্ধ করেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ভালো কথা। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল, ১৯৮৯ সালে

সোভিয়েতের আফগানিস্তান ত্যাগ করার পর, যে মিসাইল সোভিয়েতের ওপর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেই মিসাইল নিজের দেশের বিরুদ্ধেই আফগানরা ব্যবহার করে নিজেদের থিওরিই বদলে দিল। আফগানিস্তান গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হল। আফগানির বিরুদ্ধে আফগানি, ইসলামিস্ট-এর বিরুদ্ধে ইসলামিস্ট, সুন্নির বিরুদ্ধে শিয়া, পাঠানদের বিরুদ্ধে তাজিক মরণপণ যুদ্ধে একে অন্যকে হত্যা করল। ফলে মারা গেল হাজার হাজার মুসলিম মুসলিমের হাতেই। জানাশোনা প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের মধ্যেই সংঘর্ষ। একে কি সভ্যতার যুদ্ধ বা সংঘর্ষ বলা যাবে ?

একটু গভীর দৃষ্টি নিয়ে দেখলে সভ্যতার সংঘর্ষকে বেশ জটিল বলে মনে হবে। কাশ্মিরের দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় সেখানকার মুসলিম, পাকিস্তানের সাহায্যে হিন্দুদের সাথে লড়ছে স্বাধীন হবার জন্য। কিন্তু অতি নিকটে গিয়ে পরিদর্শন করলে দেখা যাবে অধিকাংশ কাশ্মিরি জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীন সত্তার সংগ্রামে রত। তারা যেমন ভারত শাসনের বিরুদ্ধ, তেমনি পাকিস্তানের জঙ্গি ইসলামিস্ট বিরুদ্ধ।

ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর দ্বন্দ্বের মধ্যে সত্য বস্তু যা ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে প্রাচীন জাতীয়তাবাদ। এর প্রতিফলন দেখা যায় কোসোভো (Kosovo) -তে। ১৯৯৯ সালে কোসোভানরা, যারা নামে মুসলিম, তারা বাইরের জঙ্গি ইসলামিস্টদের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছে শুধু এই কারণে যে এতে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জটিল হয়ে দাঁড়াবে। কুর্দরা ইরাক ও তুর্কিদের সাথে কয়েক দশক ধরে সংগ্রাম করছে স্বাধীনতার জন্য।

আর এক ধরনের সংঘর্ষকে মাইকেল ইগ্‌নাতিয়েফ (Ignatieff) বলেছেন 'Narcissison of minor differences'—স্ব-প্রেমের ক্ষুদ্র পার্থক্য। কথাটা ইগনাতিয়েফ ধার করেছেন ফ্রয়েডের কাছ থেকে। এ সংঘর্ষ বাধে সম-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশীদের মাঝে। যেমন অধুনা আফ্রিকাতে এ ধরনের বহু সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে।

অন্য একটি সংঘর্ষ হচ্ছে ক্ষমতার রাজনীতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯০ সালে সাদ্দাম হোসেনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কুয়েত দখল। দুই দেশের মানুষ একই জাতি, একই ধর্ম, একই ভাষা, একই সংস্কৃতি। শুধু ক্ষমতা প্রসারের জন্য এই সংঘর্ষ। এর ফলে ইরাককে নিজের দেশের আম ও ছালা দুটোই হারাতে হয়েছে। তার এই হটকারিতায় কোন আরব দেশ, এমনকি মুসলিম দেশ তার সাথে ছিল না। কারণ, সাদ্দাম ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে স্বৈরাচারিতার চূড়ান্ত দেখিয়েছে। সে জঙ্গি ইসলামিস্ট, শিয়া, কুর্দ, দক্ষিণ ইরাকের মার্শ আরব কাউকে নির্মূল করতে সে কসুর করে নি।

গাল্‌ফ যুদ্ধের, আরব বিশ্বে, জনপ্রিয়তা ছিল না—সিরিয়া, সৌদি আরবিয়া, মিশর, কাতার বাহরাইন, কুয়েত এবং ওমান সকলেই 'অপারেশন ডের্জাট স্টর্ম'—এ তাদের সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। এমন কি, সৌদি ও মিশরের উলেমারা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধও বলে ঘোষণা দিয়েছিল, যদিও

সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিয়ে কোন মুসলিম দেশের সাড়া পায়নি। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের কোন মুসলিম দেশ সাদ্দাম হোসেনকে মধ্যপ্রাচ্যের 'স্ট্রংম্যান' রূপে দেখতে চায়নি।

প্রসিডেন্ট জর্জ বুশ এখন ভিন্ন ধরনের একটি যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে কমান্ডর-ইন-চিফ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ যুদ্ধ তার পিতার যুদ্ধের মত নয়, যে যুদ্ধে তার পিতা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে ১৯৯০-এ করেছিলেন। তবুও অনেক মুসলিম দেশ ও জাতি এমন কি জর্ডন ও ইয়েমেন যারা গাল্ফ যুদ্ধে ইরাকের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল সকলেই আমেরিকার নেতৃত্বে কোয়ালিশন বাহিনীতে সাহায্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্য সরকার আল-কায়েদা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে, কারণ তারা জানে যে বিন লাদেন তাদের নীতি-বিরুদ্ধ এবং উগ্র জেহাদি দলের প্রতি তাদের বিরুদ্ধ মতে জনগণের সমর্থনও আছে, কারণ উগ্র জেহাদি দলের নীতি ও মতবাদ বর্তমান যুগের সাথে সমন্বিত নয়। উগ্র জেহাদি দল অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্য সরকারকে আক্রমণ করে উৎখাত করতে আগ্রহী। তাই স্পষ্ট মৌলবাদীদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন নেই। মডারেট মধ্যপন্থী ইসলামিস্ট দল এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

সংবাদিক জেনেভিয়েভ আব্দো যুক্তি দেখান যে, মডারেট ইসলামিস্ট আন্দোলন দলে দলে এগিয়ে আসছে যেমন মিশরে পেশাদারী ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রয়াসী। আব্দোর থিসিসকে আর একজন সাংবাদিক, এন্থনি শাদিদ বিস্তৃত করে দেখিয়েছেন—তিনি বলেন মডারেট ইসলামিস্ট আন্দোলন শনৈঃ শনৈঃ গুরুত্ব পাচ্ছে শুধু মিশরে নয়। জর্ডন ও ইরানেও। (অর্থাৎ ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনের কতৃত্বে উল্টো হাওয়া বইছে, যেখানে শান্তি প্রক্রিয়ার মৃত দেহের ওপর উভয় পক্ষের কট্টরবাদীরা শক্তিশালী হয়ে উঠছে)।

ইয়েমেনেও গণতান্ত্রিক ইসলামিস্ট আন্দোলনের উন্নয়ন ঘটছে। ইসলামিস্ট ইসলাহ পার্টি, যারা পার্লামেন্ট ২০% আসন দখল করেছে তাতে ইসলামিস্ট মুসলিম ব্রাদারহুডও আছে, যে দল এক দশক পূর্বে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নি। এখন ইসলাহ মাল্টিপার্টি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দায়িত্বশীল অভিনেতার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় ইসলামিস্ট আন্দোলনের কার্যক্রম বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ ইসলামের নীতি কোন দিনই গণতন্ত্র বিরুদ্ধ ছিল না। শুরা অর্থাৎ জনগণের সাথে আলোচনা ও আলাপ ইসলামে সুপ্রাচীন ধারণা এবং এই ধারণা গণতান্ত্রিক কাঠামোতে খাপ খাওয়াতে অসুবিধা নেই। যদি জনগণের সাথে আলোচনা না হয় তাহলে নির্বাচনের প্রশ্ন আসে কি করে ? ঠিক যেমন ফ্যাঙ্কোর ফ্যাসিজম সপ্তম শতাব্দির ইউরোপের রাজা-রাজড়াদের স্বর্গীয় অধিকার এবং ১৯৬০-র দশকের আমেরিকার সিভিল (গন) অধিকার আন্দোলন এ সবই খ্রিস্টান সমাজ থেকেই বের হয়েছে—এর যে-কোন রাজনৈতিক মডেল ইসলামিক

পরিবেশে সম্ভব হতে পারে। প্রমাণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়াকে তুলে ধরা যায় : দুইশত মিলিয়ানের অধিক নাগরিক নিয়ে সারা বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম গণতান্ত্রিক দেশ। অবশ্য এ সত্যকে অস্বীকার করাও যায় না যে মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে অনেক মুসলিম রাষ্ট্র স্বৈরাচারী ডিক্টেটর ও একনায়কোচিত বাদশা কর্তৃক শাসিত হচ্ছে।

যদি রাজনৈতিক ইসলামের প্রবক্তারা সুদান ও আফগানিস্তানের মত রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য ইসলামিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় এবং যদি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অসহিষ্ণু ইসলামিস্ট দল ও পার্টি দেখা দেয় তাহলে র‍্যাডিকেল ইসলামিস্টদের এই হলি ওয়ার ইন-কর্পোরেট-এর গুরুত্ব থাকলো কি ?

এই প্রশ্নের জবাব তৈরি করতে আমাকে বিচ্ছিন্নবাদীদের ইতিহাস বিবেচনা করতে হয়। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দির এসাসিনদের (Assassin) কথা ধরা যাক। এরা ছিল উগ্রবাদী মুসলিম গোষ্ঠী, ইসলামের ইতিহাসে সংঘবন্ধ সন্ত্রসীদল, যারা অতি সুচারুভাবে ও ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে শত্রুদের নির্মূল করতো এসাসিনরা তাদের সন্ত্রাসী অভিযান চালাতো সুদূর পাহাড়ি দুর্গ থেকে। সেই সব অঞ্চল এখন সিরিয়া ও ইরানের অংশ। এ সন্ত্রাসী দলকে পাঠানো হত প্রধানত রাজনৈতিক শত্রুদের হত্যা করার জন্য আর তাদের হত্যার শিকার ছিল সুন্নি রাজনৈতিক দলের আমির বাদশা এবং কিছু খ্রিস্টান প্রধান। এসাসিনদের ঘিরে কিম্বাদন্তি গড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে পশ্চিমে (West), যেখানে বিশ্বাস করা হত যাত্রার পূর্বে এসাসিনরা হাশিশ পান করে হত্যা অভিযান চালাতো। এর প্রধান নেতা ছিল হাসান সাব্বা তাকে বলা হত পর্বতের বৃন্ধ ব্যক্তি—ওল্ডম্যান অব দ্য মাউন্টেন। (অষ্টম শতাব্দির পর সেই এসাসিনদের অদ্ভুত প্রতিনিধি রূপে দেখা দিল আল-কায়েদা-যার নেতা মোহাম্মদ আতা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারের দিকে আমেরিকান এয়ার লাইনস ফ্লাইট ১১কে পরিচালনার পূর্বে সাথীদের নিয়ে পানশালায় কয়েক গ্লাস মাল টেনে যাত্রা করেছিল)।

এসাসিন ও আল-কায়েদার মধ্যে স্পষ্টতঃ অনেক ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত আল-কায়েদা তার কর্মক্ষেত্রের ঘাঁটি করেছিল আফগানিস্তানের সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে তাদের আক্রমণের টারগেট থেকে অনেক অনেক দূরে। দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধন করা; বিন লাদেন ও তার কোম্পানি নির্দিষ্ট ব্যক্তি হত্যায় আগ্রহী ছিল না, যদিও তারা হোসনি মোবারককে ১৯৯৫ সালে হত্যার চেষ্টা করে। তাদের কর্মধারা-নীতি হচ্ছে ভবন ও ঘাঁটি ধ্বংস করা, বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দেয়া মাস ডেস্ট্রাকশন—একে সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কি বলা যায়। যদিও এসাসিনরা শিয়া গোষ্ঠীর একটা বিচ্ছিন্ন, একটা ক্ষুদ্র দল ছিল মুসলিম বিশ্বে, বিন লাদেন হল সুন্নি ইসলামের নাব্য মৌলবাদী দল, কিন্তু মূলত উভয় দলই সুন্নি প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমা শক্তির ঘোর বিরুদ্ধে। এসাসিনের ওল্ডম্যান অব দ্য মাউন্টেন-এর মত বিন লাদেন প্রায় সেই কিংবদন্তি নায়কের মর্যদা—স্ট্যাটাস হাসিল করেছে।

এসাসিনরা তাদের শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল সত্যি কিন্তু এতো করেও তারা কোন শহর দখল করতে পারে নি, রাজ্য প্রতিষ্ঠাও করতে পারে নি। দুই শতাব্দি ধরে সন্ত্রাসী কারবার করে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। তাদের নির্মূল করেছিল মঙ্গল হালাকু খান। বিন লাদেনের দল ও তার ধর্মযোদ্ধারা যারা এখনো আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এসাসিনদের মত ইতিহাসে কি রক্তাক্ত স্বাক্ষর রেখে যাবে ? অথবা তাদের ধর্মযুদ্ধ আরও বেশি কিছু অর্জন করছে ?

এটা অবশ্য নির্ভর করে আমেরিকা ও তার মিত্র দলের কোয়ালিশন বিন লাদেন ও আল–কায়েদার বিরুদ্ধে কিভাবে মোকাবেলা করে। ভবিষ্যতে কি ফলাফল দাঁড়াবে অনুমান করা শক্ত। কারণ কেউ কি কোন দিন আশা করেছিল টেলিভিশনের পর্দায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার জীবন্ত ঘটনা অবলোকন করবে ? আমাদের এখন ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকতে হবে যুক্তরাষ্ট্র ও জোট দলের সামর্থ্য এবং বিন লাদেন ও তার ধর্মযোদ্ধাদের সামর্থ্যের দিকে— বিশ্ব শক্তির বিরুদ্ধে বিন লাদেন টিকে থাকতে পারে কিনা।

প্রথমে দেখা যাক যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে তার দাবার ঘুঁটিতে চাল দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে প্রথাগতভাবে যে ইন্‌টেলিজেন্স ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, সে কৌশল ও ইনটেলিজেন্স আল– কায়েদার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যাবে না। পূর্বে ইউএস সরকার কিছু সংবাদদাতা রিক্রুট করে কিছুটা লাভবান হয়েছিল জামাল আল–ফজল এবং লা হোসাইনি খ্রেচটো (Kherchtou) অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন আল–কায়েদার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে, ১৯৯০–র দশকের মধ্যভাগে; এমনকি বিন লাদেনের মিশরীয় আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টা আলী মোহাম্মদ একজন ভালো প্রসিকিউশন সাক্ষ্য হতে পারে যদি কোনদিন বিন লাদেনকে আমেরিকান আদালতে আসামি হয়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা অবাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে এই মানুষদের বিন লাদেনের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। তাই ১৯৯৮ সালের পর থেকে তারা বিন লাদেনের অবস্থান ও কর্মধারা ও প্ল্যান সম্বন্ধে কোন তাজা সংবাদ দিতে পারবে না।

তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কোন গুপ্তচর বিন লাদেনের দলে নেই। যারা সংবাদ সংগ্রহ করে খবরাখবর দিতে পারে। রুয়েল গেরেচ (Reuel Gerecht) তার এক প্রবন্ধে এক সিআইএ কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন সম্ভবত সিআইএ'র এমন কোন যোগ্য আরবি জানা অফিসার নেই, যার মধ্যপ্রাচ্যের অভিজ্ঞতা আছে এবং একজন গ্রহণযোগ্য মৌলবাদীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে বছরের পর বছর ধরে আফগানিস্তানে শুকনো রুটি আর খেজুর খেয়ে আর আফগানিস্তানের পাহাড় পর্বতের গুহার মধ্যে রাত দিন গুজরান করবে কোন মেয়েমানুষের সঙ্গছাড়া...। অধিকাংশ অফিসার যারা ভার্জিনিয়ার আশেপাশে বাস করে, তাদের দিয়ে একম্মো হবে না। রুয়েলের এই প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল 'দ্য আটলান্টিক মাসিকে' (The Atlantic Months)।

পরিশেষে এটাও সম্ভব নয় যে ইউএস ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর ব্যয় করবে চারদিকের ফোন কল অভিগ্রহণ (ইন্টারসেপ্টিং) করে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ) হয়ত বিন লাদেন ও অনুসারীদের মধ্যে যোগাযোগের পিছে লেগে থেকে সেটেলাইটের মাধ্যমে অভিগ্রহণ করে গলার স্বর ধরে মানুষকে চিহ্নিত করতে পারে, কিন্তু বিন লাদেনের এমাজিন জানা আছে ১৯৯৭ সাল থেকে সুতরাং সেটেলাইট ফোন কলের মাধ্যম ব্যবহার না করে সে তার নির্দেশ রেডিও বা লোক মারফতে পাঠাতে পারে। তাহলে ?

যুক্তরাষ্ট্রের কাবুল এম্বেসি বন্ধ হওয়ার পর থেকে এক দশক ধরে আফগানিস্তানে তাদের নিজস্ব কোন লোকজন নেই, সুতরাং বিন লাদেন ও তালিবানদের সম্বন্ধে সরজমিন সংবাদ বা খবর পেতে হলে অন্য কয়েকটি সূত্রের মাধ্যমে পেতে হবে; একটি গুরত্বপূর্ণ সূত্র হল পাকিস্তানের আইএসআই। এর কর্মকর্তাগণ যারা তালিবানদের ক্ষমতার শিখরে উঠতে শুরু থেকেই সাহায্য করেছে। এদের কাছ থেকে কোন সংবাদ পাওয়া গেলেও তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না, কারণ আইএসআই ও এর কর্মকর্তারা তালিবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। দ্বিতীয় সোর্স বা সূত্র হচ্ছে উত্তরাঞ্চলীয় মিত্র পক্ষে নর্দার্ন এলায়েন্স। তাদের আমরা দেখেছি তালিবান ও বিন লাদেনের ফোর্সের বিরুদ্ধে বছর ধরে লড়াই করেছে। নর্দার্ন এলায়েন্স যুক্তরাজ্যকে ১৫ থেকে ৩০ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে যদি যুক্তরাষ্ট্র স্থলযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয় সূত্র হল (এখনও পরীক্ষিত হয়নি) ঐসব আফগানি গোত্রের মানুষ যারা তালিবানদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে কয়েক লাখ পোপালজাই গোত্র। অধিকাংশ পোপালজাই পূর্ব ও উত্তর কান্দাহারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসবাস করে। কান্দাহার তালিবানদের ডি ফ্যাক্টো রাজধানী ছিল। পোপালজাই গোত্রের নেতা আবদুল আহাদ কারজাইকে ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানে হত্যা করা হয় যার পেছনে তালিবানদের হাত আছে বলে সকলে অভিযোগ করে। সুতরাং স্পষ্ট কারণে পোপালজাই গোত্রের বর্তমান নেতা হামিদ কারজাই (আবদুল আহাদ কারজাই-এর পুত্র) যুক্তরাষ্ট্রকে বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যে-কোন অভিযানে সহযোগিতা দিতে রাজি হবে।

অন্য আর একটি সংবাদ সংগ্রহের সূত্র হল ইউএস স্পেশাল ফোর্স অপারেটর যারা ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আফগানিস্তানে গিয়েছিল বিন লাদেনের অবস্থান খুঁজতে ও সংবাদ সংগ্রহ করতে। (কয়েকজন সিনিয়র ফোর্সের হেড কোয়ার্টার ব্র্যাগ দুর্গে আফগানিস্তানের ওপরে আলী মোহাম্মদের লেকচার শুনেছিলেন। সেইসব লেকচারের পিছু তথ্য কাজে লাগতে পারে)।

শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ও প্রকৃতি কত এবং কি ধরনের তা জানার প্রয়োজন আছে। তালিবান ২০ হাজার থেকে ৪০ হাজার সেনা সমাবেশ করতে পারে হয়তো আরো নতুন রিক্রুটও আসতে পারে যদি তালিবানরা একে গোত্র

যুদ্ধে পরিণত করতে চায় যেমন পাঠান (তালিবান) বনাম তাজিক (নর্দার্ন এলায়েন্স)।

বিন লাদেন তার নিজ পক্ষ থেকে আফগান গেরিলাদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা তৈরি করেছে। কিন্তু ১৯৮৬ সালের পর সে তার নিজস্ব বাহিনীর সংগঠনে মনোযোগ দেয়। তার কোন গ্রুপের লোক সংখ্যা কয়েক শতক হবে, যারা আফগানিস্তানের পর্বত শ্রেণীর সাথে সুপরিচিত। তারা সত্যিকারের যোদ্ধা নিবিড়ভাবে নিবেদিতপ্রাণ, আর তাদের নেতা ও আমিরের জন্য জান কোরবান করতে প্রস্তুত। তারা আরপিজি, সাব মেসিনগানে সুসজ্জিত এবং নানা ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সবচেয়ে মারাত্মক হল এরা স্টিঞ্জার মিসাইল–এ পারদর্শী এবং এ মিসাইল তারা বহন করে। সুতরাং আমেরিকান হেলিকপ্টার ও নিম্নগামী জেটবিমানে স্টিঞ্জার মিসাইল ব্যবহার করবে সন্দেহ নেই। একজন সিআইএ কর্মকর্তা আমাকে ২০০১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বলেছিলেন যে, এখনো কয়েকশো স্টিঞ্জার আফগানিস্তানে তালিবান ও বিন লাদেনের কাছে আছে। ঐ কর্মকর্তা আমাকে বলেন যে একটা স্টিঞ্জারের মূল্য এক লাখ মার্কিন ডলার। এ অস্ত্র জোগাড় করতে বিন লাদেনের অর্থ ভাণ্ডার হাল্কা হলেও এখনো তার অর্থের অভাব নেই।

আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া বিন লাদেন ও তালিবান ফোর্সের জন্য সহনশীল যা অন্য দেশের সেনাবাহিনীর কাছে সুবিধাজনক নয়। আফগানিস্তানের মধ্য ও উত্তর অঞ্চলে পর্বতমালা আফগানিস্তানের গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী। এর অলিগলি এদের কাছে পরিচিত; তাই ব্রিটিশ ও রাশিয়ানরা বিশেষ সুবিধা করে নি। উপরন্তু সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর অঞ্চলে যে কড়া শীত পড়ে, তা বাইরের মানুষের কাছে অসহনীয়।

বিগ্রেডিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফ পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আফগানদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেশ সাহায্য করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে গেরিলা যুদ্ধে আফগানিস্তানের আফগানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা বাতুলতা, কারণ আফগানরা আফগানিস্তানে শারীরিক ও মানসিকভাবে গেরিলা যুদ্ধে যোগ্যতা রাখে, অন্যদের পক্ষে পুরানো ও অভিজ্ঞ যোদ্ধারা–ই এখন তালিবান ও বিন লাদেনের সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও অফিসার।

বিন লাদেনের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির পরিমাণ কত অনুমান করা যাবে না।

সে তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন আমরা যদি পারমাণবিক, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্র শস্ত্র জোগাড় করার চেষ্টা করি, আমাদের অপরাধ বোধ হবে না। কারণ শত্রু নিধন যে–কোন প্রকারে করা অপরাধ নয়।

এই গ্রন্থ লেখার সময় আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই যে আল–কায়েদা বায়োলজিক্যাল যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। তবে ২০০১ সালে ফ্লোরিডাতে

মোহাম্মদ আতা ক্রপডাস্টিং এরোপ্লেন খরিদ করতে চেষ্টা করে সেই ঘটনা থেকে প্রমাণিত যে আল-কায়েদা বায়োলজিক্যাল যুদ্ধ বিগ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমরা আগে দেখেছি যে, ১৯৯০-র দশকের শেষের দিকে আল-কায়েদার কর্মীরা প্রাথমিকভাবে কেমিক্যাল অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য পশুর ওপর সায়ানায়েড গ্যাস নিয়ে গবেষণা চলিয়েছে। তবু এখনও পর্যন্ত আল-কায়েদা এ ব্যাপারে উন্নত ধরনের গবেষণা বা কোন বিজ্ঞানী গিয়োগ করে গবেষণার প্রচেষ্টা শুরু করে নি।

এটা অবশ্য সম্ভব যে এতদিনে আল-কায়েদা প্রাথমিকভাবে কিছু পারমাণবিক অস্ত্র ও মেটিরিয়েল সংগ্রহ করেছে। ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে এরা কিছু ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করার প্রবল প্রচেষ্টা করে এটম বোমা তৈরি করার জন্য। ১৯৯৭ সালে আমি যখন ন্যুক্লিয়ার দ্রব্যের ওপর কোন ঘটনা-কে কেন্দ্র করে গবেষণা করছিলাম তখন আমার কাছে এক আফগানকে মাধ্যম হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বোমা তৈরি করার ইউরেনিয়াম সংগ্রহের ব্যাপারে। কিছুটা তদন্ত করার পর খবরটাকে উড়ো খবর মনে হয়েছিল, তবে সেই তদন্তে রেডিও এ্যাকটিভ-এর কিছু গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। যা বিপজ্জনক ভেবে সে প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়। কিন্তু রেডিও এ্যাকটিভ-এর বর্জ্য পেলেও তা-ও ভয়ঙ্কর হতে পারতো যদি এর কয়েক গ্রাম আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক ঘাঁটিতে পানি সরবরাহ কেন্দ্রে মিশিয়ে দেখা হয়। গত কয়েক বছরে আফগানিস্তানে রাস্তায় বেশ কয়েক জনকে রেডিও এ্যকটিভ মেটিরিয়েল ফেরি করতে দেখা গিয়েছিল। বিন লাদেনের অর্থ ও ইচ্ছা দুটোই ছিল এবং সে পারমাণবিক অস্ত্র কিছু সংগ্রহ করে না থাকলেও, চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

বিন লাদেন এখন কোথায় ? এর জবাব মাত্র কয়েকজন বলতে পারে। একটা হতে পারে, দক্ষিণ মধ্য আফগান প্রদেশ উরুজাগান; যেখানে আল-কায়েদার একটা ঘাঁটি আছে। উরুজাগান বিন লাদেনের পছন্দসই স্থান, কারণ এটা অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বর্ডারে অবস্থিত এবং এখানে ঘনবসতি নেই। মানুষের আনাগোনা কম। তাছাড়া পর্বত সঙ্কুল প্রবেশ করা মুস্কিল।

এটা বলা যায় যে ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ পরিকল্পনা হঠাৎ হয়নি, এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে বহু সময়ের দরকার হয়েছে। বিন লাদেন এই পরিকল্পনায় সরাসরি জড়িত না থাকলে এটা জানতো কিছু একটা ঘটতে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে। আমেরিকানদের প্রতি আক্রমণ ও প্রতিশোধ স্পৃহার কথাও সে চিন্তা করেছিল এবং সেমতে তার নিরাপত্তার কথাও সে ভেবে রেখেছিল। অন্যান্য ইউএস শত্রু দেশের মত যেমন ইরাক, বিন লাদেন ও তার লোকেরা আত্মসমর্পণ বা আলোচনা করতে আগ্রহী ছিল না; কারণ ধর্ম যুদ্ধে নেমে আত্মসমর্পণ ও সন্ধির চেয়ে আত্মদান করে শত্রুদেশের মানুষ ও মেটিরেয়েল ধ্বংস করে শহীদ হয়ে যাওয়া তাদের কাম্য। তাই প্রাণের বিনিময়ে তারা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের মত ভবন আক্রমণ করে ধ্বংস করতে পেরেছিল।

বিন লাদেন এটা আঁচ করতে পেরেছিল যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগণ ইত্যাদি আক্রমণের পর আমেরিকার প্রতি–আক্রমণ আসবে এবং এতে তারা নর্দার্ন এলায়েন্সের সাহায্য পাবে বিশেষ করে এর কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদ–এর। আহমদ শাহ মাসুদ নর্দার্ন এলায়েন্সের 'স্ট্রংম্যান' এবং আফগানদের জাতি–শত্রু। তাই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগন আক্রমণের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বেই দু'জন আরব সাংবাদিক সেজে আহমদ শাহ মাসুদকে হত্যা করে। আহমদ শাহ মাসুদ বেঁচে থাকলে প্রতি–আক্রমণে বিন লাদেন ও তালিবানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হতে পারতো।

পরিকল্পনা মত বিন লাদেন তার নিজের অবস্থানকে আমেরিকার প্রতি–আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করে তুললো। তাই যখন প্রতি–আক্রমণে আমেরিকার 'টমাহক' ক্রুজ মিসাইল বৃষ্টির মতো বিন লাদেনের ট্রেনিং ক্যাম্পে পড়তে শুরু করলো বিন লাদেন 'এতমিনান', কোন এক অজানা পাহাড়ের চূড়ায় তার দুই সিনিয়র সহযোগীকে দুপাশে নিয়ে নিশ্চিতে বসেছিল। নিউইয়র্ক টাইমস্ তাই বলেছিল—'...looking as untroubled as if he were on a camping trip' মনে হচ্ছিল যেন সে তার কোন ক্যাম্পের পরিদর্শনে এসেছে।

প্রশ্ন হল বিন লাদেন ধরা পড়লে কিংবা মারা গেলে আল–কায়েদা কি বিলুপ্ত হবে ? অনেকে মনে করে না, হবে না। কারণ অন্যরা যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একজন বিন লাদেনের স্থলভিসিক্ত হবে। এই দলের দুই সিনিয়র বিন লাদেনের সহযোগী আইমান আল–জাওহারি এবং তার সহকর্মী আবু হাফস্, আল–কায়েদার সামরিক কমান্ডার। আবু হাফ্স বিন লাদেনের পুত্র মোহাম্মদ–এর শ্বশুর। এই মোহাম্মদ হয়তো আল–কায়েদার নেতা হয়ে উঠতে পারে আর এদের পেছনে আছে আল–কায়েদার শত–সহস্র সদস্য, শুধু আফগানিস্তানে নয়, সারা বিশ্বের ষাটটি দেশে এর সদস্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

এই অবস্থার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় একজন সিনিয়র ইউএস কাউন্টার টেরোরিজম অফিসারের মন্তব্যে। ১৯৯৮ সালে আফ্রিকার এম্বেসি আক্রমণের পর তিনি বলেছিলেন যদি বিন লাদেন আগামীকাল থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, হয়তো সাময়িকভাবে আল–কায়েদার অসুবিধা হলেও সেখানে হাল ধরার মতো অনেক লোক আছে। বিন লাদেন প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে, তার ফেলে যাওয়া কর্মের সমাপ্ত ঘটবে কিনা সন্দেহ। ভবিষ্যতই বলে দেবে, যে ধারণার জন্ম বিন লাদেন ও আল–কায়েদা দিয়েছে তা কি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে ? যদিও প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন—'history's unmarked grave of discarded lies.' (তিনি নিজে কি মিথ্যার বেসাতি করেন না!)

যদি আল–কায়দাকে কোন 'Unmarked grave'-এ কবরস্থ করতে হয় তাহলে, এই দলের নেতাদের নিশ্চিহ্ন করার চেয়ে নেতা তৈরির কারখানাগুলোকে প্রথমে নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে আফগানিস্তানে যতো ট্রেনিং

ক্যাম্প আছে সেগুলো নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কারণ, এই ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতেই আল–কায়েদার রিক্রুটরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ আল–কায়েদার পদাতিক সৈন্য হয় ধর্মযুদ্ধের জন্য, এখানেই তারা সর্ব–বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এই ট্রেনিং ক্যাম্প ছাড়া, আল–কায়েদার রিক্রুটরা সহজে কোন কিছু শিক্ষা নিতে পারে না। কেমন করে বোমা তৈরি করতে হয়, কেমন করে সুশৃঙ্খলভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অপারেশন চালাতে হয় এখানেই তারা শেখে। এই প্রশিক্ষণের জন্যই আফ্রিকার এম্বেসি আক্রমণ, ইয়েমেনের কোলে, ও শেষে ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ ঘটনা। এইসব ট্রেনিং ক্যাম্প–কাঁচা ও অপরিপক্ব নবিশদের পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে শেখায়, বোমা তৈরি করায় দক্ষ হয়ে ওঠে ও আত্মদানে আগ্রহী হয়। এই ট্রেনিং ক্যাম্পেরই তৈরি মানুষ মাহমদ রেশাম। যে ১৯৯৯–এর ডিসেম্বরে কানাডার বর্ডারে ধরা না পড়লে লস এঞ্জেলেসের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শত শত লোক/যাত্রী মারা পড়তো।

আমরা দেখেছি, একটা ট্রেনিং ক্যাম্প মিসাইল নিক্ষেপে ধ্বংস হওয়ার পর তা আবার পুনর্নির্মিত হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার লাগাতার বোমা বর্ষণে ও বিমান আক্রমণে যেমন ট্রেনিং ক্যাম্প বন্ধ হয়েছে, তেমনি হয়েছে সরকারের পরিবর্তন। তালিবানদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া আল–কায়েদা তাদের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোকে সচল করে রাখতে সক্ষম হবে না। শুধু আল–কায়েদা নয় অন্য সন্ত্রাসী দলও যেমন আলজিরিয়ার আমর্ড ইসলামিক গ্রুপ বা কাশ্মিরের হরকত–উলমুজাহিদিন ও অন্য কোন সন্ত্রাসী কারবার চালাতে পারবে না।

১১ সেপ্টেম্বর (২০০১)–এর ঘটনা আমেরিকার নিস্পৃহতার কারণে ভুলের মাসুল। ডট কম বিলিয়নিয়ার পাফড্যাডির আইনি সমস্যা এবং গ্যারী ক্যাডিটের কারবার মরীচিকার মত যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমেরিকা এখন একটি ভিন্ন দেশ, ভীত এবং অনিশ্চয়তার শিকার। এই আক্রমণের পর, গ্রেট ডিপ্রেশনের পরে, ডাও–এর বাজার নিচে নেমে গেছে। নিউইয়র্ক শহরে বাতাস যেন দূষিত, ম্যানহাটনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো নিশ্চুপ, নীরব। শহরের রাস্তা—এমন কি টাইমস্ স্কোয়ার অদ্ভুতভাবে স্তব্ধ। ওয়াশিংটন ডিসি–তে, শুধুমাত্র আকাশে হেলিকপ্টারের, মাঝে মধ্যে, শব্দ ছাড়া আর কোন কল–কোলাহল নেই।

একটা আজানা সূত্র থেকে গরম ও তাজা সংবাদ প্রকাশ পেল সুপারমার্কেট ট্যাবলয়েড পত্রিকা 'Globe'–এর হেড লাইনের সংবাদ বিন লাদেনের ছবির ওপরে এইভাবে WANTED DEAD OR ALIVE. ঐ হেডিং এ 'ALIVE' শব্দটি ক্রস করা ছিল।

এই হেড লাইন বের হবার দুই সপ্তাহ পরে 'Globe' পত্রিকা যে বিল্ডিং থেকে বের হত সেখানে একজন সম্পাদক (Editor) অস্বাভাবিকভাবে 'অ্যানথ্রাক্স'–এ আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার এক সহকর্মী ও ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। এই পুস্তক লেখার সময়, এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল না এর জন্য দায়ী

কে ? তবে সারা শহরে গুজব রটে গেল যে বিন লাদেন ও তার সহচররা হয়তো বায়োলজিক্যাল অস্ত্র প্রয়োগ শুরু করেছে।

ইত্যবসরে, আমাদের বদ্ধ ধারণা হল যে আল-কায়েদা আমেরিকাতে কোন একস্থানকে টারগেট করার পরিকল্পনা করেছে, যার খবর কেউ রাখে না। এটা কি ইসরাইলের কোন খানে ? মধ্যপ্রাচ্যে ? ইউরোপে ? কেউ জানে না, শুধু তারাই জানে যারা বিন লাদেনের কাছের মানুষ, আফগানিস্তানে শুকনো গুহায় বাস করে এবং ইসলামকে অপমান করার কারণে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেরও আক্রমণ করার পরিকল্পনা আছে, এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা নয়, মুসলিম দেশগুলোও যেমন পাকিস্তান বিন লাদেন ও তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে জাল গুটিয়া আনছে। একজন শুধু আশা করতে পারে যে, এই পরিকল্পনা শুধু একটা মডারেট আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য পথ তৈরি করবে না। মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে এক নতুন সভ্যতা-যুগের সূচনা করবে।

একজন মহান ইহুদি প্রফেট যেমন বলেছিলেন দু'হাজার সাল পূর্বে যে—শান্তিবাদীদের ওপর স্বর্গীয় আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, কেননা তারা ঈশ্বরের পুত্র। এই মহান প্রফেটকে মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়েই সমভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।